নেতাজীর বাণী

(নেতাজীর বেতার বক্তৃতা, বিবৃতি প্রভৃতির
প্রামাণ্য সঙ্কলন গ্রন্থ)

১৯৪২-১৯৪৫

এস্. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১সি কলেজ স্কোয়ার

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার বি, এল
এস্ সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১সি কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

মূল্য—~~মাত্র পাঁচ টাকা~~

মুদ্রাকর—

শ্রীফণিভূষণ হাজরা		শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
গুপ্তপ্রেশ	এবং	শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন,		৫নং চিন্তামণি দাস লেন,

প্রকাশকের কথা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কার্য্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজ, স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও তার সেনাবাহিনীর নূতন ক'রে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। এই বইতে নেতাজীর বেতার বক্তৃতা, সংবাদপত্রের বিবৃতি প্রভৃতির সঙ্কলন করা হয়েছে। নেতাজীর এই সমস্ত বাণীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। কারণ এগুলি ব্যক্তিগত জিনিস নয়। যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন, যিনি প্রবাসে থেকে স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট গঠন ক'রে কয়েকটী রাষ্ট্রের সহায়তায় পৃথিবীর দুইটী বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বাণীর ভেতর দিয়ে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে।

পৃথিবীর দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের মত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ করা সামরিক বিজ্ঞানের দিক থেকে একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা মনে হতে পারে, কিন্তু নেতাজীর বিশ্বাস ছিল যে, অক্ষ-শক্তি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাঁকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সহায়তা করবে এবং সে আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লব ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সেই সাধনায় অনুপ্রাণিত হ'য়েই একটা অনুকূল আবহাওয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গ'ড়ে উঠেছিল।

নেতাজী আজ বেঁচে আছেন কি নেই—এ প্রশ্নের একেবারে মীমাংসা হয়নি। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধ দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও এই কামনাই করি যে, তিনি বেঁচে থাকুন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁরই বাণী সম্বলিত এই পুস্তকখানি আমরা দেশবাসীর হাতে তুলে দিচ্ছি। কারণ এই বাণীগুলি ইতিহাসের এমন একটা মুহূর্ত্তে উদ্গীত হয়েছে, যে, সেই মুহূর্ত্তকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন। ইতিহাসে তা গ্রথিত হয়েছে, অঙ্কিত হয়েছে তা স্বাধীনতাকামীদের অন্তরে; আমরা তার প্রতিচ্ছবিটাই শুধু উপস্থিত করছি আপনাদের সামনে। আপনাদের সহযোগিতায় এ প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

২৩।১।৪৭ বিনীত

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

পরিশিষ্ট

জার্মাণী হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা

১। নূতন যুগের প্রান্তে

(উত্তর জার্মাণীতে অবস্থিত আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে
১৯৪২ সালের ১১ই মার্চের বক্তৃতা)

ভাই ও বোনেরা,

গেল কিছুদিন ধরে আমি জগতের পরিবর্ত্তন নিঃশব্দে লক্ষ্য করে যাচ্ছি। সিঙ্গাপুরের পতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইঙ্গিত করে। একটি নব যুগের পত্তন হতে যাচ্ছে। আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে ব্রিটিশ আমাদের আর্থিক ও নৈতিক সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবান আমাদের স্বাধীন হবার মাহেন্দ্রক্ষণ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে আমরা নতি জানাই। স্বাধীনতা ও প্রগতির ব্রিটেনের চাইতে বড় শত্রু আর নাই। আপনাদের ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার এই সময়। ব্রিটেনের অধীনতার অবসানের অর্থ অত্যাচারের অবসান এবং ভারতের ইতিহাসে এক নূতন জীবনের সুরু। ব্রিটিশেরা আমাদের ওপর অপমান ও অসম্মানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা আবার ভগবানের কাছে নতি জানাই এই বলে যে তিনি আমাদের এই সুযোগ এনে দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর অনেক জাতিই ব্রিটেনের শত্রু। ব্রিটেনের যারা বন্ধু তারা আমাদের শত্রু।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতিকে পরিচালনা করবার দাবী করে। কিন্তু কংগ্রেসের সংশয়িত পদক্ষেপের জন্যই ব্রিটিশ নেতারা পূর্ব্বাপর একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে—তারা নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু তা পূরণ করবার ইচ্ছা তাদের মোটেই নাই। আমি এটাও বেশ

জানি যে ভারতবর্ষে এমন লোক আছে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে উৎসুক। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ব্রিটিশ শাসন চায় না, তাদের অর্থনীতির ব্যবস্থাও চায় না। যতদিন ভারতমাতা স্বাধীন না হবে ততদিন আমরা সংগ্রাম পরিত্যাগ করব না।

পৃথিবীতে এক নূতন যুগের উদয় হচ্ছে। সত্যিকার দেশপ্রেমিক বলে যে, নিজের ভাগ্য সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে সাহায্য করলে আমরা যে কোন জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছি। আমি আশা করি আমার ভারতীয় ভাইবোনেরা আমাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সাহায্য করবে। কৌশল ও গোপন উপায়ের সাহায্যেও ব্রিটেন ভারতবর্ষকে আর ধোঁকা দিতে অথবা তার জাতীয়তার আদর্শ দমন করতে পারবে না। ভারতবর্ষ সংগ্রাম করবে সিদ্ধান্ত করেছে। ভারত শুধু নিজের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেই ক্ষান্ত হবে না, সমগ্র এশিয়া এমন কি সমগ্র পৃথিবীতে সে স্বাধীনতা এনে দেবে।

২। চক্র-শক্তি আমাদের বন্ধু

(বার্লিন থেকে ১৩ই মার্চের বক্তৃতা)

বন্ধুগণ,

সিঙ্গাপুর পতনের ফলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের পূর্ব্ব-এশিয়ার সামরিক ঘাঁটিগুলোরও দ্রুত পতন হয়েছে। জাপানীরা রেঙ্গুন অধিকার করাতে বর্মীদের স্বাধীনতার আশা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। তারা যখন স্বাধীন ছিল তখন যেমন স্বাধীন বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলত তেমনি এখনও ফেলবে। ১৯৩৯ সালের ২৬শে নভেম্বর জার্মাণীর পররাষ্ট্র সচিব যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি কেমন সত্যদ্রষ্টার মত বলেছিলেন যে ব্রিটেন একটির পর একটি সামরিক ঘাঁটি হারাবে। প্রত্যেক দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে।

ব্রিটিশের গৌরবশিখা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। তাদের দিন শেষ হয়ে এল।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে ব্রিটিশ আগের মতই অন্য জাতিকে ভুলিয়ে তাদের জন্য অস্ত্র যোগান দিতে ও লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা সফল হয় নি। সব দিকেই তাদের প্রবল হার ও অপমান লাভ হচ্ছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতীয়েরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করবার দাবী জানিয়েছে, বলেছে এই নীতি প্রয়োগ করে তাদের সাধুতা শুভেচ্ছা প্রমাণিত করুক। কোন কোন ভারতীয় নেতা আরও বলেছেন যে যদি ব্রিটেন ভারতের জাতীয় দাবী মেটায় তবে তারা ব্রিটেনকে এই যুদ্ধে সাহায্য করবে। ব্রিটিশ রাজ-নীতিকেরা এই দাবীতে কর্ণপাত করে নি। এমন কি সোজাসুজি একটা উত্তর দিয়ে ভারতীয়দের শুভেচ্ছা অর্জ্জন করাও তারা প্রয়োজন মনে করে নি। প্রকৃতিগত ভণ্ডামি ও বঞ্চনা প্রবৃত্তি থেকে তারা আবার একটি অস্পষ্ট ঘোষণা করেছে।

শাসনের সূত্রপাত থেকে আগাগোড়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একতা ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। এদিকে তারা খানিকটা সফলও হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যের অজুহাতে তারা ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে রাজী হয় নি। ব্রিটিশ-ষড়যন্ত্রের অন্ত নাই। এখন তারা শত্রুদ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নিয়ে হৈ চৈ করছে। প্রায়ই বলা হত যে ভারতের সীমান্ত সুয়েজ এবং হংকং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কারণ দেখিয়েই ব্রিটিশেরা ভারতীয় সৈন্য লিবিয়ার মরুভূমিতে, ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের রক্তপাত করতে বলেছে। প্রাচ্যে ভারতীয়দের ইচ্ছা উপেক্ষা করে হংকং ও সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের বলি দেওয়া হয়েছে। ওয়েভেল খুশী মত যেখানে ভারতের সীমান্ত নির্দ্দেশ করেছেন, ভারতের সীমান্ত প্রকৃতপক্ষে সেখানে নয়। এটা শুধু

দুষ্টবুদ্ধি ব্রিটিশের আবিষ্কার। সংরক্ষণশীল অথবা শ্রমিকদল যাদের হাতেই ইংলণ্ডের শাসন ক্ষমতা থাকুক না কেন, তারা ভারতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে, ভারতীয়দের সর্ব্বস্বান্ত করেছে। সাম্রাজ্যে নিরাপত্তা রক্ষা করতে, তার শৃঙ্খল দৃঢ় করতে ব্রিটেন ভারতবর্ষের কাছে সাহায্য ও বৃহৎ ত্যাগের দাবী করছে। তারা চায় ভারতবর্ষ তাদের জন্য দাসের মত নিরবচ্ছিন্ন শ্রম করুক।

ভারতবাসীরা জানে যে ভারতের বাইরে তার কোন শত্রু নাই। ব্রিটিশ তার দুরভিসন্ধিমূলক নীতি ত্যাগ করে নি। ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে কারণ বলা হয় যে যুদ্ধ ভারতের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত"। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য দায়ী কে? ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত কি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি? অন্যায় ভাবে তার সম্পদ ও কাঁচা মাল ব্যবহার করা হচ্ছে না কি, ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য ভারতবর্ষকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা হয় নি? যদি কাজ করবার স্বাধীনতা থাকত, যেমন আয়ারলণ্ডের আছে, তা হলে এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ কখনই যোগ দিত না। ভারতবর্ষকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করতে এবং ভারতীয়দের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশী সাহায্য পাবার জন্য সব রকম ধোঁকাবাজী দেওয়া হয়েছে।

বন্ধুগণ, ব্রিটেনের নানা রকম চাল যাচাই করে দেখবার এবং তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারবার সময় এইবারে হয়েছে। তারা যুদ্ধ ভারতবর্ষেও নিয়ে আসতে চায়; ভারতবর্ষকে তারা এর আগেই যুধ্যমান জাতি হিসাবে ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন চিরকাল এইভাবে অন্য-জাতিকে তাদের যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনতে চায়, কাজেই এই অতি-প্রাচীন ব্রিটিশ নীতিতে কেউই আশ্চর্য্য হবে না। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলে তারা বরাবরই মিত্রদের পরিত্যাগ করে। সোজা কথায় তারা রীতিমত পর্য্যায়ক্রমে কোন চিন্তা না করে মানব সমাজে ধ্বংস

ডেকে আনে। ডানকার্ক থেকে আরম্ভ করে বাটাভিয়া পর্য্যন্ত তার বিপুল ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আপনারা ভারতবাসীরা কি আজও ব্রিটিশের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন ?

ভারতবর্ষের ভ্রাতৃগণ, যুদ্ধ ভারতবর্ষের সীমান্তের বাহিরে রাখবার জন্ত ব্রিটিশ আপনাদের সাহায্য করবে এমন আশা করে লাভ নেই। বরং ভারতবর্ষকে তারা ক্রমাগতই ধ্বংস করবে, এবং তথাকথিত "পোড়ামাটি" নীতি ভারতবর্ষেও প্রবর্ত্তন করতে ইতঃস্ততঃ করবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছে দুর্ব্বল জাতিদের নির্ম্মমভাবে লুঠ করে। যত দিন তাদের ক্ষমতা আছে ততদিন তারা অধীন জাতিদের শোষণ করতে থাকবে। ভারতবর্ষ বিপদের বাইরে থাকুক যদি ভারতীয়েরা এটা চায় তাহলে তাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিটিশ সামরিক বস্তু ধ্বংস করা এবং ভারতবর্ষের কাঁচামাল, সম্পদ এবং যুবশক্তি যুদ্ধ কার্য্যে নিয়োজিত হতে বাধা দেওয়া।

বন্ধুগণ, এটা জলের মত পরিষ্কার যে ব্রিটিশের অবনতিতেই ভারত-বর্ষের স্বাধীন হবার আশা। যে ভারতীয় ব্রিটিশের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে সে তার মাতৃভূমির উদ্দেশ্যের প্রতিরোধ করছে; সে ভারতের বিশ্বাসঘাতক। ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের যারা বিরোধিতা করে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিচ্ছে তারা এ যুগের মীরজাফর অথবা উমি-চাঁদের চাইতে কোন অংশে ভাল নয়।

ভাই ও বোনেরা, ধ্বংসোন্মুখ ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা এখন পৃথিবীর দৃষ্টিতে হাস্যকর কাজ। সম্প্রতি চার্চিল ঘোষণা করেছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে। তিনি ক্রিপসকে ভারতবর্ষে যাবার জন্য আদেশ করেছেন যাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্র করে বর্ত্তমান অবস্থাতে ভারতীয়দের কতখানি ক্ষমতা দেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে একটা আলোচনা করবেন। কোন ধীর মস্তিষ্কের ভারতীয় ব্রিটেনের

এই বর্ত্তমান ঘোষনায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। আজ কোনও ভারতীয় যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা দেবার ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ভুলবে না। প্রত্যেক ভারতীয় জানে যে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা। যতদিন পর্য্যন্ত তারা ভারতবর্ষে আছে ততদিন তারা তাদের পাপ নীতি পরিত্যাগ করবে না। অচিরেই চার্চিল ও তার গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পারবে যে ভারতবর্ষ আর তাদের ভাঁওতায় ভুলবে না। ভাইবোনেরা, আমি নিজের চোখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন দেখতে পাচ্ছি। ক্রিপস অথবা অন্য কোনও ব্রিটিশ যদি ভারতবর্ষে আসে তাতে ভারতবাসীদের কোনও ঔৎসুক্য জাগরিত হতে পারে না।

পৃথিবীব্যাপী আজকার এই যুদ্ধে কয়েকটি জাতি ভার্সাই সন্ধি সর্ত্তে যে সুবিধাগুলো পেয়েছে তা রক্ষা করতে চাইছে, আর অপর জাতিগুলো বর্ত্তমান জগতে যে অশান্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা দূর করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লড়াই করছে, যাতে এক 'নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে পারা যায়। ভাইবোনেরা, এ যুদ্ধে আপনাদের একটিমাত্র জিনিস আছে হারাবার, সেটা আপনাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল। বর্ত্তমান জাগতিক ব্যবস্থায় ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয়েরা সুখী নয়। এমন একটা নূতন ব্যবস্থা তারা চায় যা তাদের মৃত্যু ও দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবে; একমাত্র তেমন একটা নূতন ব্যবস্থাতেই তারা সুখী হতে পারে। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিশ্চিত ধ্বংস করবে এবং ভারতবাসীও তাদের ঈপ্সিত লাভ করবে।

বিখ্যাত ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে। এই চুক্তিতে যারা স্বাক্ষর করেছে তারা আমাদের সংগ্রামের সাথী। চক্রশক্তি সংগঠন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে কাঁটা এ কথা বলা একেবারেই হাস্যকর। কাজে আমরা একেবারেই অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি। আমি এই জাতিগুলোকে ভাল করে জানি, আমি আপনাদের বলতে পারি যে আমাদের স্বাধীনতা কামনার প্রতি তাদের পুরো মাত্রায়

সহানুভূতি আছে। এ সম্বন্ধে যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে সম্প্রতি জেনারেল তোজো যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি আশা করি যে আমার দেশবাসীরা তাদের শুভেচ্ছা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করবে না বা এ্যাংলো-আমেরিকার মিথ্যা প্রচারে ভুলবে না। জাপানীরা যেমন প্রবল ভাবে তাদের শত্রুদের জয় করছে তা দেখে ভারতবাসীরা আনন্দিত হয়েছে। ন্যায় ও সাম্য যখন স্থাপিত হবে সেদিন আর দূরে নেই। ন্যায় ও সাম্যের যুগ প্রবর্ত্তিত হলেই ভারতবাসীদের উন্নতি ও বিকাশ হবে।

৩। অভিযুক্ত বৃটেন

(বার্লিন রেডিও থেকে ১৯শে মার্চ, ১৯৪২ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভাইবোনেরা, সিঙ্গাপুর দ্বীপের ঘাঁটি পতনের পরে সুদূর প্রাচ্যের ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটিগুলোরও দ্রুত পতন হচ্ছে। রেঙ্গুনেরও পতন হয়েছে। বর্মীরা আবার স্বাধীন নিঃশ্বাস নিতে পারছে, যেমন আগে পারত যখন তাদের দেশে সোনার প্রাসাদ আর প্যাগোডা আর মাঠে ছিল অপূর্ব্ব হরিৎ সম্পদ। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে জার্মাণীর পররাষ্ট্র সচিব যা বলেছিলেন তা দ্রষ্টার কথার মত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে চলেছে, ব্রিটেন একের পর একটি করে স্থান হারাচ্ছে। দিগন্তে আজ এমন কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস রোধ করতে পারে। ব্রিটেনের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী এই যুদ্ধের সুরু থেকেই ব্রিটেন অন্য দেশ ও নীতিকে তাদের যুদ্ধে লড়াই করবার জন্য ও রসদ জোগাতে টেনে আনতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এ চেষ্টা খুব সফল হয় নি, এবং তাই ব্রিটেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব কটা বড় যুদ্ধে হেরেছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতবাসী ব্রিটেনের কাছে আবেদন করেছে যে ভারতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটেন তার

সদিচ্ছা প্রমাণিত করুক। কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা এও বলেছেন যে জাতীয় দাবী মিটিয়ে দিলে ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় ভারত-বাসীরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এর উত্তরে প্রত্যাখ্যানই লাভ হয়েছে, তাও আমরা যেমন সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান আশা করি তেমন ভাবে নয়, নানা ভাবে ঘুরিয়ে ও প্রবঞ্চনা মূলক কথা বলে এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের আগাগোড়াই চেষ্টা হয়েছে দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, এখন সেই বিভেদের অজুহাতে ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এই ভণ্ডামিতে সন্তুষ্ট না থেকে ব্রিটিশ প্রচারকেরা বলছে যে ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই অজুহাতে তারা বলেছে ভারতের প্রকৃত সীমান্ত সুয়েজে ও হংকংএ। তাই ভারতীয় সৈন্য লিবিয়া, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর ও হংকংএ জোর করে ভারতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওয়েভেল কথিত কোন কাল্পনিক সীমান্ত ভারতবর্ষের নেই। ভারত-বর্ষের জাতীয় ভৌগলিক সীমা আছে যা প্রকৃতিদত্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই শুধু উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত সীমান্ত আছে। এই সাম্রাজ্যই ভারতের অন্ন ও স্বাধীনতা অপহরণ করেছে,—এই সাম্রাজ্যের শাসক শ্রমিক দল অথবা রক্ষণশীল যারাই হোক না কেন তাদের ভারতীয় নীতি একই। ভারতের যদিও কোন শত্রু নেই, তবু এই সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য ভারতবাসীকে রক্তপাত করতে, অজস্র পরিশ্রম করতে আদেশ করা হয়েছে, যে শ্রম ও রক্তপাতের ফলে ভারতবর্ষের নিজের দাসত্বই দৃঢ়তর হবে।

কিছুদিন থেকে ব্রিটেনের চাল খানিকটা বদলে গেছে। ভারতীয় ও অন্যান্য সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ এখন ভারতেই হবে। কিন্তু কারা ভারতবর্ষকে রণক্ষেত্রে পরিণত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে? যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষকে যুধ্যমান জাতি হিসাবে ঘোষণা না করত, বৈধ এবং

অবৈধ উপায়ে ভারতের জনবল, ভারতের অর্থ, কাঁচামাল ব্রিটেনের সমর উপকরণ তৈরী করবার জন্য ভারতের কলকারখানাগুলো নিয়োগ না করত; যদি ভারতবর্ষকে একটা বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত না করত, ভারতবর্ষকে যদি আয়ারলণ্ডের মত নিরপেক্ষ থাকবার স্বাধীনতা দেওয়া হত তা হলে ভারতবর্ষ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে অনায়াসেই থাকতে পারত। কিন্তু নানারকম কূট চাল দিয়ে ভারতবর্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর নিয়ে আসা হয়েছে যাতে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় ব্রিটেনের, একান্ত আপনার ভাবে সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করে। ভারতবাসীদের এখন ব্রিটেনের রাজনীতিকদের এই জঘন্য চালবাজী বুঝবার সময় হয়েছে, এই রকম একটা চালের ফলেই ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মত ভারতবর্ষেই যুদ্ধ ডেকে আনা হচ্ছে।

কিন্তু এই রকম চালবাজিতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। কারণ যুদ্ধের সুরু থেকেই ব্রিটেন চেষ্টা করছে অন্য দেশে যুদ্ধ ডেকে আনবার জন্য। নরওয়ে থেকে ক্রীট এবং লিবিয়া থেকে হংকং এ তারা চেষ্টা করে অন্য জাতিকে তাদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য উত্তেজিত করেছে। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলে তারাই সেই সব জাতিদের ফেলে রেখে তারাই আগে পালিয়েছে, এ আমরা ডানকার্ক থেকে বাটাভিয়া পর্য্যন্ত দেখেছি। এমন আশা করা অসঙ্গত যে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে রেখে আধুনিক যুদ্ধের সব রকম কষ্ট থেকে ভারতবর্ষকে রেহাই দেবে। যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের দেশে তারা "পোড়ামাটি" নীতি চালু করতে একটুও ইতঃস্ততঃ করবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছে দস্যুবৃত্তি ও লোভ থেকে, এই সাম্রাজ্য বেঁচে থাকবে অন্যায় ও অত্যাচার করেই। যদি ভারতবাসী চায় ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে তা হলে তাদের নিজেদেরই ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ভারতবর্ষ থেকে উঠিয়ে দিতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য শোষণ বন্ধ করতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ের অর্থ আমাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করা, সাম্রাজ্য

সমূলে উৎখাত করতে পারলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্ভব হবে। অতএব যে ভারতবাসী ব্রিটেনের পক্ষে এখন কাজ করছে তারা নিজের দেশের স্বার্থের বিরোধিতা করছে, তারা স্বাধীনতার শত্রু। জাতীয়তাবাদী ভারতের শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তা নয়, ব্রিটেনের সাহায্যে যারা দেশে আছে, আধুনিক মীরজাফর ও উমির্চাদদের সঙ্গে লড়তে হবে। প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সাম্রাজ্য অচিরে ধ্বংস হবে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাওয়া ব্যর্থ প্রচেষ্টা নয় শুধু, হাস্যকরও।

ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন যে যুদ্ধ শেষ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী সার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস্ ভারতবর্ষে আসছেন যাতে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়ে নিতে পারেন এবং ফলে কতখানি রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতবাসীকে এখনই দেওয়া যায় তাও বিবেচনা করে দেখবেন। যারা 'আহম্মকের স্বর্গে' বাস করে তারাই শুধু সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কথা চিন্তা করতে পারে এমন একজনও ভারতবাসী পাওয়া যাবে না যে যুদ্ধের পরে পূরণ করা হবে এমন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে। ভারতবাসীরা ভাল করেই জানে যে বহু-কথিত অভ্যন্তরীণ বিভেদ অত্যন্ত কৃত্রিম ব্যাপার এবং যতদিন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে থাকবে ততদিন এই রকম বিভেদ সৃষ্টি করেই তারা শাসন চালাবে। মিঃ চার্চিল ও তার মন্ত্রী-পরিষদ শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে ওয়েস্ট মিনিষ্টার থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়লেই ভারতবাসীকে নিজেদের পক্ষে টানা আর সম্ভব নয়। অতীতে অন্যান্য সাম্রাজ্যের যা গতি হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও তাই হবে এবং এই সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে স্বাধীনও সম্মিলিত ভারতের অভ্যুদয় হবে। কাজেই এই শেষ সময়ে স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস অথবা অপর কোন ব্রিটিশ নেতার ভারতবর্ষে

আসাতে কোনই ফল হবে না, ভারতবাসীর তাতে একটুও কৌতূহলও জাগ্রত হবে না।

বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে একদল চাইছে ভার্সাই ও অতীতের অন্যান্য সন্ধি থেকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা রক্ষা করতে-আর অপর দল চায় প্রাচীন নীতি ধারণা করে একটা নব-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে। এই সংগ্রামে ভারতের আর কিছুই হারাবার ভয় নেই, শুধু তার শৃঙ্খল ক্ষয় হবে। ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন পন্থা রক্ষিত হলে মিটবে না, মিটবে নব-যুগের প্রবর্ত্তনে। প্রাচীন পন্থার অর্থ হল অপমান, দাসত্ব ও মৃত্যু।

আধুনিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয় যে গত যুদ্ধে যেমন ধ্বংসোন্মুখ কয়েকটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, তেমনি বর্ত্তমান যুদ্ধেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে—কারণ আধুনিক কালে সাম্রাজ্য একেবারেই বেমানান। জার্মাণী, ইটালী ও জাপান—এই ত্রিশক্তি আমাদের মিত্র, কারণ এদের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে। এই চক্রশক্তি ভারতবর্ষের একটা আপদ এটা বলা একেবারেই মিথ্যা। এই সব শক্তিদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমি জানি তারা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন এবং এতে তাদের শুভেচ্ছাও রয়েছে। যদি এ সম্বন্ধে কারো কোনও সন্দেহ থাকে, তবে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাম্প্রতিক ঘোষণা এই সন্দেহ দূর করবে। এবং ভবিষ্যতে কোন ভারতীয় ব্রিটিশ প্রচারে আর ভুলবে না। আমাদের তাই আনন্দ করা উচিত যে ত্রিশক্তির একত্র সংঘাতে আমাদের চিরশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। প্রাচ্যে জাপানীদের দ্রুত বিজয়ে আমাদের আনন্দ করা উচিত। ভার্সাইয়ে যে প্রাচীন নীতি অনুসৃত হয়েছিল তা আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আগামী নব সূর্য্যোদয়ের

কথা স্মরণ করে আমাদের আনন্দ করা উচিত, যখন স্বাধীন ভারতে ন্যায়, সুখ ও ঐশ্বর্য্য বিরাজ করবে।

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!"

৪। ক্রীপসের সাম্রাজ্যবাদী ভণ্ডামি

[আজাদ হিন্দ রেডিও (জার্মাণী) থেকে ২৫শে মার্চে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু কথা বলছি আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে: আমি আজও বেঁচে আছি। ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুলো ঘোষণা করেছে যে টোকিয়োতে একটি সম্মেলনে যাবার সময় এরোপ্লেন ভেঙ্গে আমি মরে গেছি। গত বছর ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার পর থেকে ব্রিটিশ প্রচার সংসদগুলো আমার গতিবিধি সম্বন্ধে নানারকম গোলমেলে সংবাদ দিয়েছে। ইংলণ্ডের খবরের কাগজগুলো আমার সম্বন্ধে নানা নিন্দা প্রচার করেছে। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে এই সাম্প্রতিক খবরটিতে তাদের অচরিতার্থ ইচ্ছাই চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এই সঙ্কট সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার মৃত্যু কামনা করে, কারণ ভারতবর্ষকে তাদের পক্ষে টানবার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে এরোপ্লেন ধ্বংসের খবর দেওয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত এখন আমার কাছে নেই। কাজেই আমি বলতে পারি না ওটা শত্রুর ধ্বংস-মূলক কাজ কি না। যাই হোক, এই ঘটনায় যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। তাঁরা ভারতের জাতীয় বীর।

আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা বেশ ভাল করে বিবেচনা করেছি, স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস যে রেডিও বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা যথেষ্ট ভেবে দেখেছি। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে স্যার স্ট্যাফর্ড ভারতে গেছেন ব্রিটেনের চিরাচরিত বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করবার নীতি

অনুসরণ করতে। ভারতের অনেকেই স্যার স্ট্যাফর্ডের কাছ থেকে এমন একটা কাজ আশা করেন নি, মিঃ আমেরির মত কোন সংরক্ষণশীল দলের নেতার পক্ষে এ কাজ শোভা পেত। স্যার স্ট্যাফর্ড আমাদের বলেছেন এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্ত্রী পরিষদ সকলে একমত এবং এটাই এখন সব চাইতে ভাল একটি পন্থা।

এ থেকে একটা বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে যে ব্রিটেনের দলগত সব বিভেদ ভারতীয় সমস্যার ব্যাপারে লোপ পায়। স্যার স্ট্যাফর্ড বলেছেন ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশে নানা জাতি ও উপজাতি বাস করে। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে রাজা অশোকের সময় ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেটা যীশুর জন্মের বহু আগে এবং ইংলণ্ড ঐক্যবদ্ধ হবার অন্তত হাজার বছর আগে।

সাম্রাজ্যের অন্যত্র ধর্ম্মের প্রশ্ন তুলে প্যালেস্টাইন ও আয়ারলণ্ডে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতবর্ষে শুধু এই প্রশ্ন তুলে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, দেশীয় নৃপতি, অনুন্নত শ্রেণী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী অন্যান্য অস্ত্রেরও প্রয়োগ করা হয়েছে। স্যার স্ট্যাফর্ড ভারতবর্ষে চান এই সব অস্ত্র ব্যবহার করতে। তাই স্যার স্ট্যাফর্ড একদিকে একশ্রেণীর রাজনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন যখন স্বাধীনতার নির্ভীক যোদ্ধাদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে। ভারতবাসীরা ব্রিটেনের এই জঘন্য নীতি ভাল করেই জানে। আমার একটুও সন্দেহ নাই কারা-প্রাচীরের ভেতর থেকেই আমাদের স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে, বোঝাতে পারবে যে এই প্রস্তাব ও আলোচনা ভারতবর্ষের আত্মসম্মানে আঘাত করবে।

লণ্ডনের খবরের কাগজ মন্তব্য করেছে যে স্যার স্ট্যাফর্ডের প্রস্তাবে সত্যিই নতুন কিছু নেই। সারাংশ হচ্ছে সাম্রাজ্যের ভেতরে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, তাও আবার যুদ্ধের পরে দেওয়া হবে। প্রস্তাবের অংশগুলো, স্যার স্ট্যাফর্ডের বক্তৃতা এবং ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মত

পত্রিকার মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গত যুদ্ধের শেষে আয়ারলণ্ডকে যেমন বিভক্ত করা হয়েছিল তেমনি ভারতবর্ষকে বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত করা। আমার সন্দেহ আছে ভারতবর্ষ এই প্রস্তাব আদৌ বিবেচনা করবে কি না। ভারতবাসীরা অতিথিপরায়ণ, স্যার স্ট্যাফর্ড এই অতিথিবাৎসল্যকে যদি প্রস্তাব গ্রহণ করা বলে মনে করেন তাহলে ভুল করবেন।

স্যার স্ট্যাফর্ড দিল্লীতে একটি প্রেস কনফারেন্সে যখন বলেন যে ভারতবাসীরা একটি মিলিত শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করতে পারেনি, তখন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী ভণ্ডামির চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়। ভারতবাসীরা জানে যে ভারতে শাসনযন্ত্রের নানা দুর্নীতির জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই দায়ী। ভারতবাসীরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে আলোচনা করে, তর্ক করে বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না, তাই তার চাইতে কার্য্যকরী অন্য উপায় তাদের অবলম্বন করতে হবে।

স্যার স্ট্যাফর্ড বলেছেন যে যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিন নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব নয়, কাজেই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে যুদ্ধের পরে। আমি স্যার স্ট্যাফর্ডকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে দেশের অধিকাংশের বিশ্বাসভাজন একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা বলেছিলাম। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের কাছে এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট দায়ী থাকবে। প্রথমে এই প্রস্তাব কংগ্রেসের ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে আমি করি, পরে কংগ্রেসও এটা নিজেদের দাবী বলে গ্রহণ করে। আসল কথা হচ্ছে বর্ত্তমানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দেশীয় রাজ্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রশ্ন তুলে তারা যে কোন সময়ে বলতে পারে যে ভারতে ঐক্য নেই। স্যার স্ট্যাফর্ড বোকামি করবেন যদি তিনি ভাবেন যে এই রকম একটা বাজে প্রস্তাব

করে তিনি ভারতবাসীদের স্বাধীনতার ক্ষুধা মেটাতে পারবেন। ভারত-বাসীদের সাহায্য নিয়ে গত যুদ্ধে ব্রিটেনের জয় হয়েছিল, পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ পেয়েছিল আরও নির্য্যাতন ও হত্যালীলা। ঐ সব ঘটনা ভারতবর্ষ ভুলে যায় নি এবং এবার তারা দেখবে যাতে এই স্বর্ণ সুযোগ না হারায়!

এই শতাব্দীর সুরু থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর একটি সঙ্ঘ দাঁড় করিয়েছেন কংগ্রেসের দাবীর বিরোধিতা করবার জন্য। তাঁরা মুসলিম লীগকে এই কাজে লাগাচ্ছেন, কারণ এই দলের দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূল। ব্রিটিশ এমন ভাবে প্রচার করেছে যেন মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মতই ক্ষমতাপন্ন প্রতিষ্ঠান! এবং অধিকাংশ মুসলমানের প্রতিনিধি হচ্ছে লীগ। এটা সত্যি নয়! প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি প্রভাবশালী মুসলমান দল আছে যারা সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। ভারতবর্ষের এগারোটি প্রদেশের চারটিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ চারটির মধ্যে কেবলমাত্র পাঞ্জাবের মন্ত্রীত্বকে লীগ মন্ত্রীত্ব বলা যেতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী লীগের প্রধান দাবী ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবার বিরোধী। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মাত্র একটি প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করতে পারে। তবু বলা হয় যে অধিকাংশ মুসলমান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে না।

দেশরক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন সামরিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করবে ব্রিটেন, এমন কি বড়লাট বা জঙ্গীলাটকেও সে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। এই নীতি দ্বারা ব্রিটেন দু'টো উদ্দেশ্য লাভ করতে চায়। একদিকে ভারতের সম্পদ সাম্রাজ্য-রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা অপর দিকে ব্রিটেনের শত্রুদের ভারতে সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করতে উত্তেজিত করা যাতে সব ভারতবাসীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্রিটেনের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। আমি জোর দিয়ে বলছি যে ভারতবর্ষের মাটিতে যদি যুদ্ধ হয় তার জন্য

দায়ী হবে ব্রিটেনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ভারতীয়েরা যাঁরা ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করছে। ব্রিটেন এখন পর্য্যন্ত অন্য জাতিকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা একমাত্র স্থান ত্যাগ ও পশ্চাদপসরণেই অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সম্প্রতি তারা পালাবায় আগে সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়া ও নষ্ট করবার নীতি গ্রহণ করেছে। এই "পোড়া মাটি" নীতি যদি ব্রিটেন তার নিজের দেশে প্রয়োগ করে তবে আমাদের বলবার কিছু নাই। আমার বিশ্বাস তারা সিংহল ও ভারতবর্ষে এই নীতি প্রয়োগ করবে বলে স্থির করেছে, যদি সত্যিই যুদ্ধ এ দু'টো দেশেও হয়। ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়াতে ব্রিটেনের পরাজয় হতে শুধু বাধা হবে তা নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতেও বিলম্ব হবে।

৫। ক্রীপসের কাছে খোলা চিঠি

(আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ৩১শে মার্চের বক্তৃতা)

আমি সুভাষচন্দ্র বসু কথা বলছি। স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের কাছে ইংরেজি ভাষায় একটা খোলা চিঠি আমি এখন পড়ব।

প্রিয় স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস,

পৃথিবীর কাছে ঘোষিত হয়েছে আপনি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর পরিষদের কাছ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে ভারতকে বেঁধে রাখবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর পরিষদ যে আপনাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন এটা বুঝতে পারা যায়, কিন্তু এটা একেবারেই অবোধ্য যে আপনি এ রকম একটা কাজ হাতে নিলেন কি করে। বর্ত্তমান মন্ত্রী পরিষদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ আপনার অজানা নেই। শ্রমিকদলের কারও কারও উপস্থিতিতে এর প্রকৃতি আদৌ বদলায় না। শ্রমিক দলের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল বলে আপনি ত আর সকলের চাইতে ভালই জানেন এ দল ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য

অবনত জাতির ব্যাপারে কেমন প্রগতিবিরোধী মত পোষণ করে। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের জাতীয় মন্ত্রী পরিষদ শ্রমিকদের সমর্থন অন্ততঃ দাবী করতে পারত, কিন্তু বর্ত্তমান পরিষদের ত তাও উপায় নেই।

যখন আপনি শ্রমিক দলের সঙ্গে আপনার নীতি ও বিশ্বাস নিয়ে সংগ্রাম করতেন তখন আমার মত আরও অনেকের শ্রদ্ধা আপনি অর্জ্জন করেছিলেন। আপনি সাম্রাজ্য বিরোধী ছিলেন, এমন কি রাজার সিংহাসন ত্যাগ করবার কথাও আপনি বলতেন কারণ এই সিংহাসনই সাম্রাজ্যের আসল ভিত্তি। কিন্তু আপনার মূল নীতিতেই যেন পরিবর্ত্তন এসেছে, তাই মিঃ চার্চিলের অধীনে আপনি মন্ত্রীত্ব নিতেও অস্বীকার করেন নি। মিঃ চার্চিলের মত ভারত-বিরোধী আর একজনও ইংরাজ সমগ্র ব্রিটেনে আছে কি না সন্দেহ। যারা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানে অথবা যারা আপনার পূর্ব্বাপর ইতিহাস অবগত আছে তারা আপনার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পন্থা বুঝতে না পেরে বিস্মিত হচ্ছে। মিঃ চার্চিলকে বুঝতে কোন কষ্ট হয় না; তিনি খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী। 'জোর যার মুলুক তার' পন্থায় তাঁর বিশ্বাস আছে আর তা তিনি গোপন করবার চেষ্টাও করেন না। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের পথও বুঝি। ব্রিটেনের শ্রমিক নেতারা সংরক্ষণশীল দলের নেতাদের মতই সাম্রাজ্যবাদী, যদি তারা কথা বলে অনেক মোলায়েম ও মধুর করে। আমরা শ্রমিক শাসনের স্বরূপ ১৯২৪ সালে দেখেছি আবার দেখেছি ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত।

এই দুবারই আমাদের অধিকাংশ সময় কেটেছে জেলে তাও আবার বিনা বিচারে। ভারতবর্ষ কখনও ভুলবে না যে ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত শ্রমিক দলের হাতে সাম্রাজ্য শাসনের ভার ছিল। শ্রমিক মন্ত্রী পরিষদ এক লাখ নরনারীকে জেলে ঢুকিয়েছে, নরনারীর ওপরে বে-পরোয়া লাঠি চার্জ করেছে, পেশোয়ারে নির্ব্বিরোধী জনতার ওপরে গুলী চালিয়েছে, বাংলা দেশের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে নারীর অসম্মান

করেছে। আপনি শ্রমিক দলের তীব্র সমালোচক ছিলেন তখন ১০৩৮এর জানুয়ারীতে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু আজ আপনাকে একেবারে আলাদা লোক বলে মনে হচ্ছে।

আপনি হয়ত বলবেন যে আপনার কাজ হচ্ছে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সঙ্গে মিটমাট করে দেওয়া। কিন্তু আপনার মন্ত্রী-পরিষদ ও পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে প্রস্তাব হচ্ছে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের, স্বাধীনতার নয়। এবং তাও যুদ্ধের পরে দেওয়া হবে, এখন নয়। আপনি দিল্লীতে বলেছেন যে ভারতের প্রতি মনোভাব আপনার ও মিঃ চার্চিলের অভিন্ন। আপনি যে খোলাখুলিভাবে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে ভারতীয়েরা ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি কি চোখে দেখে? আপনি কি জানেন না যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গা ও পূরণ না করবারই ইতিহাস? আপনি জানেন যে জাতীয় কংগ্রেসের দাবী হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা, তা জেনেও আপনার মত খ্যাতিমান লোক এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে ভারতে এসেছেন? আর একটি ব্যাপারে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মনে ব্যথা লেগেছে যে আপনি প্রত্যেক দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করছেন, একবারও বিচার করে দেখছেন না যে সে দল জনগণ অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রতিনিধি কি না। আপনার অন্তত জানা উচিত যে এই সব দলের অনেকগুলোই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সৃষ্টি, কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করবার জন্যই তাদের উদ্ভব। এটাও আশ্চর্য্য মনে হয় যে আপনি দেশীয় নৃপতিদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী পরিবর্ত্তনে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। দেশীয় নৃপতিদের ব্যাপারে আপনার করণীয় কাজ লর্ড লিনলিথগো আপনি আসবেন মনে করে আগে থেকেই সুরু করে দিয়েছেন। নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে আপনার ভূমিকা অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকের ন্যায় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাময় বলেই মনে হবে।

এই যুদ্ধের সুরুতে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা

সম্বন্ধে খুব সরব ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ভারতের ব্যাপারে দেখা যায় যে তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবীর কথা তুলে ভারতবর্ষের বিভেদটা বড় করে দেখাচ্ছেন এবং ভারতকে চিরপরাধীন করে রাখবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতের বৈশিষ্ট্য নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই সমস্যা আছে। যদি ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা হলে ভারতীয় সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক উপায় কেন প্রয়োগ করেন না? ১৯৩৯ সাল থেকে ব্রিটেনের রাজনীতিকেরা ও প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলো বলে আসছে যে চক্রশক্তি ভারতের আপদ স্বরূপ, এখন আবার তারা বলছে যে বহিঃশত্রু দ্বারা ভারত আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু একি নিতান্ত প্রবঞ্চনা নয়? ভারতের সীমার বাইরে ভারতের কোন শত্রু নেই। ভারতের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং এই সাম্রাজ্যবাদের চিরকালের শোষণ থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাকে যুধ্যমান জাতি হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং তারপর থেকে ভারতের সম্পদ সমর প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গবর্ণমেণ্টই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর জার্মাণ, ইটালিয়ান ও জাপানীদের বন্দী করেছে। চক্রশক্তি ও ভারতবাসীরা বেশ জানে যে তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না; সেই জন্যই চক্রশক্তির কোনও জাতি ভারতীয়দের কারারুদ্ধ করে নি। তাদের ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাই আছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ভারতবাসী যদি ব্রিটেনের যুদ্ধে জড়িত হয়ে না পরে তা হলে চক্রশক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এতটুও নাই।

৬। জাপানকে ধন্যবাদ

[আজাদ হিন্দ রেডিও (জার্মাণী) থেকে ৬ই এপ্রিলের বক্তৃতা]

জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার উত্তরে আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে আপনাদের কাছে কথা বলছি।

সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন হলে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো দু'টি ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণাগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মনোভাব কি তা উত্তরে বলা উচিত। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি জাপানের প্রধান মন্ত্রীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে খোলাখুলি ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ এই উক্তি যে তিনি করেছেন তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবেই ইতিহাসে লিখিত হবে। ১৯০৪-৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে ভারতবাসীরা জাপানের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! জাপানের মারফতেই প্রথম এশিয়া তার আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিনি এশিয়া থেকে এ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সমূলে ধ্বংস করতে বদ্ধ পরিকর. এই ঘোষণা আমি সমর্থন করি। এ না হলে এশিয়ার আপদ চিরদিনই থাকবে। এশিয়া, বিশেষ করে ভারতবর্ষ, ত্রিশক্তির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে যদি এই আপদ তারা দূর করতে পারে। এ্যাংলো-আমেরিকার বিরুদ্ধে ত্রিশক্তির বর্ত্তমান সংগ্রাম ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবাসীরা তাই এ্যাংলো-আমেরিকার একটির পর একটি পরাজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

ভারতবর্ষে কিছু কিছু লোক কোনও কারণে ব্রিটেনের সহায়তা করছে এটা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। যে দেশ দীর্ঘকাল পরাধীন হয়ে আছে সেখানে এমন হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে একটুও অতিরঞ্জিত না করে আমি বলতে পারি ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে উন্মুখ হয়ে আছে। তাদের কাছে এই যুদ্ধ তাদের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত কামনা স্বাধীনতা লাভের জন্য ভগবৎ প্রেরিত সুযোগ।

ভারতবর্ষের লোকেদের বেশ মনে আছে গত যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজ-

নীতিকেরা তাদের কেমন প্রবঞ্চিত করেছে। এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি তারা আর চায় না। তারা জানে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পুনঃপুনই সংঘটিত হয়েছে। কাজেই তারা চিরকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করতে চায়। তারা জানে যে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দস্যুতা ও দুর্নীতি দিয়ে এবং টিঁকে আছে অন্যায় আর অত্যাচারের বলে।

আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে আশ্বাস দিচ্ছি যে ভারতবর্ষ এ সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট হতে দেবে না। এমন সুযোগ জাতীর জীবনে একবারই আসে। যে দু'টো কারণে ভারতবর্ষ পরাধীন হয়ে আছে, সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে. দেশের মধ্যে ঐক্য নেই, তা ভারতবাসীরা বেশ ভালই জানে। যে তিক্ত ব্যথাময় অভিজ্ঞতা দি'য় তারা এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে তা ভারতবাসী কখনই ভুলবে না। অতীতে ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন যেমন আত্মসচেতন ও প্রগতিশীল ছিল তেমনি ভবিষ্যতেও প্রত্যেক জাতির সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে সে চলবে, বিশেষ করে মিত্রতা করবে ত্রিশক্তির সঙ্গে। এই ভাবে মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ করে তুলবে। জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করে এক স্বাধীন সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী এশিয়া সৃষ্টি করবার গৌরবময় দায়িত্বও ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

৭। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

[আজাদ হিন্দ রেডিও (জার্মাণী) থেকে ১৯৪২ এর ১০ই এপ্রিলের বক্তৃতা]

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে বক্তৃতা করছি। ভাইবোনেরা, এটা শুনে আমি ব্যথিত হয়েছি যে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব অতি অদ্ভুত জেনেও আমাদের দেশের কোন কোন নেতা এখনও পরিশ্রম করে মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের প্রতিনিধি স্যার ক্রীপ্‌সের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন।

সামরিক দিক থেকে ভারতের সীমান্ত থেকে দূরে বলে এবং ব্রিটিশ প্রচারের বিষক্রিয়ায় আমাদের দেশের বহুলোক এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাজেই ব্রিটিশ যদি বর্ত্তমান প্রস্তাব অপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কোনও সর্ত্ত দিত তা হলেও ব্রিটিশের মত কোন শক্তির সঙ্গে বর্ত্তমানে চুক্তি করতে যাবার কোনই অর্থ হয় না। আজ এমন একজনও ভারতীয় নেই যে ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে, যে প্রতিশ্রুতি যুদ্ধের পরে পূরণ করা হবে। বর্ত্তমানের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমাদের কোনও কোনও উদারপন্থী নেতা একটা বোঝাপড়া করে নেবার চেষ্টা করছেন; তাঁদের ধারণা যে মিত্রশক্তি ও ডোমিনিয়নগুলো যুদ্ধের পরে ব্রিটিশকে তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য করবে। কিন্তু এই রকম বাধ্য করবার ভার নেবার কি অর্থ হয়? আমাদের এমন ক্ষমতা কোথায় যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জোর দিতে পারব? প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা সর্ত্তের কি হয়েছে তা কি আমরা ভুলে গেছি? আমরা কি ভুলে গেছি যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি রোনাল্ড ডোনভান প্রেসিডেন্টের চিঠিসহ সুদূর আমেরিকা থেকে বলকানে এসে বল্কানবাসীদের চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেছিল? এই সব রাষ্ট্র সত্যিই চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চক্রশক্তি দ্বারা উৎখাত হয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছিলেন, যদিও লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি ভোলেন নি—এ কথাও কি আমরা ভুলেছি? আমি বেশ জানি আমাদের দেশের কিছু লোকের দৃষ্টি না খুললেও অধিকাংশ বুঝতে পেরেছে যে আমেরিকা উন্মাদের পিতার ভূমিকায় করছে এবং তারা মনে করে ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তারা উত্তরাধিকারী। যারা এখন ব্রিটিশের দাসত্ব করছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে

তাদের দেখে এখন হাসিই পায়। অতীতের আর সব সাম্রাজ্যের মতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ একই পরিণতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে আর কেউ বঁচাতে পারে না। ভারতবর্ষ যদি তার সব সম্পদ ও জনবল নিয়ে ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করে তবুও সাম্রাজ্যের পতন রোধ করা সম্ভব নয়। অতীতে ভারতবর্ষকে দাস করে রেখে যে শোষণ চালিয়েছে তার ফল এখন তাকে ভোগ করতেই হবে। কাল যদি ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্টও প্রতিষ্ঠিত হয় তবু এই যুদ্ধ কালে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে তাকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করা সম্ভব নয়। এই সব কথা মনে করলে সত্যিই আশ্চর্য্য মনে হয় না কি যে আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিকেরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ধার কর্ত্তা। এই সব ভদ্রমহোদয়রা অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছেন। ব্রিটেন তাঁদের কায়দা করে উচ্চপদ দিয়েছে বলেই তাঁরা ভুলে যান যে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটেনের পদানত। তাঁরা জগতের প্রগতিপন্থী শক্তির সঙ্গে একত্রিত হবার কথা বলেন। তাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় কথা সোজাসুজি বলেন না, বলেন যে চীন, রাশিয়া ও আমেরিকার সহযোগিতা করতে। আসলে এটা উদ্দেশ্য গোপন করবার উপায় মাত্র। কিন্তু এভাবে উদ্দেশ্য গোপন করা যায় না, কারণ ভারতবাসীরা জানে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। আমি একটা বিষয়ে দেশবাসীকে সাবধান করে দিতে চাই। বর্ত্তমানে ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টার অর্থ ভারতে যুদ্ধ ডেকে আনা। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তার ফলে ত্রিশক্তি ভারত আক্রমণ করবে এবং ভারত-বাসীরাও তা হলে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করবে। ত্রিশক্তি অপরদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিই ঘোষণা করেছে। তারা যেমন শান্তিপূর্ণ আয়ারলণ্ডকে আক্রমণ করতে চায় না, তেমনি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবারও তাদের কোন ইচ্ছা নেই। তাদের

একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সামরিক ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা, কারণ তা না হলে যুদ্ধ যে সম্ভব নয়।

ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় যোগ দিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে ভারতবর্ষকে ত্রিশক্তির শত্রুতে পরিণত করা। ফলে ত্রিশক্তিকে ভারতবর্ষের সামরিক ঘাঁটিগুলো আক্রমণ ত করবেই উপরন্তু যে সব ভারতবাসী ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করছে তাদেরও আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। যাঁরা এখন বোঝাপড়ার জন্য চেষ্ট করছেন তাঁরা যে ভারতবর্ষে যুদ্ধ টেনে আনছেন, একথা কি ভেবে দেখেছেন? বোঝাপড়ার আশু ফল হবে ভারতের মাটতে যুদ্ধ ডেকে আনা, ভারতের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করা এবং স্বাধীনতা সুদূরপরাহত করা। বোঝাপড়া হয়ে গেলে সম্প্রীতিকারদের ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং ইংলণ্ডের পরাজয়ের সকল গ্লানি ও ঘৃণায় অংশীদার হতে হবে।

পরাজিত হবার প্রাক্কালে ইংরেজেরা দেশের সব কিছু জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে, যেমন জেনারেল ম্যাক আর্থার ও ওয়েভেল অন্যদেশে করেছেন। ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধের সীমার বাইরে, তখন ব্রিটিশ কেন চেষ্টা করছে ভারতবর্ষে যুদ্ধ ডেকে আনতে? আমাদের দেশবাসীদের যে শুধু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সহ্য করতে হবে তা নয়, এমন একটা যুদ্ধে যোগ দিতে হবে যার পরিণাম নিশ্চিত পরাজয়। আমাদের দেশবাসী একবার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবে ব্রিটিশের অবস্থা কেমন সঙ্গীন। আফ্রিকায় প্রথম দিকে খানিকটা জিতবার পরে তারা এখন পালাতে পথ পাচ্ছে না। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য তারা এতদিন দখল করে রেখেছে। ও সব দেশের অবস্থা বারুদখানার মত হয়ে আছে, শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ সংযোগে তা দপ করে জ্বলে উঠবে। সুদূর প্রাচ্যের সব জায়গা থেকে জাপানীরা তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার একমাত্র ভরসাস্থল ভারতবর্ষ, তাই স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস্ আজ আমাদের দ্বারদেশে উপস্থিত, কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যের নিশ্চিত

ধ্বংস বাঁচাতে অক্ষম। ভারতবর্ষ এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে থেকে হয় ধ্বংস হয়ে যাবে না হয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস্ যদি সত্যিই ভারতবর্ষের বন্ধু হন তা হলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বাইরে রাখবারই চেষ্টা তিনি করবেন। তা হলে ভারতবর্ষ নিজের ঘর সামলিয়ে স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে। ব্রিটিশ এখন বুঝতে পেরেছে ভারতবর্ষে তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আর নেই। তাই তারা মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের শরণাপন্ন হয়েছে, এই জন্যেই লুই জনসন হোয়াইট হাউস থেকে চিঠি নিয়ে ভারতে এসেছেন। আমেরিকা ভারতবাসীদের ভয় দেখাচ্ছে যে মিঃ চার্চিল ও ওয়াশিংটনের প্রস্তাব গ্রহণ না করলে বিষময় ফল হবে। আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করছি ওরা যেন ব্রিটিশের প্রচারে না ভোলেন। মিত্রশক্তির রাজনীতিকদের চালে ধরা পড়া ভারতের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর হবে। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে আমাদের দেশকে আগামী রণক্ষেত্রে পরিণত হতে বাধা দেওয়া। তা সম্ভব হবে শুধু ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে ভারতবর্ষকে ব্রিটেন যদি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার না করে তা হলে ত্রিশক্তি ভারতবর্ষ কিছুতেই আক্রমণ করবে না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখবার পরে আমার দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ যে দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন আরও জোরালো করে তুলতে হবে। ব্রিটেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে, এখন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার জন্য এর চাইতে ভাল সংযোগ আর কি আশা করা যেতে পারে?

পরিশেষে দেশবাসীকে বলতে চাই আমরা যারা ভারতবর্ষের বাইরে আছি তারা চুপ করে ঘরে বসে নেই। আমরা আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—যে সংগ্রামে

ভারতের চির আকাঙ্খিত স্বাধীনতা আসবে। আমরা জানি যে নৌশক্তির বলে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তা এখন অতীতের কাহিনী। আমরা জানি ব্রিটেনের এমন বিমান বহর বা জনবল নাই যা দিয়ে ভারতবর্ষে জাপানের বিরুদ্ধে তারা লড়তে পারে। কাজেই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আমাদের ভারত অভিমুখে অভিযান করতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। ভগবানের কৃপায় আমরা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই লাভ করব।

৮। চক্রশক্তি ও ভারতবর্ষ

(বার্লিন থেকে ১লা মে, ১৯৪২ সালের বক্তৃতা)

ভাইবোনেরা,

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে জালিয়াওয়ালাবাগ দিবসে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করেছিলাম। ব্রিটিশের প্রস্তাবের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে আমি তখন আপনাদের বলেছিলাম। এই প্রস্তাব নিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস্ একদিকে যুদ্ধের পরে ডোমিনিয়ন স্টাটাস দেবার প্রস্তাব করেন অপরদিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দাবী করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে ভারতবাসীরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে। এই ঘৃণ্য প্রস্তাব যে একবাক্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এটা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই আনন্দের কথা। তবু আমি একথা বলতে বাধ্য যে স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রিপস্ ভারতবর্ষ থেকে যাবার পরে এবং ব্রিটেন ভারতের দাবী স্বীকার করতে অস্বীকার করবার পরেও আমাদের দেশের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ব্রিটিশের সঙ্গে বিনাসর্ত্তে সহযোগিতা করবার কথা বলছেন, তা জেনে আমি বিস্মিত হয়েছি।

মানুষের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে এই সব ভদ্রমহোদয়েরা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করেছেন তা ভুলে গেছেন? ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত আমরা কি প্রতিবারই

ঘোষণা করি নি যে আবার যুদ্ধ বাধলে আমরা তাতে যোগ দেব না, আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে টানতে চায় তবে যথাশক্তি বাধা দেব? ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হলে কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিনাসর্ত্তে সহযোগিতা করতে কি অস্বীকার করে নি? এম, এন, রায়ের মত খ্যাতিমান নেতা বিনাসর্ত্তে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করবার কথা বলেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হয় নি কি? এই সব ভদ্রমহোদয়েরা যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা করা হয় আমরা তা দেখতে চাই। আমি জানি সহযোগিতা সম্পর্কে এই সব নতুন চাঁইয়েরা বলবে যে বহিঃশত্রু আক্রমণের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেই তাঁরা পুরাতন নীতি পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতবাসী এতকাল সংগ্রাম করে আসছে তা ধ্বংস হয়েছে কি? ব্রিটিশ যা প্রচার করছে বা ভবিষ্যতে যা প্রচার করবে তা সত্ত্বেও চিন্তাশীল প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এটা পরিষ্কার যে ভারতবর্ষের একটি মাত্র শত্রু আছে। এই শত্রু ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছে, বছরের পর বছর ধরে শোষণ করছে। এই শত্রু হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের কেউ কেউ ব্রিটিশ প্রচারের গুণে এই শত্রুকেই ভুলে যেতে বসেছে যে, একমাত্র শত্রু আজও ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রেখেছে। এই সব ভ্রান্ত লোকেরা জাপানী আক্রমণের কথা বলে, জার্মাণী, ইটালীর অত্যাচারের কথা বলে, কিন্তু তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন নীতি অবলম্বন করেছে তার কিছুই তারা জানে না।

বন্ধুগণ, আমি এই সব শক্তি ও তাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি। আমি দেশ ছেড়ে আসবার পর থেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রেখেছি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে

এই সব শক্তি চায় যে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করুক। ত্রিশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে বদ্ধ-পরিকর। ভারতের যুবক সম্প্রদায়, যাদের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ, তাদের কর্ত্তব্য বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভস্ম-রাশির ভেতর থেকে মূর্ত্ত স্বাধীন ভারত জন্মলাভ করতে পারে। আমি ত্রিশক্তির উকিল নই, তারা কি করেছে বা করবে সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাই না। নিজেদের কাজের সমর্থনে যা বলবার তারাই বলবে। আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় ভারতবর্ষ। দেশকে আমি ভালবাসি, তাই আমার কর্ত্তব্য প্রত্যেক জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নীতি অনুসন্ধান করা এবং তা দেশবাসীকে জানানো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। যদি কোন রকমে অসম্ভব সম্ভব হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধে জয়লাভ করে, তা হলে ভারতের চিরকাল দাসত্ব করতে হবে। কাজেই স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে একটি বেছে নিতে হবে, এবং স্বাধীনতার পথই নিশ্চয় সে গ্রহণ করবে। ভারতবাসীর কাছে, ভারতবর্ষের সামনে যে সুযোগ এসেছে তা জীবনে মাত্র একবারই আসে।

বন্ধুগণ, আমার শুনে হাসি পায় যখন ব্রিটিশ প্রচারকেরা আমাকে শত্রুর চর বলে। দেশবাসীর কাছে আমি যখন কথা বলি তখন আমার কোন পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয় না। আমি আজীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে যে সংগ্রাম করে এসেছি তা থেকেই দেশবাসী আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। বর্ত্তমানে যে কোনও ভারতীয়ের চাইতে আমি বৈদেশিক রাজনীতি ভাল বুঝি এবং আমি ছেলেবেলা থেকে ইংরেজকে জানি। আমি চিরজীবন ভারতবর্ষের সেবা করেছি এবং আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেবা করবো। একমাত্র ভারত-বর্ষের প্রতিই আমার চিরকাল আনুগত্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

প্রধান মন্ত্রী তোজো 'ভারতবাসীর জন্যেই ভারতবর্ষ', এটা ঘোষণা করবার পর ব্রিটিশ প্রচারকেরা জব্দ হয়েছে। এখন তারা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করছে চীন জাপানের যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা তুলে ব্রিটিশ প্রচারকেরা এখন চীৎকার করছে যে, দেখ জাপান চীনে কি করছে। এই সব প্রচারকদের আমি বলতে চাই যে কংগ্রেস থেকে চীনে শুভেচ্ছা মিশন পাঠাবার যে প্রস্তাব হয় তা কাজে পরিণত করবার সময় আমিই ছিলাম কংগ্রেস সভাপতি। তখন মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক জাতীয় আদর্শের দিক থেকে লড়াই করছিলেন। এই জন্যই তিনি ভারতীয়দের কাছ থেকে অত সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগে মার্শাল যখন ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ করতে বললেন তখন তিনি সম্পূর্ণ একজন স্বতন্ত্র মানুষ। তিনি এ্যাংলো-আমেরিকার ক্রীড়নক মাত্র। যে জাপানের সঙ্গে তিনি এখন যুদ্ধ করছেন সে জাপানও এখন স্বতন্ত্র। জাপান এখন যুদ্ধ করছে ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে, তারা প্রাচ্য থেকে এ্যাংলো-আমেরিকান প্রভুদের উচ্ছেদ করতে চায়। চিয়াং-কাই-শেক যদি তাঁর অ্যাংলো-আমেরিকান প্রভুদের হাত থেকে মুক্তি পান, তা হলে জাপানের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি তিনি অনায়াসেই করতে পারেন।

৯। দেশবাসী, সংগ্রাম চালিয়ে যাও

[আজাদ হিন্দ রেডিও (জার্মাণী) থেকে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪২ সালের বক্তৃতা]

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে আমি সুভাষচন্দ্র বসু আপনাদের কাছে কথা বলছি।

বন্ধুগণ, দুই সপ্তাহ আগে আপনাদের কাছে শেষ বক্তৃতা করবার পর ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম অবাধ গতিতে চলেছে। এই আন্দোলন আগুনের মত সহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ বলতে

চেষ্টা করছেন যে আন্দোলন কমে এসেছে এবং তা থেমে যাবার মত। এ চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়েছে। কারণ বি. বি. সি একই সঙ্গে এ খবর দিতে বাধ্য হয়েছে যে দেশের সর্ব্বত্র নিরস্ত্র জনতার উপর আরও গুলী চলেছে। ব্রিটেন ঢাকা দেবার যতই চেষ্টা করুক ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর আর সব জাতির কাছ থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেকটি সংবাদ, সহর বা গ্রামের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি গুলী চালনার সংবাদ তা সে রামনাথ, ওয়ার্ধা, বিক্রমপুর অথবা লক্ষ্ণৌ যেখানকারই হউক না কেন, পর মুহূর্ত্তে মিত্রশক্তির বিরোধী অথবা নিরপেক্ষ জাতিদের দেশে রেডিও এবং খবরের কাগজে তা ঘোষিত হয়। বন্ধুগণ, আমি জানি যে পূর্ব্বেকার সংগ্রামের জাতীয় খবর বাইরে পাঠাতে আমাদের কত কষ্ট হত। আজ আর এটা কোন সমস্যাই নয়। আজ আমার কাজ বাইরের জগতকে ভারতবর্ষের ঘটনা জানিয়ে দেওয়া এবং ভারতের প্রয়োজন কালে তাকে সাহায্য করা। ভারতের এই মহাসংগ্রাম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বন্ধুদের দ্বারা যে সব সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা যদি আপনারা নিজ চোখে দেখতেন এবং কানে শুনতেন, তা হলে আপনারা বুঝতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের কাছে ভারতবর্ষ কতখানি সহানুভূতি পায়। ব্রিটিশের অত্যাচার যতই বাড়বে এই সহানুভূতি ও ততই বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য আমরা যত আত্মবলি দেব, যত কষ্ট সহ্য করব ততই পৃথিবীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

বন্ধুগণ আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই যে আমরা পৃথিবীর কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়েছি, শুধু তাই নয় মুক্তিলাভের জন্য বাইরে থেকে সব রকম সাহায্যই পাওয়া সম্ভব। অত্যাচারে উদভ্রান্ত হয়ে যদি আপনাদের কখনও মনে হয় যে বাইরের সাহায্য দরকার, তখনি আপনারা সে কথা জানাবেন। কিন্তু এই সব বন্ধুরা আপনাদের

প্রয়োজন না হলে কোনও সাহায্য করবেন না। আমাদের জাতীয় সম্মান ও স্বার্থের কথা স্মরণ করে আমাদের উচিত তাদের সাহায্য না নিয়ে যতদিন চলে ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এখানে আপনাদের দেশবাসী যাঁরা বিদেশে আছেন তাঁরাও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

আমরা ভারতের সম্মান রক্ষা করছি, আমরা স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি। দেশে ও বিদেশে আমরা স্বাধীনতার সমর্থক। আমাদের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করব না। নীতির কথা বিবেচনা করবেন না। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা চিন্তা করবেন না, তাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমি বলছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুরা আমাদের বন্ধু, আমাকে বিশ্বাস করুন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন তাদের স্বার্থ, ভারতের মুক্তি ও তাদের স্বার্থ। তারা জানে যে যতদিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে থাকবে ততদিন তাদের জয় সম্পূর্ণ হবে না, শান্তি স্থাপিত হবে না। রাজনীতির দিক থেকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না যে বৈদেশিক জাতিদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হলে তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে গত কয় মাস ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। লণ্ডন যখন পৃথিবীর প্রধান নগরী ছিল, সে দিন আর নাই। সে দিনও আর নাই যখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্টকে ইয়োরোপে এসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হত। ইংরেজ কবি টেনিসন বলেছেন "Old order changeth yeilding place to new, and God fulfils himself in many ways" ফলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন দৌড়তে হচ্ছে এবং ইংলণ্ডে যে সব আমেরিকান আছেন তাদের ওপরে ইংরেজের আইন প্রযোজ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমেরিকান সৈন্য ব্রিটিশ সেনানায়কের হুকুম মান্য করতে অনেক

জায়গাতেই অস্বীকার করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটেন এবং তার সাম্রাজ্য রুজভেল্টের নূতন সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ প্রাচীন সাম্রাজ্যে থাকতে চায় না, তাই এখন তাকে প্রাচীন এবং নূতন দু'টো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। এই পরিবর্ত্তনে সব চাইতে কৌতুককর বিষয় হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত, ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রু, সর্ব্বপ্রকার সমাজতান্ত্রিক মতের প্রধান বিরোধী ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলকে তার প্রাচীন সব অহঙ্কার ভুলে মস্কৌতে ক্রেমলিন প্রাসাদ-দ্বারে উপস্থিত হতে হয়েছে।

এটা কি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ নয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রতিনিধি মরিয়া হয়ে আর সব কিছু করবে কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করতে কিছুতেই রাজী হবে না? ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। এই মণি রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করবে। প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষ করে নেতাদের, তাঁদের মন থেকে এ আশা বিসর্জ্জন দিতে হবে যে কোন দিন ব্রিটিশ ভারতের দাবী স্বীকার করবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত শেষ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে তাড়িত না হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে। আমাদের সংগ্রামের শেষ দিকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে, বহু অত্যাচার, অনাচার, হত্যা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এ মূল্য আমাদের দিতেই হবে। এত অত্যন্ত স্বাভাবিক যে শেষ সময়ে ব্রিটিশ সিংহ একটা মরণ কামড় দেবে, কিন্তু সে কামড় মৃতপ্রায় সিংহের। কাজেই তা সত্ত্বেও আমরা বাঁচব।

বন্ধুগণ, এই সঙ্কট কালে আমাদের নীতি হবে ফলাফল বিবেচনা না করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়বে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন সত্যিই ভাঙ্গবে তখন ক্ষমতা স্বভাবতই ভারতীয়দের হাতে এসে পড়বে। আমাদের জয় সম্ভব হবে

আমাদের চেষ্টার দ্বারাই। কাজেই আমাদের যদি সাময়িক পরাজয় হয় তাতে ক্ষতি নেই। কারণ আমাদের মেসিন গান, বোমা, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সর্ব্বপ্রকার বাধা ও বিপত্তি সত্বেও আমাদের কাজ হবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যতদিন আমাদের মুক্তি না আসে।

নেতারা কারারুদ্ধ বলে দমে যাবার কিছু নেই। বরং তাদের কষ্ট সমগ্র জাতিকে প্রেরণা দেবে। গত বিশ বছর ধরে আমি সংগ্রাম চালাতে চেষ্টা করেছি, সকলে কারারুদ্ধ হলেও। যাঁরা এখন সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে দূরে আছেন তাঁরা আপনাদের একটি কর্ম্মপন্থা দিয়েছেন, সেটা আপনাদেরই কার্য্যে পরিণত করতে হবে।

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে আমি বিদেশে এমন কোন কাজ করছি না যা দেশবাসী চায় না, এমন কোন কাজ করব না যা দেশবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে না। দেশ ছেড়ে আসবার পর থেকে আমি নানা ভাবে দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখেছি যদিও ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের গোয়েন্দা বিভাগ খুবই সতর্ক হয়ে আছে। গত কয়েক মাসে আপনারা পরিচয় পেয়েছেন যে আপনাদের কত খবর আমি রাখি; এত দিনে আপনাদের অনেকেই জানেন যে ইচ্ছা করলেই আমার কাছে কি ভাবে সংবাদ পাঠানো যায়। আমি বলতে পারি এখন আমার ভারতবর্ষে যাওয়া এবং চলে আসবার পথে বাধা দিতে ইংরেজের সাধ্য নাই। আজাদ হিন্দ রেডিও এবং আমার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে গোপন রিপোর্ট দিয়েছেন তা আমি দেখেছি; দেখে আমার হাসিই পেয়েছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলে যে তারা আমার সম্বন্ধে সব জানে তা হ'লে ত আমার আর উপায় নাই; কিন্তু একদিন তাদের সঙ্গে আমি এমন যুদ্ধের সুযোগ পাব যে তারা টের পাবে। এ কথা বলতে কোনও ক্ষতি নাই যে তারা শত্রুদের দেশে যে পন্থা অবলম্বন করছে তা আমাদের লোক বিশ্লেষণ করে দেখছে এবং তারা এই

উপায়গুলোকে আমাদের চিরশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করতে পারবে।

বন্ধুগণ, যে সব দেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আজও আছে তারা হয় বিদ্রোহ করছে, না হয় বিদ্রোহের আয়োজন করেছে। যদি আমরা ভারতবর্ষে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাই তা হলে শুধু যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা এগিয়ে আসবে তা নয়, সমস্ত পরাধীন জাতির মুক্তি তাতে সহজ হবে। ভারতীয়েরা যদি চুপ করে বসে থাকে তবে ব্রিটিশের শত্রুরাই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দেবে। যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে যে সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পরে আমাদের কি হবে? অন্যান্য শক্তির কাছ থেকে আমরা কি স্বাধীনতার অধিকার দাবী করব, না নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করব? আমি মিঃ জিন্নাকে ও মিঃ সাভারকর প্রমুখ নেতারা যাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ইচ্ছুক তাঁদের এই কথাটা বুঝতে অনুরোধ করছি যে আগামী দিনের জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ও দল যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে আগামী দিনে তারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত সম্মানের আসন লাভ করবে। তাই আমি প্রত্যেক দলকে অনুরোধ করছি তারা যেন জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবিরোধিতার দিক থেকে সব কথা বিবেচনা করেন এবং আমাদের এই স্মরণীয় সংগ্রামে যোগ দেন। মুশ্লিম লীগের যে সকল প্রগতিশীল সভ্যের সঙ্গে আমার ১৯৪০ সালে করপোরেশনের কাজে সহযোগিতা করবার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের কাছে আমি আবেদন করছি। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দল মজলিস-ই-অহ্‌রর-এর কাছে আবেদন করছি যাঁরা আর কোন দল ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টায় বাধা দেবার আগে ১৯৩৯ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেছিল। বিখ্যাত দেশ প্রেমিক কিফায়েৎ উল্লা পরিচালিত মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞদের দল জমিয়েৎ-উল-উলেমার কাছে

আবেদন করছি। ভারতবর্ষে আর একটি শক্তিশালী মুসলমান দল আজাদ মুসলিম লীগের কাছেও আমি আবেদন করছি। শিখদের প্রধান দল আকালি পার্টির কাছে আবেদন করছি। সর্ব্বশেষে আবেদন করছি বাংলা দেশের আস্থাভাজন কৃষকপ্রজা দলের কাছে। এ দলে বিখ্যাত দেশপ্রেমিকেরা আছেন। আমার একটুও সন্দেহ নাই যে এই দলগুলোর সবাই যদি আমাদের আন্দোলনে যোগ দেয়, তবে আমাদের স্বাধীনতা এগিয়ে আসবে।

আমাদের দেশে এখন যে আন্দোলন চলছে তাকে অহিংস গরিলা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতির পথ অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের কার্য্যাবলী দেশের সর্ব্বত্র এমন ভাবে বিস্তৃত করতে হবে যে ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশ যেন কোন এক জায়গায় তাদের আক্রমণ সংহত করতে না পারে। গরিলা যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী আমাদের অত্যন্ত চলমান অবস্থায় থাকতে হবে এবং সর্ব্বদা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যেতে হবে। গবর্ণমেণ্ট যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে যে পরবর্ত্তী আঘাত কোনখানে পড়বে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। কেন এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে তা আমি জানি। গরিলা যুদ্ধের নীতি সম্বন্ধে আমি এখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছি, তাই আপনাদের আমি এমন পরামর্শ দিতে পারি যা অনুসরণ করলে এই সংগ্রাম সফল করে তুলতে পারবেন। গরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে দু'টো। প্রথমত সমর প্রচেষ্টা ধ্বংস করতে হবে, দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ শাসন অচল করে তুলতে হবে। এই দু'টো উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। প্রথমত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সব কর দেওয়া বন্ধ করুন। দ্বিতীয়ত শ্রমিকদের সব কারখানাতে হয় অবস্থান ধর্ম্মঘট করতে হবে কিম্বা কাজে ইচ্ছে করে ঢিলে দিতে হবে। নাট বল্টু খুলে ধ্বংসের কাজ সুরু করে দিয়ে উৎপাদন কমিয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত ছাত্রেরা গরিলা

দল গঠন করে দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসাত্মক কাজ আরম্ভ করবে। ব্রিটিশ সরকারকে উত্যক্ত করবার জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যথা পোষ্টাফিসে গিয়ে টিকিট পুড়িয়ে দেওয়া, ব্রিটিশ মনুমেণ্ট ধ্বংস করা ইত্যাদি। চতুর্থত মেয়েরা বিশেষ করে ছাত্রীরা সব রকম গোপন কাজের সহায়তা করবে, বিশেষ করে গুপ্ত সংবাদবাহীর কাজ অথবা সংগ্রামশীল পলাতকদের আশ্রয় দেবার কাজ। পঞ্চম, যে সব সরকারী কর্ম্মচারী আন্দোলনে যোগ দিতে চায় তারা পদত্যাগ না করে গবর্ণমেণ্ট আফিসের ও সমর শিল্পের সব খবর দেবে এবং উৎপাদনের কাজে ঢিলে দিয়ে বাধা সৃষ্টি করবে। যারা ব্রিটিশের গৃহে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত তাদের প্রভুদের উত্যক্ত করে তুলতে হবে। তারা মাইনে চাইবে বেশী, খারাপ রান্না করবে, খারাপ খাদ্য ও পানীয় দেবে। সপ্তম, ভারতীয়েরা সকলে ব্যাঙ্ক, সদাগরী অফিস, ও ইন্সিওরেন্সের সব কাজ বন্ধ রাখবে। অষ্টম কর্ণেল ব্রিটন বি. বি. সি থেকে যা বলে তাই শুনে ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাঁর নির্দ্দেশগুলো কাজে লাগাতে হবে।

জনসাধারণের জন্য আমি এই কাজগুলো করতে বলি :

(ক) ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জন, ব্রিটিশের দোকান ও গবর্ণমেণ্ট স্টোর থেকে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ,

(খ) ভারতবর্ষে যে সব ব্রিটিশ আছে অথবা যারা ব্রিটিশকে সমর্থন করে তাদের বয়কট করা,

(গ) গবর্ণমেণ্টের নিষেধসত্ত্বেও সভা করা ও বিক্ষোভ দেখানো,

(ঘ) গোপন প্রচারপত্র ছড়ানো, গোপন বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করা,

(ঙ) গবর্ণমেণ্টের ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের গৃহে চড়াও করে তাদের ভারত ত্যাগ করতে বলা,

(চ) শোভাযাত্রা করে গবর্ণমেণ্ট আফিস, সেক্রেটারিয়েট, আদালত প্রভৃতি চড়াও করে শাসনকার্য্যে বাধা সৃষ্টি করা,

(ছ) পুলিস ও মিলিটারির আক্রমণ করবার সম্ভাবনা থাকলে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা,

(জ) যে সব গবর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরী ও অফিসে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে সেগুলোতে আগুন দিয়ে দেওয়া,

(ঝ) ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কাজে যতটা সম্ভব বিপত্তি ঘটানো,

(ঞ) রেল, ট্রাম, বাস চলাচল বন্ধ করা, যদি তা করে সৈন্য এবং সমরোপকরণ চলাচলের বাধা দেওয়া যায় এবং

(ট) স্থানে স্থানে থানা, রেলস্টেশন এবং জেল ভেঙ্গে ফেলা

বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আমি নিশ্চয় করে বলছি যে এই কর্ম্মপন্থা কাজে পরিণত করলে শাসন ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়বে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে বলতে চাই যে অহিংস গরিলা যুদ্ধে কৃষকদের অংশ অপরিহার্য্য। আমি জেনে খুসী হয়েছি যে বিহার ও মধ্য-প্রদেশে কৃষকেরা এগিয়ে এসেছে। আমি আশা করি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও অন্যান্য কৃষাণ নেতারা যাঁরা ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আগেই সংগ্রাম সুরু করেছিলেন, তাঁরা এখন এগিয়ে এসে এই অন্দোলন জয়যুক্ত করবেন। সহজানন্দ এবং অন্যান্য কৃষাণ নেতাদের কাছে আমি আবেদন করছি তাঁরা এই শেষ সংগ্রামে এগিয়ে এসে তাঁদের উপযুক্ত কাজ সম্পূর্ণ করুন। আমরা স্বরাজ চাই জনসাধারণের জন্য। স্বরাজ চাই শ্রমিক ও কৃষকের জন্য। তাই শ্রমিক ও কৃষকের কর্ত্তব্য হচ্ছে জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে থাকা, বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচিত হচ্ছে। যারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে ক্ষমতা আসবে তাদেরই হাতে। এটাই নিয়ম। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে সেটা খুব আশার কথা। বরোদা, মহীশূর এবং হায়দারাবাদ থেকে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গেছে।

আমার বিশ্বাস যে, সেদিন অতি নিকটে যখন সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও দেশীয় নৃপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। সব চাইতে বড় খবর যে দেশের আহ্বান সৈনিকদের কাছে প্রবেশ করেছে। ব্রিটিশ নির্ম্মম ভাবে সেই সৈন্যকে কোর্ট মার্শাল করেছে। কিন্তু এ আগুন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইজিপ্টে অনেক সৈন্য স্বেচ্ছায় গিয়ে চক্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তারা সাদরে গৃহীত হয়েছে। 'এল্ এলামিনে'র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য অপসারিত করা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের বোঝাবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকজন বন্ধুকে এখানে আনা হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমি বাইরে সব খবরই দিতে পারব এবং ব্রিটেনের শত্রুদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের জন্য সব রকম সাহায্য আদায় করে নেব।

সর্ব্বশেষে আমি বলছি এই আন্দোলন কয়েক সপ্তাহ ধরে, দরকার হলে কয়েক মাস ধরে চালাতে হবে। যদি অহিংস গরিলা যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলে তবে তা হলে স্বাধীনতা লাভ হবেই। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে হেরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলবেন না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ দশা উপস্থিত।

সেই সঙ্গে সব রকম অত্যাচার সহ্য করবার জন্য তৈরী থাকবেন। কারণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পূজারী ও আটলান্টিক চার্টারের প্রণেতা ভবিষ্যতে বহু অত্যাচার করবে। সাহস সঞ্চয় করে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যান! এই ধ্বনি চারিদিকে জাগিয়ে তুলুন, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

১০। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ

বার্লিন থেকে আমি সুভাষচন্দ্র বসু কথা বলছি ঃ

"বন্ধুগণ, রেড়িওতে আপনাদের কাছে শেষ বক্তৃতা করবার

পর আমি ইউরোপের অন্যত্র অবস্থা নিজে চোখে দেখতে ও আমার দেশবাসীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে গিয়েছিলাম। বার্লিনে ফিরে এসে আবার শর্ট 'ওয়েভ রেডিওর সাহায্যে সারা পৃথিবীতে আমার দেশবাসীর কাছে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি। দেশবাসীর কাছে আমি পৃথিবীর অবস্থা বলতে চাই, যা শুনে আমাদের দেশের প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করতে পারবে।

প্রত্যেক ভারতবাসীই জানেন যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের কোনও উন্নতি হয় নাই ও ইতিমধ্যে সামরিক পরিস্থিতি যাই হয়ে থাকুক না কেন এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে বিশ্বাস করে যে হঠাৎ ব্রিটেন যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতবর্ষের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু আমি জানি এমন কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা এক সময় বিশ্বাস করতেন যে কয়েকটা যুদ্ধে ঘা খেলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটু নরম হয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলবে। কিন্তু এ আশা সফল হয় নি, কারণ চার্চিল ও আমেরির মত সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যভাবে চিন্তা করেন এবং তাদের রাজনীতিক চালও স্বতন্ত্র। প্রথম থেকেই এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক করে রেখেছেন ভারতের স্বাধীনতা দাবীর একাংশও স্বীকার করা হবে না। সময়ের তাগিদে তারা আমেরিকার কাছে সব ছেড়ে দিতে রাজী আছে এবং পরে তাদের সব ক্ষতি ভারতবর্ষকে শোষণ করে পূরণ করে নিতে পারবে। এই কারণে স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের মত উদারনৈতিক রাষ্ট্রনেতারা, যাঁরা ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে রাজী ছিলেন, তাঁদের মন্ত্রী-পরিষদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার শাসক সম্প্রদায়ের নীতি এখন পৃথিবীর সকলের কাছেই খুব পরিষ্কার। এতে আর গোপন কিছু নেই।

আমেরিকার নেতাদের বক্তৃতা শুনলেই এ বিষয়ে সব বুঝতে পারা যায়। দাবী করা হয় যে আমাদের দেশ আমেরিকার প্রভাব-ক্ষেত্রে পড়ে, সকলকে এমন কি ব্রিটিশকেও তা স্বীকার করে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ব্রিটেনেও একটা এমন মত গড়ে উঠেছে যে ব্রিটেনের অবস্থা এখন দ্বিতীয় স্তরের এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে আমেরিকার প্রভাবই যে বেশী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কাজেই ব্রিটেনের এখন উচিত হবে কোনও রকমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জিইয়ে রাখা। ব্রিটেনের রাজনীতিকদের দৃঢ়তা যে শিথিল হয়ে পড়েছে তার বড় প্রমাণ এই যে তারা আগে থেকেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা করুণার উদ্রেক করবে সন্দেহ নাই। তারা সাম্রাজ্যের এক অংশ বাধ্য হয়ে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে আর অংশ স্বেচ্ছায় তাদের বন্ধুদের দিয়ে দিচ্ছে।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন গত যুদ্ধে যে ভুল করেছিলেন তা প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট আর করছেন না। কাজেই আমেরিকা এবারে আর সমরোপকরণ ও আথিক সাহায্য বিনা স্বার্থে করছে না। তাঁর গবর্ণমেণ্ট সব সময়েই নগদ টাকা দাবী করছে, ফলে সব জায়গা থেকেই ব্রিটেনের পুঁজি উবে যাচ্ছে আর আমেরিকা সেই সব দখল করছে। আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ফরাসী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘাঁটি স্থাপন করছে। এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে মনে করে যে যুদ্ধান্তে এই ঘাঁটিগুলো আবার ছেড়ে দেওয়া হবে? আমেরিকার সৈন্য এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ইংলণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষেও তারা রয়েছে। সর্ব্বত্রই এই সৈন্য পরিচালনার ভার আমেরিকানদের হাতে, এমন কি অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলণ্ডের মত দেশে ব্রিটিশ

সৈন্য আমেরিকানদের হুকুমে চলছে। অন্য ভাষায় বলতে হয় যে আমেরিকা ধীরে ধীরে অতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দখল করে নিচ্ছে।

সামরিক দিক থেকে যেমন এই দখলের কাজ এগিয়ে চলেছে তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমেরিকা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে এই যে আমেরিকার সৈন্যদের উপর কোনও দেশের আইন খাটবে না, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়। তাদের ওপরে ওয়াশিংটন থেকে সব নির্দেশ আসে এবং তাদের ওপরে একমাত্র আমেরিকার আইনই প্রযোজ্য। তাই এখন আমেরিকার খানিকটা দেশাতিক্রান্ত খানিকটা অধিকার হয়ে পড়েছে। এই ধরণের অধিকার ব্রিটিশ কিছুদিন চীন ইজিপ্ট ও অন্যান্য দেশে উপভোগ করেছে।

আমেরিকার ক্ষমতার আর একটি ব্যাপার হতে বুঝতে পারা যায়। জেনারাল দ্য'গল এবং তাঁর অনুচরদের অতিক্রম করে হোয়াইট হাউসের তাঁবেদার এ্যাডমিরাল দারল্যাঁকে উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ইঙ্গ-আমেরিকান মৈত্রীর কনিষ্ঠ অংশীদারের সব রকম প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে যেদিন বি, বি, সি থেকে মিঃ চার্চিলের ঘোষণা শুনলাম যে একজন আমেরিকার সেনানায়ক জেনারাল আইসেন হাওয়ারের আদেশ ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ মান্য করবে, সেদিন আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে ব্রিটিশ সিংহ হোয়াইট হাউসের প্রভুদের দ্বারা ভেড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ রয়েছে অনেক। একদা অসীম ক্ষমতার অধিকারী পার্লামেণ্ট দারল্যাঁর ব্যাপারটা আলোচনাও করতে পারে না, পাছে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তাতে অসন্তুষ্ট হন।

আমার দেশবাসীরা সকলেই জানেন যে আমেরিকার সৈন্য, আমেরিকার টেকনিকাল মিশন ও আমেরিকার কূটনীতিকেরা দেশে

এসেছে। আমেরিকানরা স্পষ্টই বলেছে তারা লণ্ডনের হুকুম শুনবে না, শুনবে ওয়াশিংটনের আদেশ আর এই ভাবে তারা ব্রিটেনের ওপর দিয়ে ভারতবর্ষে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে। চার্চিল এবং আমেরি হোয়াইট হাউসের প্রত্যেকটি অপমান হজম করছে কারণ তারা আশা করে এই ভাবে তারা সাম্রাজ্য কোন রকমে জিইয়ে রাখতে পারবে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তাদের চাইতে অনেক বেশী চালাক। ব্রিটেনের এই নতি স্বীকারের সুযোগ নিয়ে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ গ্রাস করবার কাজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি এখন ভারতবর্ষে একজন দূত পাঠিয়েছেন, তার নাম উইলিয়ম ফিলিপস্। এই দূত পাঠাবার কারণ তিনি বড়লাট লিনলিথগোর শাসনে সন্তুষ্ট নন। স্কটল্যাণ্ডের এই প্রাচীন জমিদারের বদলে ভারতবর্ষের একজন নতুন প্রভু লাভ হবে। সাময়িকভাবে মিঃ ফিলিপস্ এখন সিংহাসনের পেছনকার শক্তি হিসাবেই খুসী থাকবেন। যদি আমেরিকার কল্পনা সত্যে পরিণত হয় এবং কোনও রকমে আমেরিকা যুদ্ধে জয় লাভ করে তা' হ'লে বড়লাটের স্থান মিঃ ফিলিপস্ অধিকার করবেন। ভারতবাসী এটা চায় না যে একজন আমেরিকার দূত বড়লাটের গদীতে চড়ে বসুক, তাই আমাদের আমেরিকার দিক থেকে যে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গেও লড়তে হবে।

দেশবাসী ও বন্ধুগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের ব্যাপারে আমেরিকার চালে যেন আমরা না ভুলি। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে আমেরিকার অনেক লোক আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাদের গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবান্বিত করবার মত ক্ষমতা তাদের নেই। আমেরিকায় ভারতবর্ষের প্রতি সরকারী নীতি ব্রিটিশের মতই সাম্রাজ্যবাদী। যদি হোয়াইট হাউসের ইচ্ছা থাকত তাহলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য

হোয়াইট হলকে চাপ দিতে তারা পারত, কিন্তু তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ দখল করবার চেষ্টায় আছে। এখন মিঃ ফিলিপস্ ভারতবর্ষে এসেছেন ভারতীয়দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামাজিক সম্বন্ধ করতে, যাতে সময় কালে তিনি আমেরিকার সৈন্যদের সাহায্যে সহজেই লিনলিথগো এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার কাজ হাত দিতে পারেন। বন্ধুগণ সাবধান, তাঁকে বয়কট করুন।

ত্রিশক্তি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তা হলে কি হবে তাই ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা কিছুদিন থেকে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে আর ছোট ছোট দেশ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কি ভয়াবহ পরিণাম হবে তাই চিন্তা করে দুঃখে অশ্রুমোচন করছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সমগ্র মানবসমাজের এক পঞ্চমাংশ, আমরা জানি তথাকথিত মসিমসিত জাতিগুলো জয়লাভ করলে আমাদের কি হবে। যে আটলাণ্টিক চার্টার সম্বন্ধে আমরা এত শুনেছি তা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা সর্ত্তের মত একটা কাগজের টুকরো মাত্র। কিন্তু এ চোঁথা কাগজে যা ব্যবস্থা আছে তাও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলা হয়েছে, কারণ ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তিগুলো স্পষ্টতঃই সাম্রাজ্যবাদী।

যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা একটা পরিকল্পনা করেছে এবং যদি বৃটিশ রাজনীতিকেরা বিনা বাধায় তা কাজে পরিণত করতে পারে তবে তারা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবর্ষকে চার পাঁচটি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত করে আগের চাইতে আরো কঠোরভাবে শোষণ করে তাদের এই যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করে নেবে। তখন ইউনিয়ন জ্যাক শুধু এখনকার মত কেবল ভারতবর্ষের রাজধানীর ওপরে উড়বে না, উড়বে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, রাজস্থান, খলিস্থান, পাঠানিস্থানের ওপরে। ভারতবাসীরা

ব্রিটিশের কাছে চির দাসত্ব লাভ করবে। মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগ যেন এদিকটা ভেবে দেখেন।

ভেবে দেখা যাক যদি হোয়াইট হাউস এবং ওয়াল ষ্ট্রীট ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করে এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পৃথিবীর ডিরেকটর হন, তা হলে ভারতবর্ষের কি হবে। এই নীতি ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের শাসন কেমন তার পরিচয় আমরা এখনই পাচ্ছি। এই গভর্ণমেণ্ট চায় যে চীনে সকলের কাছেই দ্বার উন্মুক্ত থাকুক, কিন্তু চীন জাপান অথবা ভারতবর্ষের লোকেদের কাছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বার উন্মুক্ত? এশিয়াবাসীদের কাছে আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন নিষেধ কেন? বহু ভারতবাসী দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকায় বসবাস করছে, তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয় না কেন? মানুষের কাছে আটলাণ্টিক চার্টারের যদি একটু তাৎপর্য্য থেকে থাকে, তবে ভারতবাসীর এই অবমাননা কেন এখনই দূর করা হবে না? আমেরিকার শাসন সম্প্রদায় অন্যত্র সংখ্যালঘুদের জন্য অশ্রুমোচন করেন, তারা কেন প্রথমে তাদের ঘর ঠিক করবেন না? আজও যে নিগ্রোদের লিঞ্চ করা হয় তা কেন বন্ধ করা হবে না? পোল ট্যাক্স ও অন্যান্য যে সব অসুবিধা আমেরিকার নিগ্রোদের উপরে চাপানো হয়েছে তা কেন দূর করা হয় না? তারা বলে যে তারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়ের সমর্থক, তাহলে নিগ্রোরা যে সে দেশে নানা রকম সামাজিক অন্যায় সহ্য করে তা দূর করা হবে না?

বন্ধুগণ, আমেরিকার রাজনীতিকদের এই ভাব লম্বা চওড়া কথা একেবারেই কিছু নয়, নিছক ভণ্ডামি মাত্র। আজ যদি মিঃ উইলিয়ম ফিলিপস্ লিনলিথগোর স্থান অধিকার করে এবং গরডন হাইল্যাণ্ডার্সের জায়গায় আমেরিকার সৈন্যেরা আসে, তা হ'লে ভারতবর্ষ যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। ভারতবর্ষের একমাত্র আশা হচ্ছে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা।

বন্ধুগণ, আপনাদের আমি জানানো দরকার মনে করছি যে আমাদের শত্রুরা গত যুদ্ধের মত তুরুপের টেক্কা ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে। সেবারে তখনকার ব্রিটিশের শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোর অত্যাচারের অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু তখনকার দিনে ব্রিটিশ প্রচারকেরা যে মিথ্যা লোমহর্ষক কাহিনী প্রচার করেছিল তা পৃথিবীর লোকে ভোলে নি। ব্রিটিশ লেখকের রচনা Figures, Crewe House, Wartime Falsehood-এর মত বই কে না পড়েছে? জেনারেল চার্টারিস গত যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করে যে সব মিথ্যা প্রচার করেছিলেন পরে যে তার সবই স্বীকার করেছিলেন, একথা কে ভুলে গেছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী আজ অনেক বেশী বুদ্ধি অর্জ্জন করেছে এবং রেডিওর সাহায্যে বৃটিশ প্রচারকের প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করছে। ভারতবর্ষ এই অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করে কোনই লাভ হবে না। আর সকলের চাইতে ভারতবর্ষ ভাল ভাবেই জানে ব্রিটিশ অধীনতার অর্থ কি? ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল ক্লাইভ। ইতিহাসে সে জালিয়াত বলে পরিচিত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থপন ঘুষ দিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ও জালিয়াতির সাহায্যে, সামরিক শক্তির উৎকর্ষের সাহায্যে নয়। কে না জানে যে ১৮৫৭-এর বিপ্লবের সময় আমাদের দেশের নিরীহ লোকদের হাত পা বেঁধে গুলী করা হয়েছিল। ১৮৫৭ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশে শান্তি অব্যাহত আছে, এই সময়ের মধ্যেও ব্রিটিশ পুলিশ ও সৈন্যেরা দেশের লোকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে নানারকম অকথ্য অত্যাচার করেছে। ১৯১৯সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ সৈন্যরা অমানুষিক বর্ব্বর নিষ্ঠুরতার দোষে অভিযুক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয় অসহায় নারীদের ওপরেও তারা অপমান ও অত্যাচার করেছিল।

১৯১৯ সালের পরেও ভারতীয় নরনারীর সম্মান ব্রিটিশ পুলিশেরা খেলনার মত দেখেছে। ১৯৩০ সালে মেদিনীপুরের জনসাধারণের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী কে না জানে। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। কারণ তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে খাজনা বন্ধ করে আন্দোলন চালাচ্ছিল। হিজলি জেলে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহরে ১৯৩১ সালে যে সব অত্যাচার হয়েছে তা বাংলা দেশে প্রত্যেকে জানে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে আমি নিজে চোখে কয়েকটা ফোটো দেখেছি—ফটোগুলো ব্রিটিশ সৈন্যেরা তাদের দেশে পাঠিয়েছে—ফটোতে আছে ছিন্নমুণ্ড বর্ম্মীদের ছবি। 'এই ধরণের অত্যাচার করা একমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যদের পক্ষেই সম্ভব। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা দাবী করছে বলে এখন তাদের ওপরে যে অত্যাচার ও অনাচার হচ্ছে তার চাইতে বেশী কিছু কি সম্ভব? নিজেরা যখন অত্যাচারে এতটা পারদর্শী তখন আর কাউকে অত্যাচারী বলা ব্রিটিশের শোভা পায় না।

ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হওয়াই ভারতবর্ষের একমাত্র আশা; তা ছাড়া আরও একটা কথা বিবেচ্য। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবে। এই সাম্রাজ্যের খানিকটা হয়ত আমেরিকার ভাগে পড়বে। অধিকাংশ অংশই চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা লাভ করবে, আর অপরাংশ অন্যদের লাভ হবে। মিঃ চার্চিলের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে নেতৃত্ব করতে ভাল না লাগতে পারে, তিনি এ কথা আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছেন সন্দেহ নাই,—কিন্তু তিনি যে নীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন সেই নীতিই সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনবে। হোয়াইট হলের কর্ণধার তিনি আছেন বলেই আমরা নিশ্চিত জানি যে স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হবে না। কাজেই ভারতের স্বার্থের দিক থেকে এবং মানব সমাজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে আমি আশা করি যে

আঘাত আসবার আগে পর্য্যন্ত তিনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার থাকবেন।

আমার আন্তরিক কামনা বলেই যে আমার নিশ্চিত ধারণা ব্রিটেনের পরাজয় হবে এবং ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের পরে স্বাধীন হবে, তা নয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবার সমগ্র জগতে একটা সাধারণ নীতি অনুসৃত হচ্ছে যেটা আগেকার যুদ্ধে হয় নি। বার্লিন-রোম-টোকিও চক্রশক্তিকে ধন্যবাদ, তাদের জন্য ব্রিটেনের এখন আটলাণ্টিক, ভূমধ্যসাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগর কোথাও শান্তি নাই। নৌশক্তির যুগ গত হয়েছে; ব্রিটেনের নৌবল বেশী থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেন দেখছে যে অবরোধ নীতিতে গত যুদ্ধে তাদের হয়েছিল, তাই এখন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে ব্রিটেনের খাদ্য সমস্যা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে গুরুতর। ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠবে। যুদ্ধের কৌশল এত পরিবর্ত্তন হয়েছে যে প্রধান সাম্রাজ্যবাদীরা বেজায় অসুবিধায় পড়েছে। সময় বেশী নিয়ে গত যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তার মিত্রপক্ষ জয়ী হয়েছিল; কিন্তু এবারে তা তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সব চাইতে বড় কথা যে ইঙ্গ-আমেরিকা ইয়োরোপ ও এশিয়াতে সম্পূর্ণ পরাজিত। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা বেশ জানে তাদের অবস্থা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এই সব প্রকৃত অবস্থা থেকে পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করবার জন্য তারা পরাজিত ফরাসী সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এক অভিযান সুরু করেছে। এই অভিযানের সামরিক গুরুত্বের চাইতে প্রচারের দিকটাই বেশী। তাই অভিযান সুরু হবার পর থেকে প্রচারের মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে। এক সময়ে বি. বি. সি থেকে ঘোষিত হয়েছিল যে আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করবে, আবার বলা হয়েছে যে শীত এসে পড়লে সোভিয়েট রাশিয়া অবস্থা পালটে দেবে। চক্রশক্তি এই দু'টো ঘোষণাই মিথ্যা প্রতিপন্ন

করাতে বি, বি, সি বলছে যে আফ্রিকার অভিযানই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন করবে। এই সব ঘটনা থেকে ইঙ্গ-আমেরিকায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা সত্ত্বেও আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে তারা ভয়ানক ভাবে হেরে যাচ্ছে। তাদের আর কোন গতি নেই, ক্রমে ক্রমে শেষ পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে শেষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। ব্রিটিশ ১৫০ বছর ধরে ভারতবর্ষকে শোষণ করে এখন শেষ অবস্থায় উপনীত; এই শেষ অবস্থাই ভারতবর্ষের সুযোগ। আমরা যদি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জোরে আঘাত করতে পারি, তা হলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিকে আমরা উৎখাত করতে পারব। আমার আশা আছে আমাদের এই শেষ সংগ্রামের ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন আমরা দেখতে পাব যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয়েরা এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশের অধিবাসীদের বলছি যে বাংলা দেশে খুবই দুঃসময় আসছে এবং পূর্ব্ব-প্রদেশগুলোতে বহু রক্তপাত হবে। কিন্তু তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। বাংলা দেশেই প্রথমে ব্রিটিশের আগমন পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, বাংলা দেশেই প্রস্থানের পথ দেখিয়ে দেবে।

অতীতে ভারতবর্ষকে ঘাঁটি করে ব্রিটিশ বর্মা আক্রমণ ও দখল করেছে এখন বর্মা থেকে তারা বহিষ্কৃত। তাই তারা আবার ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলা দেশকে ঘাঁটি করে বর্মা আবার দখল করতে চায়। এই করে তারাই ভারতভূমিতে যুদ্ধ ডেকে আনছে। এই কারণেই বাংলা দেশ অন্য প্রদেশের আগেই বুঝতে পারবে সামগ্রিক যুদ্ধের কী পরিণাম। এতে বাংলা দেশের গর্ব্ব হবারই কথা। আগে যারা চলে তাদের কর্ম্মপথ কঠোর, তবে গৌরবময় ত বটে। আমি জানি বাংলা দেশ সময়ের তাগিদ অনুযায়ী কাজ করে ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করবে।

আবার স্বাধীনতা সূর্য্য প্রাচ্যে উদিত হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

১১। বর্ত্তমান পরিস্থিতি

(বার্লিন থেকে ৭ই ডিসেম্বরের প্রদত্ত বক্তৃতা)

বর্ত্তমান অবস্থা নিজে অনুধাবন করবার জন্য আমি আবার য়্যুরোপ পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এবার যাকে দখলীকৃত দেশ বলা হয় সেই সব দেশে আমি গিয়েছিলাম। এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে শ্লোভাকিয়ার মত যে সব নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ইটালীর মত যারা ইঙ্গো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত আমি সেই সব দেশেও গিয়েছিলাম। কাজেই আমি য়্যুরোপের অবস্থা সম্বন্ধে সত্য এবং নিরপেক্ষ মত স্থির করতে পেরেছি। এই ভ্রমণের সময় আমি নাগরিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করতে পেরেছি। বার্লিনে ফিরে এসে আমি আবার শর্ট ওয়েভ রেডিও থেকে বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের দেশে এখন কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে বলছি।

প্রচারমূলক কোন বক্তৃতা করা আমার প্রয়োজন নেই। সকলে যেমন এলোমেলো বক্তৃতা করে তেমন কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন। আগে যেমন সোজাসুজি আপনাদের কাছে কথা বলেছি, তেমনিভাবে কথা বলব। যারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন, তারা বলবেন যে গত দু'মাসে ঘটনা ত আশানুরূপ গতিতে অগ্রসর হয় নি, এবং তারা মনে করতে পারেন যে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে অবস্থা যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। আমি আপনাদের স্পষ্টই বলছি যে আমার ধারণা তেমন নয়। যুদ্ধ এখন এমন এক অবস্থায় এসেছে যে সময় এখন ত্রিশক্তির পক্ষে কাজ করছে। এ যুদ্ধে অবরোধ ব্রিটেনের পক্ষে কাজ না করে বিরুদ্ধেই কাজ করছে। তার ওপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক একটি অংশ প্রতিপক্ষ কেড়ে নিচ্ছে

না হয় তার মিত্রের দখলে চলে যাচ্ছে। কাজেই যুদ্ধ বেশী দিন চললে আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাব এক বিরাট ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের নিশ্চিতই অবসান। সাম্রাজ্যের প্রধান পুরোহিত মিঃ চার্চিলের সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও অতীতের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা হয়েছে। এখন চিন্তার বিষয় এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে কে!

ইতিহাস থেকে আমরা জানি ভাগ্যের এটা করুণ পরিহাস যে সাম্রাজ্যের সব চাইতে গোঁড়া সমর্থকেরাই সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনেন। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে লর্ড কার্জনের মত প্রতিক্রিয়া-পন্থী অত্যাচারী শাসকই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে যা লর্ড রোনাল্ডসে অথবা লর্ড আরউইনের মত ভারতবন্ধুরা পারে না। ভগবানের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ যে ঠিক সময়ে তিনি মিঃ চার্চিলের মত লোক ব্রিটিশ শাসনের কর্ণধার করে দিয়েছেন। মিঃ চার্চিলের প্রধান মন্ত্রিত্বই ভারতবর্ষের নিশ্চিত আশার কথা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হবে না, ফলে ভারতবর্ষ তার কামনার ধন স্বাধীনতা লাভ করবে। আমরা কামনা করি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরাজয়ের দিন পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের নায়ক থাকুন।

স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের মত উদারপন্থী গণতান্ত্রিকেরা দূরেই থাকুন, কারণ তাঁরা ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনে ধোঁকা সৃষ্টি করতে পারেন। বন্দুক কামান নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ ভারত শাসন করুক, তা হ'লে ভারতবাসীরা বুঝবে সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি কি, আর তা বুঝলেই ব্রিটেনের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় রাজী হবে না।

গত দু'মাসের যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে যে যাই ভাবুক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ভারতীয়দের পক্ষে আরও অনুকূল হয়ে উঠেছে। সপরিষদ মিঃ চার্চিল তাঁদের উক্তি ও কাজ দিয়ে অবস্থা বেশ

পরিষ্কার করে তুলেছে। এখন প্রত্যেক ভারতবাসী উপলব্ধি করচে ব্রিটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি। সম্মিলিত শক্তির আটলাণ্টিক চার্টার বা 'নব-ব্যবস্থা' ভারতীয়দের কাছে কতটা তাৎপর্য্যপূর্ণ সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ভারতবাসী এখন নিশ্চিত জানে স্বাধীনতা লাভের একটি মাত্র পথ তা হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুরা যদি তাকে ধ্বংস করতে পারে ত ভালই, ভারতবর্ষের তাতে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। নয়ত ভারতবাসীকে তাদের কাপড় সেঁটে নিয়ে নিজেদের চেষ্টা দিয়ে, দুঃখ ও ত্যাগ দিয়ে নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া সম্ভব নয়। একজনকে বাঁচতে হলে অপরকে মরতে হবে। ভারতের জাতীয়তাবাদ বাঁচবেই, কাজেই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে মরতে হবে।

বন্ধুগণ, আমরা দেখছি যে ব্রিটেনে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন ব্যবস্থা হাতে নিয়ে নিজেদের মত করে চলছে, কিন্তু আমেরিকায় স্পষ্ট দু'টো মত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জনসাধারণের অনেকে ভারতের স্বাধীনতা কামনা সমর্থন করে এবং প্রকাশ্যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সমালোচনা করে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকায় এমন একটা মতও গড়ে উঠেছে যারা প্রকাশ্যে বলে যে পৃথিবীর মালিক আমেরিকা। আমেরিকার এই বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মত আটলাণ্টিক পার হয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছে এবং ব্রিটেনের কয়েকজন চিন্তানায়ক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই মত সমর্থন করছে। তারা বলে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমেরিকার প্রভুত্ব ব্রিটেন স্বীকার করে নেবে বটে, তবে আমেরিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টিঁকে থাকতে দিতে হবে এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের মধ্যে অংশীদার টিঁকে থাকবে। প্রেসিডেন্ট জানেন যে তাঁর ছোট অংশীদার চার্চিল

আমেরিকার হুকুম মেনে চলবে কারণ আমেরিকার সাহায্য নিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিঁকে থাকতে পারে। এতদিনে ভারতবাসীদের বলা উচিৎ ছিল যে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনই সাহায্য পাওয়া যাবে না। ইঙ্গ-আমেরিকার সম্বন্ধ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় এসেছে তা থেকে এই রকম ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ভারতবাসীদের তাদের নিজের সংগ্রাম একক চালাতে হবে ও বাহিরের সাহায্য আদৌ যা পাওয়া যায় তা সম্মিলিত জাতির শত্রুদের কাছ থেকেই আসবে।

এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমার দেশবাসীদের জানাচ্ছি যে মিঃ চার্চিল ও ব্রিটেনের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনই স্থান নাই। ভারতের সমস্যা সমাধানে তারা আটলাণ্টিক চার্টার প্রয়োগ করবে না, কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভারতের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করবে যার ফলে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে বহু রাষ্ট্র পত্তন সম্ভব হয়, যে রাষ্ট্রগুলো প্রত্যেকটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাঁবে থাকবে। আমি জানি দেশে এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে করতেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অবস্থা সঙ্গীন দেখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করবে এবং ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি কার্য্যকরী মিত্র সৃষ্টি করবে। আমার মনে হয় ব্রিটিশের চাল এখন দশ বছরের শিশুও বোঝে। মিঃ উইন্সটন চার্চিল এবং তাঁর বন্ধুদের মত শাসকশ্রেণী ভারতের জনসাধারণের দাবী কিছুতেই মেনে নেবে না। সব রকম নতি স্বীকার করে তারা হোয়াইট হাউসের কাছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যতটা ত্যাগ করবে তার সবই ভারতবর্ষ থেকে তারা পুষিয়ে নেবে, কাজেই ভবিষ্যতে ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। Sam খুড়োকে খুসী করতে জনবুলের যতটা রক্তপাত হবে, বেঁচে থাকবার জন্য তার চাইতে বেশী রক্ত শোষণ করতে হবে ভারতবর্ষের।

ফলতঃ হবে এই যে যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থাকবে ততদিন উত্তরোত্তর কঠোরতর দাসত্ব ভোগ করতে হবে।

দেশবাসীর কাছে এটা এখন পরিষ্কার হয়েছে নিশ্চয়ই যে সম্মিলিত জাতি একটা পৃথিবীব্যাপী নীতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে। রোম, বার্লিন, টোকিও যে বিশ্বব্যাপী কৌশল অবলম্বন করে এটা তারই ব্যর্থ অনুকরণ। এই বিশ্বব্যাপী বশ-নীতি সম্বন্ধে ইঙ্গ-আমেরিকানরা বহু আলোচনা করছে। বিশেষ করে ব্রিটেন এই নীতি অনুযায়ী য়্যুরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সৃষ্টি করতে চায়। ভয়ানক চাপে পড়ে অনিচ্ছায় য়্যুরোপের অনেক জায়গায় তারা এই নীতির পরীক্ষা করছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাদের শোচনীয় পরাজয়ই ঘটছে।

অবশেষে দেখানো সেকেণ্ড ফ্রণ্ট সৃষ্টি করতে তারা আফ্রিকা আক্রমণ করেছে। এ দেশ ত্রিশক্তির কেউ দখল করে নি, পরাভূত শত্রুকে দয়া দেখিয়ে এ দেশ ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নানা রকম ষড়যন্ত্র করে এক সহায়হীন অস্ত্রশস্ত্রহীন জাতির ওপরে আক্রমণ করাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অপূর্ব্ব রণকৌশলের নিদর্শন বলা হচ্ছে। নিরপেক্ষ দর্শক এটাকে ম্যাডাগাসকার অথবা রিইউনিয়ন দ্বীপ দখল করবার মতই বীরত্ব আরোপ করে। ব্রিটেনের অন্যত্র পরাজয়ের গ্লানি গোপন করার চেষ্টা নীচতা, কারণ এই খানেই প্রকৃত জয় পরাজয় নির্দ্দিষ্ট হবে। সত্যিকার প্রয়োজন গোপন করে, সোভিয়েটের দ্বিতীয় ফ্রণ্টের করুণ দাবীর বদলে একটা ছেলেভুলানো অভিনয়কে আমি অত্যন্ত নীচতাই বলব।

বন্ধুগণ, নিরপেক্ষ ভাবে আজ বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। সুদূর প্রাচ্য থেকে ইঙ্গ-আমেরিকা বিতাড়িত, তাদের নৌবল প্রশান্ত মহাসাগরে নিমজ্জিত। য়্যুরোপ থেকে ব্রিটিশ শক্তি নিশ্চিহ্ন, কাজেই দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সব বক্তৃতাই ছেলেমি। ইঙ্গ-আমেরিকা তাই চায় যে ফরাসী সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে আফ্রিকার যুদ্ধ চলুক। কিন্তু

যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হবে য়ুরোপ এবং এসিয়ায়, আফ্রিকায় নয়। য়ুরোপ ও এশিয়ায় ইঙ্গ-আমেরিকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ব্রিটিশ শাসকেরা উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকার অবতরণ নিয়ে রেডিওতে হৈ চৈ করছে। সত্যই যদি তারা শক্তিমান কোন শত্রুকে যুদ্ধে হারাতো তা হলে তারা কী পরিমাণ চেঁচাত তাই আমি ভাবছি। ব্রিটিশ প্রচার থেকে মনে হয় ইংলণ্ডের মনের জোর এতটা কমে গেছে যে মাঝে মাঝে প্রচারের মাদক পরিবেশন করতে হয় যাতে তারা সোজা হয়ে থাকতে পারে। এক সময় বি, বি, সি বলত যে আমেরিকা ব্রিটেনকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবে! পরে তারা বলেছে যে সোভিয়েট রাশিয়াই ব্রিটেনকে বাঁচাবে। এখন তারা বলছে আফ্রিকাতে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হবে, ইতিহাসে প্রসিদ্ধ একজন প্রধান মন্ত্রী এক সময়ে বলেছিলেন "ইংলণ্ড নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে বাঁচাবে," কিন্তু গত তিন বছরের মধ্যে আমি একজন ব্রিটিশকেও একথা বলতে শুনি নি।

ব্রিটেনের দিন যে চিরকালের জন্য গত হয়েছে তা আমরা নিজের চোখে এই বিরাট শক্তিমান সাম্রাজ্যের পতন থেকেই দেখতে পাচ্ছি। বিগত ঘটনা বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর অবস্থা দেখে আমার আশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবাসী ও স্বাধীনতা লাভের মধ্যে আর কোন বাধাই সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই আমাদের জোর দিয়ে, এক উদ্দেশ্য নিয়ে, যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে তাতে যোগ দিতে হবে। প্রাচীন যে ব্যবস্থা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা পৃথিবীব্যাপী চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, তার উত্তর হচ্ছে প্রাচীন ব্যবস্থার ধ্বংস করা এবং নব-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন।

ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে এইটুকু বলতে চাই যে গত কয়েকমাসে আপনারা যা করেছেন তার জন্য আপনাদের অভিনন্দিত করছি। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ প্রচারের ফলে পৃথিবীর লোকের কাছে এটা

বিস্ময়ের মনে হয়েছে যে নিরস্ত্র ভারতবাসী ট্যাঙ্ক, মেসিনগান ও এরোপ্লেনে শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে এ ভাবে লড়াই করতে পারবে। ব্রিটিশ শাসকেরা পৃথিবীর অপর লোকের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা গোপন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর লোক নিয়মিত জানতে পেরেছে ভারতে কি ঘটছে না ঘটছে। ভারতীয়রা জেনে সুখী হবে যে সম্মিলিত জাতিদের মধ্যেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমর্থন রয়েছে।

বন্ধুগণ, আমি বলেছি যে আমরা সকলে এখন একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ ও নিকট প্রাচ্যের অধিবাসীদের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হবে। আপনারা যারা পরাধীন তাদেরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করতে হবে. কাজেই আপনাদের দায়িত্ব সত্যিই বেশী। ভারতবাসীদের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। ভারতবর্ষই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষই এই সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে। তাই এখন ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করা ও মানব সমাজের মুক্তি এনে দেওয়া।

স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবর্ষ বহু কষ্ট সহ্য করেছে সন্দেহ নাই। আরও কষ্ট সহ্য করবার জন্য তাদের তৈরী হতে হবে। স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমার দেশবাসীর ভাগ্যে আরও অনেক কষ্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। অনেক নিরীহ লোকের রক্ত হিন্দুস্থানে ব'য়ে যাবে তবে আমরা মুক্তি পাব। সহিদের রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা ক্রয় করতে হবে, এ মূল্য দেবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমাদের যে জয় হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্মরণ করুন আপনাদের কি ধ্বনি আমি উচ্চারণ করতে বলেছিলাম—"দু বছর আর এক লাখ জীবন।" দু বছর লড়াই করবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। সংগ্রামে এক লাখ লোক স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

যদি তৈরী থাকি, তা হলে স্বাধীনতা আমরা লাভ করব, সবাই লাভ করবে।

বন্ধুগণ, বি, বি, সি অফিসে বসে যাঁরা আমার বক্তৃতা শোনে আমি আজও দেশে ফিরে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে যোগ দিই নি দেখে তারা চিন্তিত। তাদের আমি একটু ধৈর্য্য ধরিতে বলি। আমি বলছি যে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা দেশবাসীর কাছেই, ব্রিটিশ সরকারের কাছে নয়। সময় হলে এ প্রতিজ্ঞা আমি নিশ্চয়ই পালন করব। দিনের পরে রাত হয় এটা যেমন সত্যি, যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হবে এটাও তেমনি অবধারিত। ভারতবর্ষ যুদ্ধের শেষে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আমি বেঁচে থাকব; সে যুদ্ধে আমি বিদেশ থেকে যোগ দেব না, যারা আমার কর্ত্তব্যের জন্য অনুপস্থিতিতে অসমসাহসিক যুদ্ধ চালিয়েছে দেশে গিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব!

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

১২। ব্রিটেনের ধ্বংস নিশ্চিত

(বার্লিন রেডিও থেকে ১৯৪৩ সালে ১লা জানুয়ারী প্রদত্ত বক্তৃতা।)

গত বছরের সামরিক পরিস্থিতি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে এটা সৌভাগ্যের বিষয়। য়ুরোপে বহু কথিত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সৃষ্টি করবার চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। চক্রশক্তির জোর এখনও আফ্রিকাতে বজায় আছে। বীর জাপান সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকাকে কঠোর আঘাত করেছে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এবং ভারতীয় ফ্রণ্টে জাপানীরাই বিজয়ী আছে। সংক্ষেপে বলা যায় ব্রিটিশ ও আমেরিকার প্রভাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন। যুদ্ধের শেষ অবস্থা উপস্থিত। চক্রশক্তি অপরাজেয়, সময় তাদের পক্ষে।

গত যুদ্ধে মিত্রশক্তি য়্যুরোপের অধিকাংশ স্থানেই কর্ত্তৃত্ব করেছে। এবারে তারা য়্যুরোপ থেকে বিতাড়িত। গতবার প্রধানতঃ যুদ্ধ হয়েছে ফরাসী দেশে। এবারে ফরাসী দেশে কিছুই নেই। রাশিয়া গেল বার আক্রমণ করেছিল, এবারে দেশ রক্ষায় তাদের সময় কাটছে। জার্ম্মাণরা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তরস্থলে প্রবেশ করেছে। গত যুদ্ধে ইংরেজ এবং আমেরিকা সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করেছে আর এবারে জল, স্থল ও বিমান কোন দিকেই চক্রশক্তির সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। গতবারে যুদ্ধ হয়েছে য়্যুরোপে ও মধ্য প্রাচ্যে। এবারে চক্রশক্তি জল, স্থল, অন্তরীক্ষে প্রভুত্ব বজায় রাখতে পেরেছে বলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যুদ্ধ হচ্ছে। গত যুদ্ধে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশকর্ত্তৃত্ব ছিল, এবারে সেখানে তার অবস্থা সঙ্গীন। মিত্রশক্তি গতবারে জার্ম্মাণীকে অবরোধ করেছিল, এবারে তার উল্টো হয়েছে, জার্ম্মাণীই ব্রিটেনকে অবরোধ করেছে।

চক্রশক্তিদের অসীম সম্পদ, জনবল রয়েছে, আছে প্রচুর খাদ্য। মিত্রপক্ষের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। জাহাজের অভাব রাজনীতিকদের কাছে এক মস্ত সমস্যা। জাপানীরা এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে চক্রশক্তির জয়ের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। অনেকদিন ধরে ব্রিটেন উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। পূর্ব্ব-সীমান্ত ১৯৪১ সাল থেকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টা হচ্ছে। গত বিশ বছর ধরে সিঙ্গাপুরের শক্তি বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও সাতদিনে জাপানীরা সিঙ্গাপুর দখল করেছে। এই সব ঘটনা বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে ব্রিটেনের অন্তিম দশা উপস্থিত।

ভারতবর্ষকে এখন এগিয়ে এসে ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে

সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। ব্রিটেনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ব্রিটিশ পরাজিত 'হলে ভারতবাসীর নিজেদের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতবাসী, এবং বিদেশের ভারতীয় বন্ধুগণ, আমি জানি, আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস আছে। এই যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। ভারতবর্ষের তাই কর্ত্তব্য চক্রশক্তির যুদ্ধের সহায়তা করা। ভারতের যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে অনিচ্ছুক তারা দেশদ্রোহী। বিদেশে যে সব ভারতবাসী আছেন, তাদেরও এই সংগ্রামে কর্ত্তব্য আছে। ব্রিটিশের অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কারাদণ্ড অথবা বন্দুকের গুলিতে বিচলিত হ'লে চলবে না। প্রত্যেক ভারতবাসীকে কষ্ট সহ্য করবার জন্য তৈরী হতে হবে। ত্যাগ ও সংগ্রাম আপনাদের দীর্ঘদিনের কামনা লাভ করতে সাহায্য করবে—আমরা স্বাধীন হব।

১৩। ভারতের স্বাধীনতা দিবস

(বার্লিন থেকে ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ সালের বক্তৃতা)

আজ ২৬শে জানুয়ারী। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতবাসীরা একত্র হয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করবে। আজকার দিনে সকলে জাতীয় পতাকার নীচে সমবেত হয়ে পুনরায় স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করবে, স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আজ প্রতি গৃহে গৃহে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়বে, সর্ব্বত্র শোভাযাত্রা ও সভা হবে। সভায় স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য আবার গৃহীত হবে। এই জাতীয় উৎসব বিনা বাধায় প্রায়ই পালন করা সম্ভব নয়। বার বার পুলিশের নিষেধ এবং সশস্ত্র সৈন্যের সকল রকম বাধার বিরুদ্ধে এই ব্রত উদযাপিত হয়। ১৯৩১ সালে, ঠিক

বার বছর আগে ভারতের সব চাইতে বড় সহর কলকাতার মেয়র থাকবার সময় আমি এই দিন এক শান্তিপুর্ণ শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে আমি ও আমার অনুগামীরা ঘোড়-শওয়ার পুলিশ বাহিনী দ্বারা প্রহৃত হয়েছিলাম। সে প্রহারের পাকা চিহ্ন আজও আমাদের শরীরে রয়েছে। তবু যারা বেয়নেটের আঘাত ও গুলীর সম্মুখীন হয়েছিল তাদের চাইতে আমাদের অতি সামান্যই লাঞ্ছনা হয়েছিল বলতে হবে।

আজ স্বভাবতই আমার স্বদেশবাসীর কথা মনে পড়ছে। তাদের আজ কাঁদুনে গ্যাস, পুলিসের লাঠি, বেয়নেট ও মেশিনগান উপেক্ষা করেই স্বাধীনতা দিবস পালন করতে হবে। আটলান্টিক চার্টার কী অদ্ভূত চীজ! এরই জন্য নাকি মিত্রশক্তি যুদ্ধ করছে, অথচ ভারতবর্ষে সব রকম শোভাযাত্রা, সভা বন্ধ করা হয়েছে। তার কারণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র দাবী করেছে। শোষণ এবং অধীনতা বজায় রাখতে গিয়ে ব্রিটিশ একটা দোহাই দিয়ে থাকে—তারা বলে যে ভারতবর্ষে একতা নাই, দেশের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করে, কাজেই ব্রিটেনের দৃঢ় শাসন প্রয়োজন শান্তি ও প্রগতি বজায় রাখতে। কিন্তু এই সব প্রচারকেরা ভুলে যায় যে তাদের ঐক্য এবং সুশাসন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবার বহু আগে—রোমানরা ব্রিটেনে এসে তাদের সভ্য করে গড়ে তোলবারও অনেক আগে—ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল, শুধু তাই নয়, চন্দ্রগুপ্ত আফগানিস্থান থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই সাম্রাজ্য আজকার ভারতবর্ষের চাইতে তুলনায় অনেক বড় ছিল। ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখানে ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট, ও গ্রীসের মত অতীত বিস্মৃত নয়—আমাদের অতীত সংস্কার আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে।

এই জাতীয় চেতনার জন্যই পরাধীনতা ও দারিদ্র্যে আমরা আজও মৃত নই। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে ১৮৫৮ থেকে ভারতে সংহত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ের আগে যদি হাজার

হাজার বছর ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সাহায্য ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে স্বাধীন হবার পরে ভবিষ্যতেও তা পারবে।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছে যে নিতান্ত পাশবিক শক্তির সহায়তায় ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন দখল করে রাখা যাবে না। তাই তারা দেশকে নিরস্ত্র করে ফেলল। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নতুন সরকার ইংলণ্ডের নির্দ্দেশ ক্রমে "divide and rule" নীতি অনুসরণ করতে লাগল। ১৮৫৮ থেকে ব্রিটিশ শাসনের মূলে এই নীতিই রয়েছে। এই দেড়শ বছর ধরে ব্রিটেনের নীতি হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দেশীয় নৃপতিদের অধীনে, বাকী তিন চতুর্থাংশ ব্রিটিশ শাসনে রাখা। ব্রিটিশ ভারতের বড় বড় জমিদারদের প্রতিও তারা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তারা বুঝতে পেরেছে যে জনসাধারণের বিরুদ্ধে দেশীয় নৃপতি এবং জমিদারদের লাগিয়ে দিয়েও আর তাদের অধীনে রাখা সম্ভব নয়। ১৯০৬ সালে লর্ড মিণ্টো যখন ভারতবর্ষের বড়লাট, তখন তারা মুসলিম সমস্যা আবিষ্কার করে ফেললো। ১৮৫৭ সালে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমান সম্রাট বাহাদুর শাহের পতাকাতলে।

গত যুদ্ধের শেষে যখন আরও খানিকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতকে দেওয়া প্রয়োজন হ'ল তখন তারা ঠিক করল যে শুধু মুসলমানকে ভারতবর্ষের জনগণ থেকে আলাদা করলে চলবে না, তাই তারা হিন্দুদের ও বিভক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাবে তারা জাতিবৈষম্য আবিষ্কার করে ফেলে এবং তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের উদ্ধারকর্তা হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৩৭ পর্য্যন্ত তারা আশা করেছিল যে দেশীয় নৃপতি, মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত রাখতে পারবে। ১৯৩৫ এর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচনে তারা দেখতে পেল যে তাদের সব ভাঁওতা ও কৌশল ব্যর্থ হয়েছে—এক

তীব্র জাতীয়তা বোধ ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই ব্রিটিশ নীতি এখন শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছে—যদি ভারতীয়দের বিভক্ত করা না যায় তবে ভারতবর্ষকেই বহু বিভক্ত করে ফেলতে হবে। এই হচ্ছে পাকিস্তান প্রস্তাব এক উর্ব্বর মস্তিস্ক ব্রিটিশের সৃষ্টি।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই যদিও স্বাধীন ভারত কামনা করে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যদিও মুসলমান, যদিও মুসলমানদের সামান্য এক অংশই পাকিস্তান চায়, তবু ব্রিটিশ প্রচারকেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বলে বেড়াচ্ছে যে মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে নেই, এবং মুসলমানেরা ভারতবর্ষ বিভাগ করতে চায়। ব্রিটিশেরা নিজেরাই জানে যে তাদের এই প্রচার মিথ্যা, তবে তারা আশা করে যে একটা মিথ্যা ক্রমাগত প্রচার করলে পৃথিবীর লোকে একদিন বিশ্বাস করবে।

ভারতে ব্রিটিশ নীতি বিশ্লেষণ করতে অনেকটা সময় গেল। তার কারণ যদিও আমাদের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতি কৌশলী তবু তাদের আমরা ভালই জানি কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনা কম। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের মধ্যে কিছুই সমান নয়, আমাদের জাতীয় স্বার্থ তাদের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। আজ ত্রিশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করছে, ভারতবর্ষও তার চিরশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতের জাতীয়তা একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। একটিকে বাঁচতে হলে অপরটিকে মরতে হবে। ভারতের জাতীয়তা বেঁচে থাকবেই, কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই ধ্বংস হবে। আজ যে সংগ্রাম ভারতবর্ষে চলেছে তা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবেরই অনুস্মৃতি। ১৯ শতকের শেষ চারিটি দশকে ভারতবর্ষের অন্দোলন চলেছে সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ থেকে লোকদের উত্তেজিত

ক'রে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হলে এই আন্দোলন সংহত হ'ল। এই শতাব্দীর আরম্ভে ভারতবর্ষে এক নব জাগরণ দেখা দিল, সেই সঙ্গে এক নতুন ধরণের সংগ্রামপদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। তাই প্রথম দুই দশকব্যাপী ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করা হল ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ অনুসৃত হল। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতের জন্য গত যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করে—সে সময়ে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি, জার্মাণী ও তুর্কী তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা দমন করা হয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে আবার এক নতুন অস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস অন্দোলনের অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে গত ২২ বছর ধরে এক শক্তিশালী সঙ্ঘ সমগ্র দেশে এমন কি দেশীয় রাজ্যেও সৃষ্ট হয়েছে। এই সঙ্ঘ গ্রামে গ্রামে সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করেছে। সব চাইতে বড় কথা জনসাধারণ বিনা অস্ত্রে এক শক্তিশালী শত্রুকে কী করে আঘাত করতে হয় তা শিখেছে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেখিয়েছে যে অহিংস অন্দোলনে শাসন ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া যায়। বিশ বছর ধরে যুবক সম্প্রদায় দেখল যে অহিংস অন্দোলন শাসন অচল করতে পারে বটে কিন্তু শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করলে শাসকদের তাড়ানো যায় না। এই অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণ অহিংস আন্দোলন দেখে সশস্ত্র যুদ্ধের সাহায্য নিতে আরম্ভ করেছে, তাই আজ শোনা যায় অস্ত্রহীন ভারতীয়েরা রেল-লাইন, টেলিগ্রাফের তার, টেলিফোন ধ্বংস করছে, থানা পোষ্টঅফিস, গভর্ণমেণ্ট আফিস পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং আরও অন্যান্য উপায়ে বল প্রয়োগ করে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে।

১৯২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সব কটি অভিযানে আমি যোগ দিয়েছি। এই সময়ে আমি এগারবার কারারুদ্ধ হয়েছি, তার মধ্যে অনেকবারই

বিনা বিচারে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে খবর আমি পাচ্ছি তা থেকে আমি বলতে পারি যে এবারে আর ব্রিটিশের পক্ষে আন্দোলন থামানো সম্ভব হবে না। বাহিরের ও ভেতরের অনেক কারণ আমি জানি তার জন্য আমি এই উক্তি করছি। ভেতরের কারণ হচ্ছে এই যে আন্দোলন দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও সংগ্রামে যোগ দিয়েছে এবং অন্দোলন অহিংস থেকে প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। বাহিরের কারণ হচ্ছে যে ভারতবর্ষ এবারে একক সংগ্রাম করছে না। ত্রিশক্তি ও তাদের মিত্ররা আমাদেরও মিত্র, কারণ তারা একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাই আজ জনসাধারণ জানে স্বাধীনতা লাভ করবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। এরকম সুযোগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মেলে না। ভারতবর্ষে সকলেরই ধারণা যে এবারকার যুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয় হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে।

আমরা আপশোষ করেছি যে গত যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন নি। তাই আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত যোগ স্থাপন করবার জন্যে চলে এসেছি। এর ফলে ভারতের সংগ্রাম ও ত্রিশক্তির সংগ্রাম যুক্ত হয়েছে—সাধারণ শত্রু ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে। যদিও স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তবে ব্রিটেনকে যা কিছু দুর্ব্বল করে দেয় তা থেকেই ভারতবর্ষের সাহায্য হবে। কাজেই যে সাহায্য ঐতিহাসিক কারণে ভাগ্যে জুটেছে তার পূর্ণ সুযোগ না নেওয়া বোকামি হবে।

আমার নিজের কাজ সম্বন্ধে বলছি যে আমি ভারতবর্ষের বাহিরে যা কিছু করছি, তাতে আমার দেশবাসীর অধিকাংশের সমর্থন রয়েছে। বস্তুত যারা দেশে সংগ্রাম করছে এবং যারা বিদেশে স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদের মধ্যে আজ পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। আমি এ কথা বলব

না যে আমাদের দেশে যা করা হয়েছে তা যথেষ্ট। আন্দোলন এখনও গতিশীল। তবে প্রকৃত সংগ্রামে পরিণত হয়েছে এই আন্দোলন, আর এই আন্দোলনকে ইঙ্গ-আমেরিকার সামরিক শক্তি ধ্বংস করতে পারবে না, এটা আনন্দের বিষয়।

আমাদের আন্দোলনের দু'টো দিক আছে—শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলা এবং ব্রিটেনের সমর প্রচেষ্টা ধ্বংস করা। কিন্তু অচিরেই আন্দোলনের শেষ অবস্থায় উপনীত হব যখন সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস ১৯৪৩ সালেই তা হবে, তাই এই বছরে আমাদের যা কিছু কর্ত্তব্য সবই করতে হবে যার ফলে আমাদের জয়লাভ সম্ভব হবে। মিত্রশক্তি বোধহয় এই বছরের গুরুত্ব বুঝে, তাই নববর্ষের প্রথম দিন থেকে তারা ভয়ানকভাবে প্রচারে মেতেছে। লণ্ডন ও আমেরিকা থেকে যা বলে, তা শুনলে অথবা পড়লে মনে হয় যেন তারা যুদ্ধে জিতে গেছে। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারবিদেরা গত যুদ্ধের মত এবারেও ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করছে। কিন্তু তা এতই স্বচ্ছ যে দ্বিতীয়বার আর তা থেকে কেউ ভুল বুঝবে না। মানসিকশক্তি বজায় রাখবার জন্য এই ধরণের কাজ যে করতে হচ্ছে তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে প্রকৃত অবস্থা কি।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে তা হলে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হবে—এ যুদ্ধে ত্রিশক্তির জয় নিশ্চিত।

আমরা ভারতবাসীরা নিশ্চিত জানি যে অচিরে আমাদের মুক্তি হবে। মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যই আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে—আমরা সমগ্র মানবসমাজের এক পঞ্চমাংশ। স্বাধীনভারত পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিরাট দান করতে পারবে। স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে, যে সাম্রাজ্য অসংখ্য লোকের দাসত্ব ও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। ভারত স্বাধীন হলে সব যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

ভারত স্বাধীন হলে প্রাচ্যের সব দেশ শান্তির নিশ্বাস ফেলবে কারণ তখন তাদের স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করতে পারবে না। আর ভারত স্বাধীন হলে জগতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক বিপ্লব আনতে পারবে।

আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই স্বাধীন ভারত এক গ্রেট-ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীর আর সকলেরই মঙ্গলের কারণ হবে, অন্য জাতিদের পক্ষে নানা-রকম সুবিধাই হবে বেশী। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে শিল্প গড়ে উঠলে তার ফল হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আমরা যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি তারা জানি স্বাধীন হলে আমরা কি করব। তাই আমরা স্বাধীন ভারতে জাতি গঠনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করছি। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের কাজে শুধু ভারতের স্বার্থ নয় সমগ্র জগতের স্বার্থ জড়িত।

পৃথিবীর যে সব নরনারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব, যতদিন শত্রুকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জ্জন না করতে পারছি। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের জীবন মৃত্যু জড়িত—এ সংগ্রামে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে—কাজেই এ সংগ্রামে মাত্র একটি পরিণতি, তা হচ্ছে জয় ও আমাদের স্বাধীনতা।

সম্পাদকের মন্তব্য : এই বক্তৃতাটি জার্মাণ ভাষায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই সুভাষবাবু ইংরেজীতে আবার বক্তৃতা করেন। বার্লিন রেডিও থেকে স্বাধীনতা দিবস পালনের সব ঘটনা বলা। প্রথমে স্বাধীনতা সংকল্প পাঠ করে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়। রেডিও বক্তা বলেন "ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এক বিরাট সভায় আমরা উপস্থিত হয়েছি। বহু শত লোক সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শোনবার জন্য সমবেত হয়েছে। এখানে অনেক ভারতীয় আছেন। য়্যুরোপের নানা জাতির প্রতিনিধিরাও আছেন। সকলকে **Central**

Committee of Independence of India আহ্বান করেছে। বহু জার্মাণ, ইটালিয়ান, জাপানী এবং উচ্চ কর্ম্মচারীরা সব রয়েছেন। হেবর ম্যাখ্‌টের কর্ম্মচারীরাও আছেন। ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্যরা আছেন। অতিথিদের মধ্যে জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তি, ইরাকের প্রধান মন্ত্রী রসিদআলি এল জিলানি আছেন। খুব জাঁকালো সভা হয়েছে। লাল ও সাদা ফুলে হল সাজানো হয়েছে। এখন স্বাধীন ভারতের নেতা সুভাষচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কাল রংয়ের শেরওয়ানী পরে আছেন। সুভাষ বসু জার্মাণ ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। আপনারা অনেকেই এ ভাষা বুঝতে পারবেন না বলে পরে এই বক্তৃতা ইংরেজীতে আপনাদের শোনাবার ব্যবস্থা করেছি। সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে স্বীকৃত হয়েছেন। সুভাষ বসু এখন কথা বলছেন।” তারপরে উপরের বক্তৃতাটি হয়।

১৪। স্বাধীনতা অদূরে

(বার্লিন থেকে ১৯৪৩ সালে ১লা মার্চ প্রদত্ত রেডিও বক্তৃতা)

বন্ধুগণ, যখন আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষ থেকে চলে আসি তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল দু’টো। প্রথম পৃথিবীর ঘটনাবলীর প্রকৃত অবস্থা জানা, দ্বিতীয়, অনুসন্ধান করা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার কোন মিত্র আছে কিনা। যতদিন ধরে আমি বাইরে আছি, ততদিন সব ঘটনা আমি চোখে দেখেছি এবং সমস্ত কিছু নিজের কানে শুনেছি। কাজেই এখন যা ঘটছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আমি নিরপেক্ষ অভিমত পোষণ করতে সক্ষম। দীর্ঘকাল ধরে বহু কষ্ট সহ্য করে জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হব তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি আরও বলতে চাই যে, দেশ ছেড়ে আসবার সময় আমি

যা কিছু করেছি বা ভবিষ্যতে যা কিছু করব তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য —দেশের মুক্তি দ্রুত অর্জ্জন করা। আমার অতীত ও ভবিষ্যতের কার্য্যাবলী এমন হবে না যা জাতীয়তাবাদী ভারত সমর্থন করতে পারবে না। আরও বলতে চাই যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি কৌশল দেখিয়ে অথবা আমাকে লোভ দেখিয়ে কলুষিত করতে না পেরে থাকে তবে পৃথিবীর আর কোনও শক্তির সে ক্ষমতা নাই। আমার যাই হোক না কেন, আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর প্রতি।

য়্যুরোপে এসে আমি সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। তাই বি, বি, সি থেকে ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয় আমি তা তুলনা করে দেখতে পারি। বি, বি, সি ত নয়—Bluff and Bluster Corporation। আমি বলছি আপনারা বিশ্বাস করুন যে ব্রিটেনের এ যুদ্ধে পরাজয় হবে এবং তার ফলে সাম্রাজ্যও যাবে ভেঙ্গে। আমরা ব্রিটেনকে সাহায্যই করি অথবা নিরপেক্ষ থাকি তাতে করে এই বিরাট যুদ্ধের ফলাফল একটুও পরিবর্ত্তিত হবে না। এই অবস্থায় আমাদের সক্রিয় হওয়া শুধু বুদ্ধির কাজ তা নয়, তা নিতান্ত প্রয়োজনও। নিজের চেষ্টায় ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের কাজে সহায়তা করতে হবে—যাতে সাম্রাজ্যের ভস্মরাশির ভেতর থেকে বিজয়ী ভারত বেরিয়ে আসতে পারে, যে ভারতের স্রষ্টা ভারতবাসী নিজেরাই।

বন্ধুগণ, বর্ত্তমান সঙ্কটে চুপ করে বসে থাকা রাজনীতির দিক থেকে আত্মহত্যার মতই। চুপ করে বসে থাকলে হয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর ও আমাদের পরাধীন থাকতে হবে, কিম্বা বিজয়ী ত্রিশক্তির কাছ থেকে দান হিসাবে স্বাধীনতা গ্রহণ করতে হবে। আমরা দু'টোর একটাও চাই না। ভারতবাসীকে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামে বিদেশ থেকে সাহায্য প্রয়োজন হবে। পৃথিবীতে গত ২০০ বছরে স্বাধীনতা লাভের জন্য যতগুলো সংগ্রাম হয়েছে তার প্রত্যকটি সম্বন্ধে আমি গবেষণা করেছি, কিন্তু কোন

জায়গায় দেখিনি যে বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। শত্রু যেখানে পৃথিবীর অন্যতম শক্তি; সেখানে বাইরের সাহায্য আরও প্রয়োজন। ব্রিটেনের মত যারা আরও অন্য শক্তি দ্বারা বলীয়ান, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যদি অন্য কোনও শক্তি সাহায্য করতে চায়, তবে তার সাহায্য না নেওয়া হবে মূর্খতা। ব্রিটেন যখন আমেরিকা চীন, আফ্রিকা ও সাম্রাজ্যের অন্যত্র থেকে আমাদের দেশে সৈন্য ও সমরোপকরণ নিয়ে আসছে, তখন আমরা যদি বাইরের সাহায্য গ্রহণ করি তবে ব্রিটিশের কোনও অভিযোগ করা শোভা পাবে না। ভারতবর্ষের নিজেরই স্থির করতে হবে কি সাহায্য তার চাই, তবে যত কম সাহায্য নিয়ে চলবে ততই তার পক্ষে মঙ্গল। আমাদের মিত্রের কাছে থেকেই আমরা মাত্র সাহায্য আশা করতে পারি। বর্ত্তমানে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে তারা পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করছে বলে তারা আমাদের বন্ধু, আর যারা সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, তারা আমাদের চির-দাসত্বই চায়। সমস্ত বিষয়টি এইভাবে বিচার করা ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ও হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে আমি নিশ্চিত বুঝেছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে ত্রিশক্তিই আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

বন্ধুগণ, আমি জানি যে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মত আমার কোনও কোনও বন্ধু ত্রিশক্তির অকপটতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। তাঁদের আমি বলব যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করা ত্রিশক্তির নিজেদেরই স্বার্থ—তারা তা করবেও। ব্রিটিশ শক্তির পরাজয় হলে ভারতবর্ষ অনায়াসেই ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হতে পারবে। তা ছাড়া পৃথিবীর সকলে, ত্রিশক্তিসহ, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হলে তার সুবিধা উপভোগ করবে। ভারত ইতিহাসের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আদর্শবাদের জন্য বিমুখ হওয়াটা অত্যন্ত ভুল হবে। জার্মাণী, ইটালী

ও জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির খবরে আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস চায়। এই সাম্রাজ্যই ভারতের একমাত্র শত্রু। আমরা ত নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি যে আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করছে। দেশে আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী যাঁরা আছেন তাঁদের এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির ভেতরে পার্থক্য করা উচিত। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতবাসীরা নিজেরাই নিজেদের কার্য্যক্রম স্থির করবে। কিন্তু বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতাই করতে হবে। ত্রিশক্তির সঙ্গে এই সহযোগিতা করতে গিয়ে আমি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দাঁড়িয়েছি, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একটুও হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করব না। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার সময় আমি যে অভিমত পোষণ করতাম এখনও ঠিক তাই করে থাকি। কাজেই ত্রিশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ তাদের প্রাধান্য অথবা তাদের আদর্শ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রহণ করা মনে করলে সেটা ভুল হবে।

বন্ধুগণ, আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে ভারতের শেষ মুক্তি সংগ্রামে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্ত্তব্য সম্পাদন হয়ে গেলে যখন ভারত স্বাধীন হবে তখন দেশবাসীর কাছে আমি উপস্থিত হব, তখন দেশবাসীই স্থির করবে কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থা তারা চায়। ১৯৪০ সালে জেলে যাবার ঠিক আগে আমি মহাত্মাজীকে বলেছিলাম যে দেশ স্বাধীন হলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমার উদ্দেশ্য সফল হলেই আমি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এটা খুবই আনন্দ ও গৌরবের বিষয় ত্রিশক্তির পূর্ণ সমর্থনের ফলে সুদূর প্রাচ্যে আমাদের দেশবাসীরা ব্যাংককে এক সম্মিলনে মিলিত হয়ে আমাদের দেশের মুক্তি উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করবে। আমি প্রায়ই বলেছি যে

স্যার ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপস ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার পরে আমার সংগ্রামের শেষ পর্য্যায় সুরু হয়েছে। এমন একটা অবস্থা শীঘ্রই আসবে যখন ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তি স্বেচ্ছায় দেশ না ছাড়লে আমাদের অস্ত্র গ্রহণ করতে হবে। বন্ধুগণ, সেই শুভ দিনের জন্য তৈরী হউন। শেষ যুদ্ধের জন্য সংহত হউন, ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাবার আগে ব্রিটেন যে 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করবে তাতে বাধা দিন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এখন অবস্থা এমন কম্পমান যে উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং সাহায্য পেলে ভারতবাসীরা অনায়াসেই মুক্তি লাভ করতে পারবে। এই মুক্তি আসতে আর বিলম্ব নেই। এই যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমি আবার বলছি সময় হলেই আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি শেষ যুদ্ধে যোগ দেব। যে শক্তি আমাকে দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দিতে পারে নাই, তারা দেশে ফিরে যেতেও বাধা দিতে পারবে না। ইতিমধ্যে যাঁরা জেলে আছে তাঁদের একটু আশ্বাস পাঠিয়ে দিন। ধৈর্য্য ধরে তাঁদের সময় কাটাতে বলুন। সংগ্রামের সংবাদ পেলেই তাঁরা তাকে সম্বর্দ্ধিত করবেন, আমরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে পাঠাব তখন তারা স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন।

বন্ধুগণ, আর কিছু বলবার আগে, আমি আমার পক্ষ থেকে এবং যারা আমার সঙ্গে কাজ করছে তাদের পক্ষ থেকে আপনাদের সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি। আপনারা জেনে রাখুন যে ভারতের অসমসাহসিক স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী পৃথিবীতে গভীর রেখাপাত করেছে। বস্তুত লোকে প্রথমে ব্রিটিশের অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাসই করে নি। ইংলণ্ডের নেতৃবৃন্দকে নিরস্ত্র লোকের ওপরে গুলী চালানো সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। এই সব বক্তৃতা থেকে পৃথিবীর লোকে নিশ্চিত বুঝতে পারে যে ভারতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষ থেকে যে সব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তার সবটাই সত্যি একটুও

অতিরঞ্জিত নয়। বন্ধুগণ, ভারতবর্ষে কি ঘটছে না ঘটছে তার সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ এখন আর ভারতবর্ষকে পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখতে পারে না। আমি লক্ষ্য করছি প্রতিদিনই অপ্রত্যাশিত অংশ থেকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি লাভ করা যাচ্ছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের খবর আজকাল প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের কাছ থেকে শুধু সহানুভূতি নয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজনীয় সব কিছুই আশা করতে পারে। ভারতবাসীদের স্থির করতে হবে বাহিরের সাহায্য দরকার আছে কি না, বা কতটা সাহায্য দরকার। বন্ধুগণ, আমাদের স্বদেশবাসী যারা য়ুরোপ, আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্যে আছে তারা মনে করে যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। স্বাধীনতা দিবসে জার্মাণীতে অবস্থিত ভারতবাসীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঐক্য প্রকাশ করেছে এবং এই সংগ্রামে সাহায্য করবার জন্য তারা সব রকমে চেষ্টা করছে। তাদের অনেকে ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য উৎসুক।

ঘটনাবলীর মোড় ঘুরবার সময় শীঘ্রই আসছে। সে সময় এলে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়ে ভারতবর্ষকে শেষ আঘাত হানতে হবে। এই শেষ আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু হবে, এই শয়তানি শক্তিকে শেষ আঘাত হানবার গৌরব ভারতবর্ষই অধিকার ক'রবে। বন্ধুগণ, বিদেশে থেকে আমি যা দেখেছি এবং আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎখাত হবেই, এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে স্বাধীন ভারত দেখা দেবে। সব ভয়, সন্দেহ ও দ্বিধা পরিত্যাগ করে জাতীয় সংগ্রামে সাহায্য করবার জন্য আমি তাই দেশবাসীকে আহ্বান করছি। যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে কাজ করবে তাদের অমঙ্গল হবে। সময় এখন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং চক্রশক্তি ও ভারতবর্ষের পক্ষে কাজ করছে।

আমাদের তাই যেমন করে হোক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের আরও দু' বছর সংগ্রাম চালাবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে, আর এই সংগ্রামে অন্তত এক লাখ লোক বলি দিতে হবে। এই দু' বছর শেষ হবার আগেই ভারত স্বাধীন হবে। আমাদের ধ্বনি হবে "দু বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করব আর দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য এক লাখ লোক জীবন বিসর্জ্জন দেবে।" তা যদি করতে পারি তা হলে আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসবে।

অহিংস গরিলা যুদ্ধের দুটো দিকের কথা আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। প্রথমত শাসন ব্যবস্থা অচল করে তুলতে হবে, দ্বিতীয়ত সমর প্রচেষ্টা ধ্বংস করতে হবে। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচার বৃদ্ধি করবার সময় এখন হয়েছে। আমাদের দলের লোক বহু সংখ্যায় সৈন্য দলে ভর্ত্তি করলে এ কাজ সহজ হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিকে ভারতীয় সৈন্যদের অত্যন্ত জরুরী কাজ করতে হবে।

বন্ধুগণ, আপনারা এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশকে অনেক কাজ করতে হবে। বাংলা দেশের ভাইবোনদের এই কাজের জন্য তৈরী হতে হবে। সিংহলের ভাইবোনদের অগ্রসর হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করছি। এ সুযোগ একমাত্র ভারতবর্ষের নয়, সিংহলেরও। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করবার জন্য বিরাট যুদ্ধে লিপ্ত তখন সিংহলের কাজ ত আরও সহজ হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের যেমন তেমনি সিংহলের কথা হবে একটি "হয় এখন, নয়ত নয়"। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেই সিংহল স্বাধীন হবার আশা করতে পারে।

বন্ধুগণ, ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারবিদেরা যা রটাচ্ছে তা থেকে একটুও বিচলিত হবেন না। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তা হলে আজকার অবস্থা আপনি বুঝতে পারবেন। আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও মিত্রশক্তি জয়লাভ করতে পারে নি! জেনারাল আইসেন

হাওয়ার এখন আফ্রিকায় পাঁয়তাড়া ভাঁজছে, কখনও কখনও বা হঠে যাচ্ছে। এই পরাজয় গোপন করবার জন্য বলছে প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে রাশিয়া, আফ্রিকা নয়। য়্যুরোপে ব্রিটিশ শক্তি, অথবা প্রভাবের অস্থিত্ব নেই, রাশিয়ায় প্রকৃত অবস্থা যে কি তা বুঝতে পারা যাবে দুই দলের সৈন্যসংস্থান দেখলে। সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকা ভীষণভাবে হেরেছে আর জাপানীরা ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে উপনীত। এশিয়ায় জাপানের নীতি কি তা পৃথিবীর কাছে, ভারতবাসীর কাছে জেনারাল তোজো আগেই ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মনোভাব খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন। এ যুদ্ধের শেষ ফলাফল হবে আফ্রিকাতে নয়, য়্যুরোপ ও এশিয়ায়। ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্যদের অবস্থা কি তা সকলেই জানে। তাদের সঙ্কটাবস্থা, খুব জোরে ঢাক পিটিয়ে আর তাদের রক্ষা করা যাবেনা।

বন্ধুগণ, পরিশেষে আপনাদের অনুরোধ করছি আপনাদের প্রাণপণ শক্তি কাজ করুন। জয় হবেই। সময় আমাদের পক্ষে। বাইরের মিত্ররা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আর কি আমাদের চাই? আমাদের শুধু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, ফলাফল যাই হোক, ক্ষতি যতই হোক। স্থির বিশ্বাস রাখুন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হোক! স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

সুদূর প্রাচ্যের বক্তৃতা

১। টোকিও থেকে প্রথম বক্তৃতা

(২১শে জুন, ১৯৪৩ সালের বক্তৃতা)

বন্ধুগণ, গত এপ্রিল মাসে পৃথিবীর আর এক অংশ থেকে আপনারা আমার কথা শুনেছেন। আমি এখন টোকিও তে আছি, এখানকার ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করছি। আপনাদের কাছে শেষ বক্তৃতা করবার পরে যুদ্ধের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়নি। পশ্চিম রণক্ষেত্রে ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্যেরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জ্জন করেছে, উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তারপরে ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি ঊষর ছোট ছোট দ্বীপও তারা দখল করেছে। এই সামান্য সাফল্যের পর ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারবিদেরা তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ঢক্কা নিনাদে আকাশ বিদীর্ণ করছে। এর আগে তারা উত্তর-আফ্রিকায় সৈন্য অবতরণ নিয়ে খুব হৈ চৈ করে বলেছিল যে আফ্রিকার রণক্ষেত্রেই যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু আজ উত্তর-আফ্রিকা বিজয়ের পরেও জয়লাভ থেকে তারা ১৯৪০ সালের শেষে যতটা দূরে ছিল, ঠিক ততটা দূরেই আছে। এই সব প্রচার থেকে মনে হয় যে তাদের লোকদের মনোবল বজায় রাখবার জন্য ছোট হলেও দু-একটি সাফল্য তাদের প্রয়োজন। আমি যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকার রেডিও শুনে থাকি তেমনি যদি অন্য লোকে শোনে তবে তাদের মনে হবে যে টিউনিসিয়ায় জয় লাভ করে তারা যেন

যুদ্ধেই জিতে গেছে। এই ধরণের প্রচার করে গত যুদ্ধে খুব সুফল পাওয়া গিয়েছিল, কারণ রেডিও তখন ছিলনা বললেই হয়। এই কারণেই তারা আবার ঐ রকম প্রচার সুরু করেছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে পৃথিবীর লোকে ১৯১৫।১৬ সালের মত আর সরল নেই। রেডিও মারফতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোক সবদিককারই মতামত জানতে পারে। ভারতবর্ষের লোক ব্রিটেনের মিথ্যা প্রচারে চিরকাল প্রবঞ্চিত হয়ে এখন খুব সাবধান হয়ে গেছে। কাজেই শত্রুপক্ষের এক তরফা প্রচারে তারা আর প্রভাবান্বিত হবে না। আমার তাই দৃঢ় ধারণা যে লণ্ডন, নিউইয়র্ক অথবা বোস্টন থেকে যাই বলুক না কেন, আমার দেশবাসী তাতে ভুলবে না।

ভূমধ্যসাগরে প্যান্টেলেরিয়া ও লাম্পেডুসার মত ক্ষুদ্র ও অনুর্ব্বর দ্বীপ দখল করার পর শত্রুর প্রচারকেরা এমনভাবে কথা বলছে যেন য়্যুরোপে সৈন্য অবতরণ আর দখল কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্য ফরাসী ও উত্তর-আফ্রিকায় অবতরণ করার সময় আমি প্যারিসে ছিলাম। তখন আমি বহু প্যারিসের অধিবাসীর মুখে শুনেছি যে ইঙ্গ-আমেরিকার রেডিও স্টেশন থেকে বলেছে যে তাহাদের সৈন্য পনের দিনের মধ্যে প্যারিসে পৌছবে। যে সব ফরাসী এই সংবাদে খুসী হয়ে উঠেছিল দিয়েপের পর্য্যুদস্ত হবার পরে ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্যরা আর ফরাসী দেশমুখো হলো না দেখে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই সব আশাবাদীরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে য়্যুরোপ দখল চাঁদ দখল করবার মতই এখনও সুদূর।

বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আফ্রিকার যুদ্ধ যখন চলছিল তখন আপনাদের আমি বরাবরই বলেছি যে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করতে আফ্রিকার যুদ্ধ তাৎপর্য্যপূর্ণ নয় যদিও ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা খুবই ঢকা নিনাদ করছে। আপনারা

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে তখন আমি যা বলেছিলাম তা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সাইরেনাইকা, ট্রিপলিটানিয়া অথবা টিউনিসিয়ায় যখন যুদ্ধ শেষ হচ্ছিল, যুদ্ধ শেষ হবার সম্ভাবনা তখন যেমন ছিল তার চাইতে কিছুই বেশী হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে য়ুরোপ, এশিয়া ও সমুদ্রবক্ষের অবস্থার ওপরে, একথা আপনাদের আমি আগেও বলেছি। ভারতবর্ষের পক্ষে নিকটবর্ত্তী দেশের অবস্থার ওপরেই সব নির্ভর করছে। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা যাই বলুক, জাপানী সৈন্য হংকং, ফিলিপাইন, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বর্মায় বিপুল জয়লাভ করে এখন ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হয়েছে, এটা উপেক্ষা করা অথবা গোপন করা সম্ভব নয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে একজন ব্রিটিশজেনারেলেরও মনে হয়নি যে পূব দিক থেকে কখনও ব্রিটিশের কোনও শত্রু আক্রমণ করতে পারে। তাই ব্রিটিশ সমরবিশারদেরা তাদের পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করেছে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে। তাই সিঙ্গাপুরের নৌঘাটি গড়ে তুলে তারা ভেবেছিল যে ভারতবর্ষ নিরাপদ। কিন্তু জাপানীদের আশ্চর্য্য অগ্রগতি ও জয় থেকে ব্রিটিশ রণকৌশলের অপদার্থতা পৃথিবীর লোকে বুঝতে পেরেছে। তার পরে জেনারাল ওয়েভেল পূর্ব্ব-সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করবার জন্য প্রাণপণ করছে। কিন্তু ভারতীয়দের প্রশ্ন হচ্ছে এই "যদি ২০ বছর ধরে সিঙ্গাপুর গড়ে তুলে এক সপ্তাহের মধ্যে হারিয়ে যায়, তা হলে চিরপলাতক জঙ্গীলাট অথবা তার উত্তরাধিকারীরা পূর্ব্ব-সীমান্ত থেকে পালিয়ে আসতে কত সময় নেবে?

আপনারা দেখেছেন যে এ যুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্য বহু প্রচার সহযোগে কতবার অভিযান সুরু করেছে। য়ুরোপ দখল করবার ইচ্ছা মনে রেখে তারা আবার প্রচারে মেতেছে। জেনারেল ওয়েভেল

বর্মা অভিযান সুরু করে বর্মার ভেতরে প্রবেশ করবার পরেও এমনি প্রচার সুরু হয়েছিল। তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে বর্মা অভিযান সত্য সত্যই আরম্ভ হ'ল। কিন্তু জাপানী সৈন্য প্রতি-আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন নিয়ে পালিয়ে এসে ব্রিটিশ সেনানায়ক কী বললেন? জেনারেল পরে নানা রকম অজুহাত দেখিয়েছেন এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকতে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যখন সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছিলেন তখন তাঁর সেনানায়কের বর্মা পুনরুদ্ধারের অসাফল্যের কারণ দেখাতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না যে আগে থেকেই ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা কেন চেঁচাতে সুরু করে। তাদের তুলনায় চক্রশক্তি অনেক কম কথা বলে, কোন অভিযানের প্রারম্ভে ঢাক না পিটিয়ে প্রকৃত ঘটনাবলীই চোখের সম্মুখে ধরে দেয়। ফরাসীদেশ ও ইংলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপগুলো ১৯৪০ সালে দখল করে জার্মাণরা একবারও বলেনি যে তার ফলে ইংলণ্ড আক্রমণ সহজ অথবা ত্বরান্বিত হবে। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচার বিভাগ থেকে বলা হয় যে প্যাণ্টেলেরিয়া দখল করবার ফলে সিসিল অভিযান সহজ হবে, তা হলে মণ্টা থেকে কেন সহজ হলনা—মণ্টা ও প্যাণ্টেলেরিয়া থেকে সিসিলির দূরত্ব ও একই। বন্ধুগণ, ব্যাপার তা নয়; ইঙ্গ-আমেরিকার অবস্থা এখন এতই সঙ্গীন যে কোন উপায়ে তাদের দেশের লোকের হৃত মনোবল বজায় রাখতে চেষ্টা করতেই হবে, তাই তারা আগে থেকে ঢাক পিটায়। প্রচারকার্যে এমন প্রয়োজন স্বীকৃত, কিন্তু তাদের প্রচারে পৃথিবীর লোকে কেন বুঝবে। ভারতবর্ষের পক্ষে টিউনিসিয়া, টিমবাকটু, লাম্পেডুসা, বা আলাস্কার ঘটনাবলীর কোন গুরুত্ব নেই, ভারতে যা ঘটছে বা কাছাকাছি যা ঘটছে তার দিকেই তারা মনোযোগ দেবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্মা বিজয়ের চেষ্টা নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ

হয়েছে, বিজয়ী জাপানী সৈন্য আমাদের দেশের দ্বারদেশে। জাপানের গভর্ণমেণ্ট তার [ক্ষম প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর মারফতে বহুবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। ইঙ্গ-আমেরিকানদের তারা ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। যদি ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রয়োজন হয় তবে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তাদের সাহায্য করতে রাজী আছে। আমাদের দেশের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের আমাদের দেশ সম্বন্ধে গৃহীত নীতিই বিবেচ্য বিষয়।

আপনারা আমার মতই জানেন যে এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করত যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিপাকে পড়লে যে দল এগারটি প্রদেশের আটটিতে মন্ত্রিত্ব গঠন করেছে তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি করে ফেলবে। এই সব বন্ধুদের মতে তাই তখন কংগ্রেসের কর্ত্তব্য ছিল ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা, যতদিন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে এগিয়ে না আসে। এক বছর চলে গেল কিন্তু ব্রিটিশের দিক থেকে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তখন আমাদের এই বন্ধুরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ওপর মৃদু চাপ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এ দিক থেকে অনেক কাজ করা হল, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। এমন কি মিঃ উইনস্টন চার্চিলের মতে যা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে সব চাইতে বড় ঘটনা—সিঙ্গাপুরের পতনের পরও এবং বর্মা হারানোর পরেও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া গেল না। জগতে কত পরিবর্ত্তন নিয়ত হচ্ছে, পতন অভ্যুত্থান বন্ধুর পন্থায় পৃথিবী চলেছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নীতি অপরিবর্ত্তিত। এই হচ্ছে আমাদের শাসকের মত। একে আপনারা রাজনীতি জ্ঞানের অভাব বা পাগলামী বলতে পারেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের ওপর ভিত্তি করে। দল নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে শোষণ করে মোটা হয়েছে, ভারতের ঐশ্বর্য্য লুটে ঐশ্বর্য্যবান হয়েছে। আজ তাদের কাছে সাম্রাজ্য অর্থ হচ্ছে ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে হয় তার অর্থ ব্রিটিশের কাছে সাম্রাজ্য হারিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা। তাই যুদ্ধে যাই হোক অধিকাংশ ব্রিটিশ শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করবে সাম্রাজ্য ধরে রাখতে, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে অধীনে রাখতে। খোলাখুলি ভাবে আপনাদের আমি বলতে চাই যে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে দিতে চায় না সেটা তাদের পাগলামি নয়। তাদের সময় খারাপ পড়েছে বলে তারা তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে দেবে বলে যদি আমরা আশা করি তবে সেটাই আমাদের পাগলামি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচলিত কঠোর নীতির পেছনে আরও একটি কারণ আছে। জার্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একাংশ শত্রু দখল করছে আর এক অংশ এই যুদ্ধের মধ্যেই তাদের মিত্র নিয়ে নিচ্ছে। সাম্রাজ্য বজায় রাখতে প্রাণপণ করে জনবুল রক্তহীন হয়ে পড়ছে। এই বিপুল ক্ষতি পূরণ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষকে আরও বেশী শোষণ করা। সাম্রাজ্যবাদীর যুক্তিতে যুদ্ধে তাদের অবস্থা যতই সংকীর্ণ হবে ততই ভারতবর্ষকে অধীনে রাখা তাদের বেশী প্রয়োজন। শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু কখনও একটুও মচকাবে না। মানব-ইতিহাসে সাম্রাজ্যের রীতিই এই। তাই কোন ভারতবাসীর আশা করা উচিত নয় যে কোনদিন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে।

তার অর্থ এ নয় ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কখনও একটা সন্ধির জন্য চেষ্টা করবে না। সন্ধির আরও একটা চেষ্টা হবে, সেটা যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হলেও হতে পারে অথবা আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের উদার-নীতিকদের সন্তুষ্ট করবার জন্যও হতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় যে এই বছরেই তেমন একটা চেষ্টা হবে। আমি স্পষ্ট করে বলছি যে এই রকম সন্ধির চেষ্টায় ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কখনও

ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবে না, দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চালিয়ে স্বাধীনতার প্রশ্ন তারা এড়িয়ে যাবে, যেমন ১৯৪১ এ ডিসেম্বরে এবং ১৯৪২ এর জুলাইতে করেছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস গত বছর যে আলোচনা চালিয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হয় নি। তার ফলে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্যাহত হয়েছে। তাই আমাদের সব রকম সন্ধির চেষ্টার প্রতি চিরতরে বিমুখ হওয়া উচিত। স্বাধীনতার বেলায় কোনও বোঝাপড়া চলে না। স্বাধীনতার একটিই অর্থ আছে—ব্রিটিশ ও তার মিত্রেরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে। যারা সত্যিই স্বাধীনতা চায় তাদের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়ে লড়তে হবে।

বন্ধুগণ, তাই আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের সমগ্র শক্তি দিয়ে দেশের ভেতর স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের আন্দোলন ও আমাদের মিত্রদের আঘাতের ফলে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত না হচ্ছে ততদিন অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে, তার ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে স্বাধীন ভারতের আবির্ভাব হবে। এই সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ সম্ভব নয়। দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আমাদের ক্রমাগত অগ্রসর হতে হবে যতদিন জয়লাভ করে স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হয়।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

২। জার্মাণীর প্রতি বাণী

(টোকিও থেকে ২২শে জুন, ১৯৪৩ সালের বক্তৃতা)

ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ,

গত ২৬শে জানুয়ারীতে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে আমি আপনাদের কাছে শেষ বক্তৃতা করেছি। পৃথিবীর আর

এক প্রান্ত টৌকিও থেকে আজ আবার আপনাদের কাছে বলছি। আমার বার্লিনে থাকবার সময় রাইখ গভর্ণমেণ্ট আমার প্রতি যে আতিথেয়তা দেখিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জার্ম্মাণীতে আমি ছিলাম আগন্তুক, তবু এই মহান দেশে যুদ্ধের সময় থাকাটা আমার জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। গত যুদ্ধ শেষ হবার এক বৎসর পরে আমি যখন ব্রিটেনে ছিলাম তখন চিনির বদলে স্যাকারিন এবং মাখনের বদলে ভেজিটেবল মাখন খেয়েই খুসী ছিলাম। তাই আমার ধারণা ছিল নাগরিক অধিবাসীদের খাদ্য এই সময়ে খুবই কমিয়ে দেওয়া হবে। জার্ম্মাণীর লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ যে যথেষ্টই পাচ্ছে, তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। য়্যুরোপের অন্যান্য দেশে বেড়িয়ে আমি দেখলাম যে শত্রুপক্ষ যে প্রচার করেছে জার্ম্মাণী অন্যান্য দেশ লুণ্ঠন করেছে তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি দেখেছি প্যারিস, ব্রুসেলস, হেবা প্রভৃতির রেস্তোরাঁতে বার্লিনের চাইতে ভাল খাবার পাওয়া যায়। তাই থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে যুদ্ধের মধ্যে য়্যুরোপের আর্থিক ও খাদ্যের অবস্থা যতটা ভাল হাওয়া সম্ভব তা আছে। গত যুদ্ধের পরে য়্যুরোপে যে কি বিরাট পরিবর্ত্তন হয়েছে তাও আমি দেখেছি। গত যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জার্ম্মাণীকে অবরোধ করতে পেরেছিল, এবারে চক্রশক্তিই ব্রিটেনকে অবরোধ করেছে। শত্রুর সরবরাহ লাইনে ক্রমাগত আঘাত করবার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমি যখন জার্ম্মাণীতে ছিলাম তখন দেখেছি যে দেশের লোক ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কতটা আগ্রহশীল। এ দিক দিয়ে উৎসাহ যে কতটা বেড়েছে তা বুঝতে পারা যায় জার্ম্মাণীতে ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়, পররাষ্ট্র দপ্তরে ভারতীয় ব্যাপারের জন্য একটি বিশেষ কমিটি স্থাপন থেকে।

জার্মাণদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পুস্তকাদির চাহিদা বেড়েছে। জার্মাণীর যুদ্ধের পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপ, ডাঃ গোয়েবল্‌স্, হিমলার, স্ত্যাথ্‌ট্ প্রভৃতি নেতার সঙ্গে আলোচনা করে আমি জার্মাণীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ যে কতটা সত্য এবং তার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে সহানুভূতি যে কত গভীর তা বুঝতে পেরেছি। জার্মাণ জাতির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ ইন্দো-য়ূরোপীয় ট্রাডিশনের ভিত্তির ওপর রচিত, তাই তা বহু শতাব্দী ধরে জাগরুক রয়েছে। গ্যয়টে, সোপেনহাওয়ার, রয়কার্ট, শ্লেগেল প্রভৃতি মনীষীরা ভারতবর্ষ এবং জার্মাণীকে সংস্কৃতির দিক থেকে নিকটতর করবার জন্য কাজ করেছেন। এই সব মনীষীরা ভারতের অতীত সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এখন জার্মাণী ও তার নেতৃবর্গ আধুনিক ভারতবর্ষের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামই বহু সংখ্যক জার্মাণের সহানুভূতি উদ্রেক করেছে।

গত যুদ্ধের পর থেকেই ভারতবাসীদের জার্মাণ-প্রীতি দেখা দিয়েছে। জার্মাণী আমাদের চিরশত্রু ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করছে, কাজেই, এটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমাদের বংশপরম্পরায় শত্রুর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুদ্ধে এই সহানুভূতি একশ' গুণ বেড়ে গিয়েছে। ব্রিটেনের প্রতি চক্রশক্তির প্রত্যেকটি আঘাত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষভাবে সাহায্য করছে। এই সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। উপরন্তু আমাদের আন্দোলন সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করায় এবং কার্য্যকরী সমর্থনের জন্য আমাদের মন জার্মাণরা জয় করে ফেলেছে।

ব্যক্তিগত ভাবে য়ূরোপের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেছি বলে আমি ইঙ্গ-আমেরিকার দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে বক্তৃতায় আমার হাসি পায়। যারা ফরাসী দেশের প্রকৃত অবস্থা জানত, তাদের কাছে দিয়েপের ঘটনা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যেরা দ্বিতীয়বার

ফ্রান্সীদেশে অবতরণ করবার চেষ্টা করলে দ্বিতীয়বার দিয়েপের অবস্থা হবে, আরও অনেক বড় আকারে। ইঙ্গ-আমেরিকানরা আগে থেকেই কেন তাদের পরিকল্পনা নিয়ে ঢাক পিটায়, তা আমি বুঝতে পারি না। কথা যত কায়দা করেই বলা হোক না কেন, কথা দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। এ থেকে আমার মনে হয় যে কাগজে ও রেডিওতে বক্তৃতা দিয়ে ইঙ্গ-আমেরিকানরা তাদের লোকের মনোবল বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। জেনারেল ওয়েভেলের বেশ জানা উচিত যে খুব প্রকাণ্ড ভাঁওতা দিয়েও সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করা যায় না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস প্রচার চালাবার পর এই বিখ্যাত সেনানায়ক বর্মা অভিযান আরম্ভ করলেন। যখন জাপানীরা পাল্টা আক্রমণ স্নুরু করল তখন সেনাপতিকে বহু বক্তৃতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে হল।

ভূমধ্যসাগরে কয়েকটি দ্বীপ দখল করতে না করতেই ইঙ্গ-আমেরিকানরা য়ুরোপ দখল করা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে স্নুরু করেছে। দ্বীপময় দুর্গ মল্টা থেকে যদি ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্য য়ুরোপে অবতরণ করতে না পেরে থাকে, তবে প্যান্টেলেরিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্ট সৃষ্টি করতে কি সাহয্য করবে? ১৯৪০ সালে ইংলিশ চ্যানেলের দ্বীপগুলো দখল করে জার্মাণরা কখনও ব্রিটেন আক্রমণের কথা বলে নি। ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তির উত্তর আফ্রিকাতে যে জয় হয়েছে তা স্বীকার্য্য। কিন্তু যখন সাইরেনাইকাতে যুদ্ধ চলছিল তখনই আমি জোর দিয়ে বলেছি যে আফ্রিকার রণক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত হবে না। আমি এখনও সেই কথাই বলছি। যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে য়ুরোপ, আফ্রিকা ও মহাসাগরের বুকে। ইঙ্গ-আমেরিকানরা জার্মাণদের ভয় দেখাতে চায়, তাই কিছুদিন ধরে তারা জার্মাণীর ওপরে বিমান হানা দিচ্ছে। এই সব বিমান হানার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে জার্মাণীতে থাকবার সময় আমারও

হয়েছে। শিশু ও নারীদের ওপর এই বিমান আক্রমণ চালিয়ে জার্মাণদের ভয় দেখাবার চেষ্টা যে কতটা হাস্যকর তা আমি জানি। জার্মাণীর অপূর্ব সঙ্ঘশক্তি ও "ফুহ্রের" জার্মাণদের মধ্যে যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে তার ফলে সমগ্র জার্মাণ জাতি এক উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ, তার ওপরে এই সব বিমান হানায় কোনই ফল হবে না। প্রকৃত রণক্ষেত্রে থেকে এই গৃহের রণক্ষেত্রে কোন অংশেই কম সুদৃঢ় নয়। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জার্মাণ জানে যে এই যুদ্ধ জয় করতেই হবে, তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। কোন বিমান হানাই জার্মাণদের দৃঢ় সংকল্প, নেতার প্রতি বিশ্বাস ও আশা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না।

দু'বছর আগে দেশ ত্যাগ করে আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে অবস্থা নিজেই অনুসরণ করেছি। এই ভাবে পৃথিবীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে যতদিন ধরেই এই যুদ্ধ চলুক না কেন এর ফল নিশ্চিত—এ যুদ্ধে ত্রিশক্তির জয় হবেই। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচারকেরা পৃথিবীর লোকের কাছে কি বলতে চায় তা আমি জানি। কথা দিয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করা গেলে ইঙ্গ-আমেরিকানরা বহু আগেই পৃথিবী জয় করে ফেলত।

কিছুদিন আগেও বলা হত যে আমেরিকার অসীম উৎপাদন শক্তি এবং সময় যা চক্রশক্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে তার ফলেই মিত্র পক্ষের জয় হবে। ওয়াশিংটনে শেষবারে গিয়ে ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী এই যুক্তি ছেড়ে ফিরেছেন। ত্রিশক্তির একটা সুবিধে আছে, তারা একটা পাথরের প্রাচীরের মত একত্র দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে ঈর্ষা বা সন্দেহ নেই যে তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু শত্রু শিবিরের অবস্থা কি? সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অবিশ্বাস করে., জিরো, দ্য-গল কে সন্দেহ করে। এই সামগ্রিক যুদ্ধে এই বিচিত্র সৈন্যসমাবেশে জয়লাভ করা অসম্ভব।

জাপানে অন্য চক্রশক্তির দেশের মতই বিশ্বাস ও উদ্দীপনা রয়েছে। প্রত্যেক জাপানীই তাদের বীরবর ইয়ামামটোর মত তার কর্ত্তব্য করতে তৈরী। জাপানের জনবল ও সম্পদ প্রচুর আছে তা তারা এখনও প্রয়োগ করে নি। আর্থিক ও খাদ্যের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক, তা উত্তরোত্তর আরও ভাল হবে। এই অসীম সম্পদ এক সময়ে এ্যাংলো-স্যাক্সনদের দখলে ছিল, আজ এ গুলোই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দৃঢ় সংকল্প, অতুলনীয় বীরত্ব এবং উন্নততর রণকৌশল থেকে বুঝা যায় যে চক্রশক্তির জয় হবেই।

আমার জার্ম্মাণ বন্ধুগণ, সূর্য্য উদয়ের দেশ থেকে আমি আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যুদ্ধে যে সব অপূর্ব্ব জয় আপনাদের হয়েছে, যার নানা 'নব-ব্যবস্থা' প্রবর্ত্তন আপনাদের পক্ষেও সম্ভব হবে —যে ব্যবস্থার সাম্য এবং ন্যায়ের ওপরে ভিত্তি,—তার জন্য আপনাদের অভিনন্দিত করছি।

ত্রিশক্তি ও তার মিত্রদের জয়ে আমার বিশ্বাস আমাদের অচিরে স্বাধীনতা লাভে বিশ্বাসের মতই সুদৃঢ়।

জার্ম্মাণ ও য়ুরোপের অন্যত্র আমার সহকর্মীদের প্রতি আমি অভিনন্দন পাঠাচ্ছি। আমার একটুও সন্দেহ নেই যে তারাও এই বিরাট সংগ্রামে প্রাণপণ করবে। আমাদের এখনও বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু তা দূর করতে হবে। কিন্তু শেষ বিজয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা আসবেই—রাতের শেষে যেমন উজ্জ্বল দিনের আলো ফুটে ওঠে তেমনি এটা সম্ভব হবেই।

ত্রিশক্তি ও তাদের মিত্র দীর্ঘজীবী হউক, স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হউক।

৩। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় হয়েছে *

[৪ঠা জুলাই ১৯৪৫ সালে শোনান (সিঙ্গাপুর) থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা]

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কাছে সিঙ্গাপুর থেকে বলছি। আজ সিঙ্গাপুরে ভারতের স্বাধীনতা লীগ সম্মেলনে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি তারই সারাংশ আবার বলব।

শ্রীরাসবিহারী বসু, পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতিনিধিবর্গ, ভাই ও বোনেরা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাকে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি মনোনীত করবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা যে সম্মান দেখিয়ে এক বিরাট দায়িত্ব আমাকে নিতে বলেছেন তা আমি গ্রহণ করলাম। এবং আপনাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমার কর্ত্তব্য পালন করব। ভারতবর্ষে এবং বিদেশে আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী যদি আপনাদের বলি তাহা হলে আপনারা স্বীকার করবেন যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের উপরে আছে, তিনিই আমাদের স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়েছেন এবং রক্ষা করেছেন। তিনিই আমার আশা জাগিয়ে তুলেছেন এবং আমার চিন্তা করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুগণ, স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের সময় হয়েছে। এই যুদ্ধের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে স্বদেশের প্রতি আনুগত্য এবং সাহায্য প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত আমার দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন তাঁরা একটি পতাকাতলে সমবেত হউন। আপনারা আজ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাতে কেবল যে ভারতীয়দের সমর্থন আছে তা নয়, পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ লোক একেই সমর্থন করছে জেনে আনন্দিত। ভারতবর্ষের

* সিঙ্গাপুর থেকে প্রদত্ত হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা। ১৯৪৩, ৪ঠা জুলাই তারিখে নেতাজী স্বাধীনতা লীগের সভাপতি মনোনীত হন। এই বক্তৃতাটি লীগ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের বাইরের ভারতীয়েরা স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত ভারতীয়েরা দেশের লোকদের সঙ্গে যোগ রেখেছে। এখন আমরা খোলাখুলিভাবেই বলতে পারি যে গত বারো মাসে আমাদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যোগ স্থাপন করেছে। আমরা এমন কাজ করব না যা আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কেমন করে আমাদের স্বাধীনতা আসবে এখন আপনাদের তাই বলব। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার চাপে ব্রিটেন আমাদের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে এ বিশ্বাস আমাদের অনেক বন্ধুর ছিল, তাদের এই আশা আকাশ-কুসুম প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধকালে ও তার পরে চরম শোষণ করবার জন্য তৈরী। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ওয়েভেলকে এই উদ্দেশ্যে বড়লাট নির্ব্বাচিত করেছে। কেউ কেউ মনে করে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের মত লোক ভারতীয়েরা বেশী পছন্দ করত। কিন্তু আমার মত তা নয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পলাতক সেনাপতিকে ভারতের বড়লাট নির্ব্বাচিত করেছেন।

ভারতের সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনিই হবেন শেষ ব্রিটিশ বড়লাট। ওয়েভেলের সামরিক শাসন ভারতীয়দের ঘৃণাই বৃদ্ধি করবে, তার ফলে আমাদের বিপ্লব এগিয়ে আসবে। ক্রীপসের আগমনের পর ১৯৪২ সালে যে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল তা আমাদের দেশবাসীকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করবেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাইতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কথাটা তিনি পছন্দ করেন। ব্রিটিশ নানা রকম প্রস্তাব করতে পারে, আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি, সবই আপনাদের ফাঁদে ফেলতে। ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আমাদের ক্ষতি হবে, আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল বলে প্রমাণিত হবে। ত্যাগ ও কর্ম্মের

জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে, অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের বিরোধী হলে চলবেনা। আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানবার জন্য সুবিধা চক্রশক্তি করে দিয়েছে, আমাদের শত্রুরা পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে চক্রশক্তি লড়াই করবে।

বন্ধুগণ, গত দু' বছর ধরে আমি যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করছি আমি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলছি যে চক্রশক্তির জয় হবেই। আমি জানি এই দীর্ঘ যুদ্ধে মাঝে মাঝে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। ইঙ্গ-আমেরিকানদের পরাজিত করবার জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করতে হবে। অবস্থা চক্রশক্তির অনুকূল যদিও আমি স্বীকার করি যে ইঙ্গ-আমেরিকানদের কিন্তু কিছু সাফল্য সম্প্রতি হয়েছে। তবে আপনারা দেখতে পাবেন যে পরে তাদের একটার পর একটা পরাজয় হচ্ছে।

পৃথিবীতে সব চাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ করে নি। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নজীর পাওয়া যাবে যে স্বাধীনতার কোনও সংগ্রামই বাইরের সাহায্য ছাড়া সফল হয় নি। বর্ত্তমান অবস্থায় চক্রশক্তি আমাদের চিরশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তাই তারা আমাদের মিত্র। প্রয়োজন হলে যদি আমরা ত্রিশক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিই তাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি জানি আমাদের দেশে অনেকের ত্রিশক্তির আন্তরিকতায় সন্দেহ আছে।' কিন্তু যে চক্রশক্তি আমাদের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে, এই লড়াই করেই তো তারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করছে—ও কথাটা একটি শিশুরও বুঝতে কষ্ট হবেনা। আমাদের প্রতি চক্রশক্তির মনোভাব তারা পরিষ্কার করে বলেছে। জাপানও তার নীতি বিবৃত করে ভারতবর্ষ, বর্মা, ফিলিপাইনের প্রতি তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে জাপানের এই আন্তরিক প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য

ব্রিটিশ রাজনীতিক ও প্রচারকেরা কৌশলে নানা কথা রটাচ্ছে। জেনারেল তোজো এই বছরেই বর্মা ও ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ঘোষণা করে ব্রিটিশ প্রচারকদের থামিয়ে দিয়েছে। বর্মা ও ফিলিপাইনের প্রতি জাপান যে বন্ধুভাব অবলম্বন করেছে তাই থেকেই জাপানের আন্তরিকতা, সাধুতা ও সত্যবাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচ্যে জাপানই প্রথমে পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। জাপানীরা জানে যে যতদিন এশিয়ার দেশগুলো পরাধীন থাকবে ততদিন জাপানের স্বাধীনতাই বহিরাক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। তাই এশিয়ার দেশগুলোর মুক্তি সত্যিই তারা দেখতে চায়। স্বাধীনতা লাভ করে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করবার এক মস্ত সুযোগ আমরা পেয়েছি। যাদের মনে কোন সন্দেহ অথবা দ্বিধা আছে তাদের আমি আমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। আমি আমার দেশের প্রতিই একমাত্র আনুগত্য রক্ষা করব, কখনও দেশের মন্দ বা প্রবঞ্চনা করব না। ভারতবর্ষের জন্য আমি জীবন পণ করেছি। টোকিও থেকে এর আগে বক্তৃতা দেবার সময় আমি আপনাদের বলেছিলাম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে নানা রকম কষ্ট দিয়েও নোয়াতে পারে নি। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা আমাকে কখনও ফাঁকি দিতে পারেনি। সত্য পণ থেকে আমাকে সরাতে কেউ পারবে না।' প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা উচিত যে ব্রিটিশের জয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ। আমাদের স্বাধীনতা কামনা একমাত্র চক্রশক্তির জয়েই সফল হতে পারে। চক্রশক্তির জয় হলে আমরা যে স্বাধীন হব তা আমরা ধরে নিতে পারি।

বন্ধুগণ, সময় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের পক্ষে। সংগ্রাম করবার জন্য, ত্যাগ স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত থাকলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করবই। আপনাদের স্মরণ আছে স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপস

নিরাশ হয়ে গত মে মাসে দেশে ফিরে গেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার পর থেকেই নতুন অধ্যায় সুরু হয়েছে। তার পর থেকে আমরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছি। গত আগষ্ট মাসে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করবার পরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর থেকেই সর্ব্বত্র ভারতবাসীদের মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। দেশে ও বিদেশে ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একজন নেতার অধীনে সমবেত হওয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য আদেশের অপেক্ষা করা। আমি স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে সকলকে একত্রিত করবার সিদ্ধান্ত করেছি। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে। এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হবে ভারতীয় বিপ্লবকে সফল করে তোলা। এই গভর্ণমেণ্ট দেশে ও বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র জোগাবে এবং সর্ব্ব উপায়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করবার কাজে সাহায্য করবে। ভারতবাসীরা তখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হয়ে গেলে আমরা চক্রশক্তির মত আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করব, এই ভাবে রক্ত দিয়েই আমরা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করব। ত্যাগ ও বীরত্ব দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করব তা আমরা অনায়াসেই রক্ষা করতে পারব।

বন্ধুগণ, আপনারা আমার প্রতি যে বিশ্বাস ও আনুগত্য দেখিয়েছেন, সব রকম সহায়তা করবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমাদের বিজয় সম্বন্ধে আমার আদৌ সন্দেহ নাই সত্য, তবে শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে হীন ধারণা করলে চলবে না। পথে যে বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের শত্রু পরাক্রমশালী নয়, উপরন্তু তারা শঠ ও নির্দ্দয়। অত্যন্ত কঠোর যুদ্ধ আমাদের করতে হবে। আপনাদের অভাবনীয়

কষ্ট সহ্য করতে হবে, অনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারবেন, অবনত দেশকে স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করে তুলতে পারবেন।

বিপ্লবাগ্নি জ্বলে উঠুক। স্বাধীন ভারত বেঁচে থাকুক।

৪। আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করব *

(সিঙ্গাপুর থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯৪৪ সালের বক্তৃতা)

ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, গত অক্টোবর মাসে আমি পূর্ব্ব এশিয়া পরিদর্শনের জন্য বর্মা ত্যাগ করি, এই জন্যেই আপনাদের কাছে রেডিওতে আমি কিছু বলতে পারি নি। গত নভেম্বর মাসে টোকিও থেকে বক্তৃতা করবার সময় বলেছিলাম যে জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাদের কাছে শীঘ্রই বক্তৃতা করব। এই বক্তৃতা আরম্ভ করবার আগে আমি আপনাদের নববর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছি। নতুন বছরে যুদ্ধ শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। ভারতবাসী বিশেষ যাঁরা পূর্ব্ব-এশিয়ায় আছেন তাঁরা বেশী ত্যাগের জন্য তৈরী হউন। পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতবাসীদের শেষ সংগ্রামের জন্য তৈরী করতে আমি সে সব দেশ গিয়েছিলাম। পূর্ব্ব-এশিয়ায় এমন জায়গা নেই যেখানে ভারতবাসী নেই। তারা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহশীল। পূর্ব্ব-এশিয়ার সব দেশ থেকেই লোকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিচ্ছে, এবং বহু অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে সব সময়ে টাকা দিয়ে সাহায্য করা হবে। মালয়, ইন্দোচীন, ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর প্রচেষ্টা

* হিন্দুস্থানীতে নববর্ষের অভিভাষণ। আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ঘোষিত।

পরিদর্শন করে এসেছি। শুধু মালয় দেশেই আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সত্তর লক্ষ ডলার পেয়েছি।

এই সময় আমার মনে হচ্ছে তাদের কথা যারা ব্রিটিশের অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ। এই সব ধীর দেশপ্রেমিকেরা কি করেছেন তা আমি এখানে বলতে চাই না। তাঁরা কারারুদ্ধ হন কারণ তাঁরা দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ন্যায়ের জয় হবেই। যতদিন আমাদের স্বাধীনতা লাভ না হচ্ছে ততদিন আমরা শান্ত হব না।

যুদ্ধের শেষ ক্রম উপস্থিত। গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসেই তার শেষ দেখা গিয়েছে, এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেই যাঁরা বলতেন যে যুদ্ধ ১৯৪৪ সালেই শেষ হবে, তাঁরাই বলছেন যে যুদ্ধ ১৯৪৫, এমন কি ১৯৪৬ এও শেষ না হতে পারে। জার্মাণদের পাল্টা আক্রমণ এবং V-1 ও V-2 বোমার আক্রমণে মিত্রপক্ষের টাইম টেবিল পাল্টে গেছে। মিত্রশক্তির প্রচার ধরা পড়ে গেছে। ইংলণ্ড বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সমর-উপকরণ তৈরীতে জার্মাণরা তার শত্রুর চাইতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। শত্রুরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে জার্মাণদের আত্মরক্ষা করবার ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়।

অন্যদিকে, রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে অত্যন্ত গভীর বিভেদ রয়েছে। গ্রীস, ইটালী ও বেলজিয়ামে ব্রিটিশ নীতির যে তীব্র সমালোচনা আমেরিকার কাগজে হয়েছে তা থেকেই য়্যুরোপে মিত্রশক্তির নীতিতে বিভেদ বুঝতে পারা যায়। ব্রিটিশ সৈন্য গ্রীকদের মুক্তি দেবার অজুহাতে তাদের ওপরে গুলী চালাচ্ছে। গ্রীসের ব্যাপার নিয়ে মিঃ চার্চিল ও মিঃ ইডেন সম্প্রতি বক্তৃতা করেছেন। মিঃ রুজভেল্ট বলেছেন আটলাণ্টিক চার্টার বলে কিছু নেই, তাতেই সব ফাঁস হয়ে গেছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের জনবলের ক্ষতি যেমন হচ্ছে তেমনি জার্মাণ ও জাপানে রণসম্ভার উৎপাদন বেড়েই যাচ্ছে। যদি জার্মাণী পরাজিত হয়, তা হলে আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্য য়্যুরোপে রাখতে হবে বলশেভিজম্‌কে বাধা দেবার জন্যই। এটা জাপানের পক্ষে খুবই শুভ। ইঙ্গ-আমেরিকার নীতিই তাদের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করবে। আমরা যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি তাদের য়্যুরোপীয় পরিস্থিতির ওপর মনোযোগ দিতেই হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের ইঙ্গ-আমেরিকানদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। আমেরিকা কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দখল করাতে মিত্রপক্ষের প্রচারকরা কিছু উপাদান পেয়েছে। কিন্তু তারা এখন বুঝতে পেরেছে যে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে লাফিয়ে বেড়ালে কোন লাভ হবে না। জেনারাল ওয়েভারমেরার এটা স্বীকার করেছেন। আমেরিকানরা বলেছে যে ফরমোসা দ্বীপের কাছে এবং ফিলিপাইনে জাপানের নৌবাহিনী ভয়ানক ছেয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমেরিকার নাবিক ও ভারতে ব্রিটিশ সাংবাদিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করাতে ব্যাপারটি যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়েছে। এখন তারা বুঝতে পারছে আমেরিকার নৌবাহিনীর নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের মতই অবস্থা হয়েছে। আগামী ঘটনা থেকে আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণিত হবে। ফিলিপাইনে জাপানীরা আমেরিকার প্রতি কঠোর আঘাত হানছে। আমেরিকা চুংকিং-এর সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগ স্থাপন করবার কথা আলোচনাই করছে, কিন্তু জাপানের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের স্থলপথ নির্ম্মিত হয়ে গেছে। জাপান জাতি প্রত্যেকে জাপানের রণসম্ভার তৈরীর কাজে নিযুক্ত। শত্রুরা যুদ্ধ শেষ করতে চায়, কিন্তু তা অসম্ভব। জাপানী ও জার্মাণীদের স্বার্থ যুদ্ধ দীর্ঘতর করা। জাপানের কামিকাজি বাহিনী আমেরিকানদের বিভীষিকা দেখাচ্ছে। আমি জাপানে অনেকবার গিয়েছি এবং জাপানের সামরিক শক্তি চোখে দেখে এসেছি।

এই প্রসঙ্গে রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা গত ৩রা ডিসেম্বর যে বিবৃতি দিয়েছে, ও আমেরিকার সহকারী সচিব ২১শে ডিসেম্বর যে বিবৃতি দিয়েছে পড়ে দেখবেন। এই বিবৃতিগুলো থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকার জাপানের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা বুঝতে পারা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজও শীঘ্রই আক্রমণ সুরু করবে। তখন ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত পালাতে হবে।

ইন্দো-বর্মা রণক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জয় সুনিশ্চিত। শত্রুর দুর্ব্বলতা কোথায় আমরা জানি। জয় সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দ্বিগুণ হয়েছে। ইন্দো-বর্মা রণক্ষেত্রে আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে তা আমরা জানি। চট্টগ্রাম ও ইম্‌ফলের যুদ্ধেই ভারতের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে। ধৈর্য্য ধরে অবিচলিত হয়ে আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা পালন করব। আজাদ-হিন্দ ফৌজ শীঘ্রই বাংলা ও আসামে উপনীত হবে। সেখানে উপস্থিত হলে তখন আমাদের সাহায্য করাই আপনাদের কর্ত্তব্য হবে। ইতিমধ্যে আপনারা নিজেদের আয়োজন সম্পূর্ণ করুন। কিন্তু সময় হবার আগেই ১৯৪২ এর মত কাজ করবেন না। যাঁরা জেলে আছেন তাঁদের কাছে আমাদের নববর্ষের অভিনন্দন জানাবেন। তাঁদের বলবেন তাঁদের ত্যাগ বৃথা যাবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। জয় হিন্দ্‌!

৫। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রস্তুত

(১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী, সিঙ্গাপুর থেকে বক্তৃতা)

আজ সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী। এই নতুন বছরেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করব। অতীতে আমাদের কাজ সম্বন্ধে আমি যতই ভাবছি ততই স্বাধীনতাও নিশ্চিত বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপান তার ক্ষমতা সংহত করছে। দু'টি

সদ্যোমুক্ত এসিয়ার জাতি বর্মা ও ফিলিপাইন অতি অল্প সময়ে আশ্চর্য্য এগিয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিদের সংহতি টোকিও ঐ জাতিদের সম্মেলনের ফল।

বছরের শেষে পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী একটি সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাদের পেছনে আছে অজেয় আজাদ হিন্দ ফৌজ আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিত হয়ে। এই ফৌজ ভারতে বিপ্লবাগ্নি জালিয়ে দেবে, যে আগুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের অধিকারী—তা জাপান ও জার্মাণ সহ পৃথিবীর নয়টি জাতি স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারা আমাদের সেনাবাহিনীকে সব রকমে সাহায্য করতে রাজী আছে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জয়লাভ করবার সময় এখন হয়েছে। স্বদেশে ভারতবাসীরা হৃদয়হীন ব্রিটিশের অধীনে থেকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। ব্রিটিশ যে আমেরিকা, চীন ও আফ্রিকা থেকে ভাড়া করা সৈন্য আমদানী করে ভারতবর্ষকে চিরদিন পরাধীন করে রাখতে চায় সেটাও এখন বেশ পরিষ্কার। ওয়েভেলের বক্তৃতার পেছনে যে অসাধু মনোবৃত্তি আছে তাও তারা জেনেছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের আমাদের ফৌজের ওপরে পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এই সেনাদল শীঘ্রই ভারতবর্ষে উপনীত হবে।

৬। ভারতের জাতীয় মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

(কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর পরে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সালে নেতাজীর বিবৃতি)

শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী পরলোকে। তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে ব্রিটিশের অধীনে পুণায় প্রাণত্যাগ করেছেন। দেশের আটত্রিশ কোটি

লোকের সঙ্গে ও বিদেশে আমার সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কস্তুরবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। অত্যন্ত করুণ পারিপার্শ্বিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পরাধীন জাতির পক্ষে এর চাইতে গৌরবময় মৃত্যু আর নেই। ভারতবাসীদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়। গান্ধিজীর দ্বিতীয় সঙ্গী কস্তুরবার মৃত্যু হল তাঁর চোখের সামনেই। মাত্র দেড় বছরে—তাঁদের কারারুদ্ধ করবার পর থেকে। প্রথম হচ্ছে তাঁর চিরদিনের সহকর্ম্মী ও সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই। বর্ত্তমান কারাবাসকালে তাঁর এই দ্বিতীয়বার শোক সহ্য করতে হল।

যিনি ভারতবাসীর মাতৃস্বরূপা ছিলেন সেই মহীয়সী নারীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা প্রেরণ করছি এবং মহাত্মা গান্ধীকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। শ্রীমতী কস্তুরবার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকবার মিশবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আমি সামান্য দু' চারটে কথায় আমার শ্রদ্ধা জানাব। তিনি ছিলেন আদর্শ ভারতরমণী, দৃঢ়চেতা, ধৈর্য্যশীল, নীরব, এবং আত্মতৃপ্ত। কস্তুরবা ছিলেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মেয়ের প্রেরণামূল। তাদের সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে মিলিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের পর থেকে তিনি গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর মহান স্বামীর সব রকম দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। বহুবার জেলে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ৭৪ বৎসর বয়সেও তিনি জেলে যেতে বিচলিত হন নি। যখনই মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছেন তখনই তিনি তাঁর পাশে সে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতের মেয়েদের দৃষ্টান্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে ছেলেরা যেন পিছিয়ে না পড়ে তার প্রেরণা।

কস্তুরবার মৃত্যু শহীদের মৃত্যু। গত এক মাস ধরে তাঁর হৃদযন্ত্রের পীড়া হয়েছিল। সমস্ত জাতি মানবতার দোহাই দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তির আবেদন করেছিল। কিন্তু হৃদয়হীন ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্ট তাতে কর্ণপাত করে নি। ব্রিটিশ হয়ত ভেবেছিল যে মহাত্মা গান্ধীকে এইভাবে মানসিক কষ্ট দিয়ে তাঁর দেহ মন ভেঙ্গে দিতে পারবে এবং মহাত্মাজীকে অবনত করতে পারবে। যে সব পশু বলে যে তারা ন্যায়, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্ম লড়াই করছে এবং সেই সঙ্গে এরকম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করে তাদের প্রতি আমার অসীম ঘৃণাই মাত্র আছে। তারা মহাত্মাজীকে জানে না, তারা ভারতবাসীকে বোঝে না। মানসিক ও শারীরিক যত অত্যাচারই মহাত্মাজীর প্রতি অথবা ভারতবাসীর প্রতি হউক না কেন তিনি যে আদর্শ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তা থেকে এক পাও নড়বেন না। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করতে বলেছিলেন যাতে আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহ কষ্ট ভারতবর্ষকে সহ্য করতে না হয়। তার উত্তরে সাধারণ চোর ডাকাতের মত তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রী কারাগারে মৃত্যুও বরণ করতে রাজী, তবু পরাধীন দেশে মুক্ত থাকতে চান না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিল জেলে তাঁর স্বামীর চোখের সামনেই যেন কস্তুরবার হৃদরোগে মৃত্যু হয়। তাদের এই চাপা উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, একে হত্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কস্তুরবার এই মৃত্যু থেকে দেশে ও বিদেশে ভারতবাসীরা বুঝতে পেরেছে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের নেতাদের একজনের পর একজনকে হত্যা করতে চায়। যতদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ থাকবে ততদিন এই সব অত্যাচার আমাদের জাতির ওপরে চলবেই। কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার একটি মাত্র উপায় আছে তা হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যে সব ভারতবাসী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করতে উদ্যত তাদের ওপরে বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ছে। এ দায়িত্ব আমাদের এখানে সকলেই গ্রহণ করেছে। এই দুঃখের সময়ে আমরা আবার প্রতিজ্ঞা করছি যে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

৭। গান্ধিজীর উদ্দেশ্যে বিবৃতি

(৭ই জুলাই, ১৯৪৪ সালে গান্ধিজীর উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন থেকে নেতাজীর বক্তৃতা)

মহাত্মাজি, আপনি এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছেন। তাই ভারতের বাইরে যে সব দেশ-প্রেমিক ভারতবাসী আছেন তাদের পরিকল্পনা ও কার্য্যক্রম আপনাকে জানাচ্ছি। অসুখের জন্য ব্রিটিশ আপনাকে মুক্তি দেবার পর ভারতের বাইরে ভারতবাসীরা কয়েকটা দিন অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটিয়েছে, প্রথমে সেই কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিই। ব্রিটিশের কারাগারে শ্রীমতী কস্তুরবার দেহাবসানের পরে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে সেটা স্বাভাবিক। আটত্রিশ কোটি নরনারী আপনার নেতৃত্ব লাভের সুযোগ যাতে পায় তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনার প্রতি ও আপনার বিশ্বাসের প্রতি বিদেশের ভারতবাসীরা কি অভিমত পোষণ করে তা আপনাকে বলছি। এ সম্বন্ধে আপনাকে যা বলব তা নিছক সত্যি কথা।

ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে এমন বহু লোক আছেন যারা মনে করে যে একমাত্র ইতিসম্মত সংগ্রামেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তারা মনে করেন যে অহিংস সংগ্রামের নৈতিক চাপে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। তবু এই কর্ম্মপথের পার্থক্য সম্বন্ধে বিদেশের ভারতবাসীরা মনে করে যে এটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ১৯২৯ সালে লাহোরে আপনি স্বাধীনতা প্রস্তাব করবার পর থেকে প্রত্যেক কংগ্রেসের সভ্যের মাত্র একটিই উদ্দেশ্য রয়েছে। বিদেশের ভারতবাসীরা জানে যে ভারতের বর্ত্তমান চেতনা আপনারই সৃষ্টি। পৃথিবীর কাছে আপনার এই স্থান এবং আপনার প্রাপ্য সম্মান তারা জানিয়ে থাকে। পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিতে আপনার আদর্শ একই,

আমাদের সব কর্ম্মপ্রেরণার মূলে এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত যে সব দেশে আমি ১৯৪১ সালের পরে গেছি সেখানে ভারতবর্ষের গত এক শতাব্দীর মধ্যে যে নেতার আবির্ভাব হয়েছে, তার মধ্যে আপনাকেই সর্ব্বত্র সর্ব্বাধিক সম্মান দেখিয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নীতি আছে, রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ মত আছে। কিন্তু তাতে করে যে মানুষ তার দেশবাসীর এত চমৎকার সেবা করেছে, অসম সাহসে যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাদের আটকায় না। বিদেশের ভারতবাসী এবং স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল বিদেশীদের কাছে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব করবার পর আপনার প্রতি সম্মান আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতবর্ষে থাকবার সময় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্রিটিশের নীতি সম্বন্ধে বিদেশে যে সব গোপন তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি এবং পৃথিবীতে ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি যে কার্য্যক্রম দেখেছি তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী মেনে নেবে না। যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য ব্রিটেনের আজ একমাত্র কাজ হচ্ছে ভারতবর্ষকে পূর্ণভাবে শোষণ করা। এ যুদ্ধে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের একাংশ শত্রুর কাছে পাঠিয়েছে, অপরাংশ বন্ধু নিয়ে নিয়েছে। যদি এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভও হয়, তবু আমেরিকাই মাতব্বর হবে, ব্রিটেন নয়, আর তার অর্থ এই যে ব্রিটেন আমেরিকার রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে। এই অবস্থায় ব্রিটেন তার সব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভারতবর্ষকে আরও কঠোরভাবে শোষণ করতে চাইবে নিশ্চয়ই।

এই উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য লণ্ডনে পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেছে। এই পরিকল্পনা নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্র থেকে আমি জেনেছি বলে, তা আপনাকে জানানো প্রয়োজন

মনে করছি। ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রভেদ করা আমাদের খুব ভুল হবে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এমন আদর্শবাদী কেউ কেউ আছেন সত্য, যারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চান। এই আদর্শবাদীদের সে দেশে পাগল মনে করে, তারা সংখ্যাতে নিতান্ত কম বলে তাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেশে নেই। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ জাতি একই।

আমেরিকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে তারাই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা, এবং তাদের বুদ্ধিমান প্রচারকেরা প্রকাশ্যেই আমেরিকাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করে—অর্থাৎ এই শতাব্দীতে আমেরিকাই জগতে নেতৃত্ব করবে। এই ষড়যন্ত্রে অনেকে ব্রিটেনকে আমেরিকার ৪৯ সংখ্যক রাষ্ট্র বলে মনে করে। আপনি যে উপায় নির্দ্দিষ্ট করেছেন, আজীবন যে উপায় অনুসরণ করে আসছেন, সেই উপায়ে যদি বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যেত তবে দেশে অথবা বিদেশে এমন কোন ভারতবাসী নাই যে খুসী হ'ত না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা মেনে নিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে আমাদের রক্তের নদীতে সাঁতার দিতে হবে। দেশের ভেতর থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরী হবার উপায় থাকলে সেটাই হ'ত সব চাইতে ভাল। মহাত্মাজী, দেশের অবস্থা আপনি আর সকলের চাইতে ভাল জানেন। নিজের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে বিশ বছর ধরে দেশসেবার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে বিদেশ থেকে সাহায্য না পেলে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়।

এ যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে বিদেশে অবস্থিত ভারতবাসী অথবা বিদেশীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে ব্রিটেনের শত্রুদের কাছ থেকে

রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাওয়া সহজ হয়েছে। তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করবার আগে তাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত বুঝবার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ প্রচারকেরা পৃথিবীর লোকের কাছে বলেছে যে চক্রশক্তি স্বাধীনতার শত্রু। কাজেই ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টারও শত্রু। দেশ ত্যাগ করবার জন্য মনস্থির করবার আগে আমাকে ভেবে ঠিক করতে হয়েছে বিদেশ থেকে সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে কি না।

আগে আমি পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছি, পড়ে অনুসন্ধান করেছি কি উপায়ে অন্যান্য দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু আমি একটি দেশের ইতিহাস দেখিনি যে কোন পরাধীন জাতি বিদেশীর কোন রকম সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪০ সালে আমি আবার ইতিহাস মন দিয়ে পড়েছি। পড়ে সিদ্ধান্ত করেছি যে কোন দেশই বাহিরের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করে নি। নীতির দিক থেকে বাহিরের সাহায্য নেওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমি প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগত আলোচনায়ও সব সময়েই বলেছি যে ঋণ হিসাবে এই সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। পরে এই ঋণ পরিশোধ করতে কোন বাধা নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত শক্তিশালী জাতি যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেড়িয়ে থাকতে পারে আমাদের মত নিরস্ত্র পরাধীন জাতির বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে বাধা কি?

এই বন্ধুর পথে অগ্রসর হবার আগে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সব বিচার করে দেখেছি। নিজের শক্তি অনুযায়ী দেশবাসীকে দীর্ঘদিন সেবা করবার পরে দেশবাসী আমাকে দেশদ্রোহী বলুক এ আমি চাই নি। দুস্তর পথে অগ্রসর হয়ে অভিযান সুরু করে যে আমি শুধু আমার জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করেছি তা নয়, আমার দলের ভবিষ্যৎ সঙ্কটময় করে তুলছি। যদি আমার

একটুও আশা থাকত যে বিদেশের সাহায্য ছাড়া দেশ স্বাধীন হতে পারে তা হলে এই সঙ্কটসময়ে আমি দেশ ছেড়ে আসতাম না। আমার যদি আশা থাকত যে আমাদের জীবনে এ রকম স্বর্ণ সুযোগ আবার আসবে তবে আমি দেশ ছেড়ে আসতাম কি না সন্দেহ আছে।

৮। স্বাধীন ভারতভূমির প্রথম অংশ

(রেঙ্গুন থেকে ৯ই জুলাই, ১৯৪৪ সালের বক্তৃতা)

এর আগে আমি শোনান থেকে আপনাদের কাছে কথা বলেছি। আজ আমি আপনাদের আরও অনেক কাছে এসেছি, আজ রেঙ্গুন থেকে বলছি। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্র শোনান থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্মায় এসে বর্মী গভর্ণমেণ্টের আতিথেয়তা ও জাপান সরকারে সাহায্যের জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। এই সাহায্য ছাড়া আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে না। স্বাধীন বর্মীদের নেতা ডক্টর বা ম ভারতের বাইরে ভারতীয়দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু তা ঘোষণা করতে আমার দ্বিধা নাই। তাঁর গভর্ণমেণ্ট ও স্বজাতিরা যে আতিথেয়তা এবং আন্তরিক সাহায্য আমাদের করেছেন, ভারতের আগামী স্বাধীনতা যুদ্ধে তা অমূল্য। পূর্ব্ব-এশিয়ায় এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে আমরা জাপানের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়ে আসছি তার জন্য আমি বলছি যে যতদিন না আমাদের উভয়ের শত্রু পরাজিত হয়, ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত না হয়, ততদিন জাপানের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই করব।

বন্ধুগণ, এখন একটি আনন্দদায়ক খবর আপনাদের দেব। বর্মাতে আসবার পরে আমি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে গিয়েছিলাম। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিসমূহের

সম্মেলনে গত ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জেনারেল হিদেকি তোজো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দেবার কথা ঘোষণা করেন। তার পর থেকে জাপানী সরকারের সঙ্গে আমি টোকিও এবং শোঁনানে আলোচনা করেছি। তার ফলে জাপানী নৌবাহিনী আমার ঐ দ্বীপগুলোতে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও আমার ব্যক্তিগত লোকদের নিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এই ভ্রমণ শেষ করে আমি ফিরে এসেছি। আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কি উপায়ে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের হাতে এ দ্বীপগুলো দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে জাপানী সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা। এই আলোচনার ফলে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন বড় অফিসার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এ, জি, লোকনাথনকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেছি। এই ভ্রমণকালে আমার ও আমার দলের লোকের স্বাধীন ভারতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অনুভব করেছি। রস দ্বীপে ব্রিটিশ চীফ কমিশনারের ভবনে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়তে যে দেখেছি তা কখনও ভুলবার নয়। সেখানে আমরা ব্রিটিশ চীফ কমিশনারের ভবনেই ছিলাম, আর সব সময়ে আমরা ভেবেছি আমাদের বিজয় রথচক্র কেমন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চীফ কমিশনারের গৃহে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন দেখে আমরা ভেবেছি কবে নতুন দিল্লীতে বড়লাট ভবনে আমরা এই পতাকা ওঠাতে পারব।

বন্ধুগণ, আপনাদের হয়ত স্মরণ আছে যে গত আগষ্ট মাস থেকে আমি বলেছি যে ১৯৪৩ সালের মধ্যেই আমরা স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করব। আমাদের এই স্বপ্ন যে ১৯৪৩-এর ৩১শে ডিসেম্বরের আগেই সফল হয়েছে, তাতে আমরা খুবই খুশী। আন্দামানে থাকবার সময় আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে কুখ্যাত ডিগ্রী জেল পরিদর্শন করেছি, আমাদের যে সব দেশ প্রেমিকেরা এখানে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন,

ব্রিটিশের অত্যাচারের ফলে যারা এখানে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি। জেলের অধ্যক্ষ আমাদের বললেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের শেষ দল জাপানীরা এদেশ দখল করবার আগে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে দু'শো কোর্ট মার্শাল বিষয়ে বন্দীও ছিলেন। এই দ্বীপে থাকবার সময় সেখানকার অবস্থা আমি অনুসন্ধান করেছি এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে পরিচয় করেছি। ব্রিটিশ যে এই দ্বীপগুলো ছেড়ে চলে গেছে তাতে তারা সবাই খুশী। নভেম্বর মাসে জাপান সরকার এই দ্বীপ-গুলো যে স্বাধীন ঘোষণা করেছেন তা শুনে তাদের খুশী আর ধরে না। সকলের মধ্যেই একটা চেতনা লক্ষ্য করা গেল, ভবিষ্যতে তারা ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক নাগরিক হবার চেষ্টা করবে।

সেখানে একটি সাধারণ সভায় আমি তাদের বলেছি যে তারা অনেকদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে বলেই ভগবান আজ তাদের স্বাধীনতা ও সুখের দিন এনে দিয়েছেন। তাদের অতীত করুণ ইতিহাস ভুলে স্বাধীন ভারতের নাগরিক হবার জন্য তাদের তৈরী হতে হবে এবং তাদের নিজেদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলবার জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রম করতে হবে। দ্বীপগুলোর স্বাভাবিক সম্পদ যা আছে আমি দেখেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বাধীন ভারতের অংশ হিসাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ স্বাধীন, সুসভ্য এবং প্রগতিশীল নরনারীর আবাসের যোগ্য স্থান হবে। আমার দৃঢ় ধারণা যে এই দ্বীপগুলো পুনরায় জয় করবার চেষ্টা করলে সে দেশের লোকদের কাছ থেকে প্রবল বাধা উপস্থিত হবে —কারণ স্বাধীনতা তারা একবার উপভোগ করেছে আর দাসত্ব কখনই চাইবে না।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে স্থলবাহিনী আছে, কিন্তু নৌবাহিনী নেই বলে আগামী কিছুদিন পর্য্যন্ত জাপান সরকারের নৌবাহিনীর

সাহায্যেই এই দ্বীপগুলো রক্ষা করতে ও শাসন চালাতে হবে, জাপান সরকারের নৌবাহিনী যে এই সাহায্য করতে প্রস্তুত তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বন্ধুগণ, এখন আমি আপনাদের কাছে এসে পড়েছি বলে এখন প্রায়ই আপনারা আমার কথা শুনতে পাবেন। আজকে আমার কথা শেষ করবার আগে বর্মা থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বর্মার আবহাওয়া খুবই সুন্দর। শত্রুদের নানা রকম প্রচার ও মাঝে মাঝে বিমান হানা সত্ত্বেও সর্ব্বত্রই আশা ও উত্তেজনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সদ্যোমুক্ত বর্মারা তাদের এই কষ্ট অর্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর। বর্মা ও ভারতীয়দের মধ্যে আজ একটা গভীর সখ্য স্থাপিত হয়েছে —যেন রক্তের ভেতর দিয়ে এক সন্ধি হয়ে গেছে। বর্মীরা তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য এবং আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার জন্য আমাদের একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। আজ ভারতবর্ষের প্রয়োজন বর্মাকে, বর্মার প্রয়োজন ভারতবর্ষকে। একতায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, জাপানের সাহায্য নিয়ে আমরা একতায় জয়লাভ করব।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজাদ বর্মা জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

৯। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার

(বর্মা থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ সালের বক্তৃতা)

বন্ধুগণ, ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের কাছে বলব। আপনারা সকলে জানেন যে গান্ধিজী ও মিঃ জিন্না বোম্বাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। লীগের পাকিস্থান

দাবী মেনে নিয়েও গান্ধিজী লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে প্রস্তুত। আমি জানি যে ভারতের বাহিরে আমরা যে সব ভারতীয়েরা আছি তারা গান্ধিজীর এই লীগকে তুষ্ট করবার চেষ্টা কি চোখে দেখে তা জানবার জন্য উদগ্রীব। এটা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে গান্ধিজী ও কংগ্রেস লীগের সঙ্গে রফা করে ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। এটা প্রতিরোধ করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। পূর্ব্ব ভারতে আমরা যে সব ভারতবাসী রয়েছি তারা স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য সংগ্রাম করছি। দেশমাতার মুক্তির জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সফল হব। সংগ্রাম যতই দীর্ঘ ও কঠোর হোক না কেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্য ও ন্যায়ের জয় হবে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। কাজেই ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমরা রাজী নই। ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা আমাদের এত খারাপ মনে হয় যে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে তা করে' আমাদের দাসত্বই দৃঢ়তর হবে। বন্ধুগণ, আমরা সংযুক্ত স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চাই, কাজেই ভারতকে বিভক্ত করে টুকরো টুকরো করবার সব চেষ্টাই আমাদের বাধা দিতে হবে। আয়ারলণ্ড ও প্যালেস্টাইন থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। আমরা জানি দেশকে বিভক্ত করলে আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের সর্ব্বনাশ হত। আমেরিকা আজ এত বড় হতে পারত না, যদি আমেরিকার বিভাগপন্থীরা জয়লাভ করত। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হলে আমরা অনায়াসেই আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করতে পারব। সোভিয়েট য়্যুনিয়ন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সোভিয়েট য়্যুনিয়নে ভারতবর্ষের চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক জাতি আছে, কিন্তু তবু তারা ঐক্যবদ্ধ কেন? কারণ তারা স্বাধীন, বিদেশীর কাছে নতি স্বীকার করে না।

ব্যক্তিগতভাবে মিঃ জিন্নার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে। আমার এবং আমার দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং অতীতে লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। লীগ অথবা তার মহান নেতার বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছুই নাই। কিন্তু দেশমাতাকে বিভক্ত করবার জন্য যে পাকিস্তান পরিকল্পনা আমি তার ঘোর বিরোধী।

এই যুদ্ধের প্রথম তিন বছর ইঙ্গ-আমেরিকানরা একের পর একটা যুদ্ধে হেরে গেছে। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করবার কথা তারা কখনও ভাবে নি। ভাগ্য পরিবর্তিত হবে এই আশা নিয়ে তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে—এ আশা করা তাদের সঙ্গতই হয়েছে। তারা অনেক যুদ্ধে আবার জিতেছে—কিন্তু তার ফলে তারা তাদের যুদ্ধোদ্যমে ঢিলে দেবে না—কিম্বা আমাদের মিত্ররাও পরাজয় স্বীকার করবে না। আমার মনে হয় দেশে এমন লোক আছেন যাঁদের মনে এমনি একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ইঙ্গ-আমেরিকার প্রচার সচিবেরা যে প্রচার আরম্ভ করেছে তাতে তাঁরা ভুলে গেছেন বলে মনে হয়। তবু আমি আশা করি যে আমার দেশের জনসাধারণ এই প্রচারে ভুলবেন না। তবু যখন দেখি যে কোন কোন কংগ্রেসী এই ভুল করে বসেছেন তখন আমার দুঃখ হয়। তাঁরা মনে করেন যে মিত্রপক্ষ জয়ের পথে, তাই তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফা করতে চান।

একটু যদি ধীরভাবে আমরা বিচার করি তা হলে দেখতে পাব যে শেষ বিজয় চক্রশক্তিরই হবে। এই যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত হবে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে নয়। গত মাস আক্রমণ করে আমরা শত্রুর শক্তি বুঝতে পেরেছি। এই ছ-মাসে প্রবল বাধা সত্ত্বেও অনেক রণক্ষেত্রে তারা পরাজিত হয়েছে, এবং আমাদের বিজয়ী সৈন্য কালাদন, হাকা, টিড্ডিম, বিশেনপুর, কোহিমা থেকে তাদের হঠিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধে এখন একটা সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে সত্য —তার কারণ বর্ষার জন্য আমাদের আত্মরক্ষার দিকে মনোযোগী

হতে হয়েছে। বহুবার আমরা শত্রুদের পরাজিত করেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আবার তা করতে পারব। দেশমাতা মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম করব বলে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা জানি যে ভবিষ্যতে আমাদের দীর্ঘদিন কঠোর সংগ্রাম করতে হবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে হয়ত দু' বছরও লাগতে পারে। পাঁচ বছর কঠোর সংগ্রাম করবার পরই যে ইঙ্গ-আমেরিকানরা কয়েকটা যুদ্ধে জিতেছে তা ভুললে চলবে না। কিছুদিনের মধ্যে সাফল্য লাভ করতে না পারলে আমাদের হতাশ হলে চলবে না। ব্রিটিশরা এখন জিতছে বলে তাদের সঙ্গে যদি আমরা রফা করে ফেলি তবে দেশ স্বাধীন করা অসম্ভব হবে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেলে ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যাবে। তা যদি হয় তবে ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য পরাধীন থেকে যাবে। যতদিন কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে প্রভেদ আছে ততদিন ব্রিটিশের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া হবে না। তাই যে সব কংগ্রেসকর্ম্মীরা ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় তারা পাকিস্থানের তিক্ত বড়ি হজম করে ফেলেছে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতাদের আমি বলছি যে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হলেও ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে তারা আগেই সংখ্যা লঘু ও দেশীয় নৃপতিদের স্বার্থরক্ষার কথা বলেছে। যাঁরা মনে করেন যে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য হয়ে গেলেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে তাঁরা আত্ম-প্রবঞ্চনা করছেন। অবস্থা যখন এই, তখন লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা করবার কোন কারণ আমি দেখতে পাইনে। পাকিস্থান মেনে নিলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। লীগ কখনও ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের মত যুদ্ধ করবে না। মুসলিম লীগ শুধু চায় হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রে ভারতকে বিভক্ত করতে। চারটি মুসলিম রাষ্ট্র এতে হবে যেখানে ব্রিটিশের প্রভাব

কেন ? কায়েম থাকবে, কাজেই একটি দাস ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তে চারটি

দাস মুসলিম রাষ্ট্র ব্রিটেনকে সাহায্য করবে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য যদি ব্রিটিশের স্বার্থবিরোধী হয় তবে তারা এই ঐক্য উপেক্ষা করবে। তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে দেবে না। আমি লক্ষ লক্ষ মুসলমান যুবককে প্রশ্ন করছি "তোমরা কি দেশমাতাকে বিভক্ত করতে সাহায্য করবে?" বিভক্ত ভারতে তোমাদের কি অবস্থা হবে?" অতএব বন্ধুগণ, আপনারা যদি স্বাধীনতা চান তবে তার জন্য সংগ্রাম করে ব্রিটিশকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিন। ব্রিটেনের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া সম্ভব নয়। আমাদের গরীয়সী মাতৃভূমিকে বিভক্ত করা চলবে না।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

১০। জার্মাণীর পরাজয়

(অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সিঙ্গাপুর থেকে ঘোষিত
২৫শে মে, ১৯৪৫, সালে নেতাজীর বিবৃতি)

য়্যুরোপে যুদ্ধের অবস্থা এপ্রিল মাসের শেষ থেকে মে মাসের প্রথমে নাটকীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। এই বছরের আরম্ভে প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণকারীর কাছেই মনে হয়েছিল যে অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত জার্মাণী আর বাধা দিতে দিতে পারবে না বটে তবে কিভাবে এবং কেমন করে তাদের পরাজয় ঘটবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলবার উপায় ছিল না।

হের হিটলারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জার্মাণ সৈন্যেরা যে সাহস, ধৈর্য্য ও একাগ্রতা নিয়ে যুদ্ধ করেছে তা পৃথিবীর প্রত্যেকেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। আমার মতে জার্মাণীর পরাজয় সামরিক নয়, রাজনৈতিক। সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধের নীতিই জার্মাণ জাতির এই পরাজয়ের কারণ। বিসমার্ক জার্মাণদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন 'দু'টি রণক্ষেত্রে একত্রে কখনও যুদ্ধ করো না' এটা অমান্য করা জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের মস্ত ভুল হয়েছিল। মঃ মলোটভ ১৯৪০ সালে

যখন বার্লিনে এসেছিলেন তখন থেকেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। সেই সময় জার্মাণ রাষ্ট্রনেতাদের যে কোন উপায়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করা উচিত ছিল। বিসমার্ক বেঁচে থাকলে তিনি তাই করতেন। গত যুদ্ধে রাষ্ট্রনেতাদের ভুলে যেমন পরাজয় হয়েছিল তেমনি এবারেও হ'ল। জার্মাণ জাতির এটা খুবই দুর্ভাগ্য।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মাণীর এখন কি হবে তাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। য়্যুরোপেরই বা কি হবে? এই দু'টো বিষয়ে আমার মতামত পরিষ্কার। আমি আগেও যা বলছি এখনও তাই বলছি। জার্মাণীর পরাজয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও ইঙ্গ-আমেরিকার মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধ দেখা দেবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জানে যে জার্মাণীর পরাজয় সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট য়্যুনিয়নের লোকের বীরত্ব একাগ্রতা ও ত্যাগের ফলে। কাজেই আপনার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার ব্যাপারে ইঙ্গ-আমেরিকার কাছে কিছুই ছাড়বে না। এটা সানফ্রানসিসকো সম্মেলনেই বুঝতে পারা গেছে; মঃ মলোটভ এ সম্মেলন ছেড়ে আসবার পর তা ভেঙ্গে গেছে।

য়্যুরোপের ব্যাপারে কি হবে তার সূত্রপাত হয়েছে সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে। য়্যুরোপ এখন এক সন্ধিস্থলে এসে উপনীত। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই য়্যুরোপের অবস্থা অশান্ত ছিল—বড় বড় শক্তিরা এমনি এক দিকে টানতে চেষ্টা করছিল। য়্যুরোপ পুনর্গঠন করবার জন্য জার্মাণীর একটি পরিকল্পনা ছিল, গত পাঁচ বছর ধরে সেই পরিকল্পনাই কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেছে। জার্মাণী পরাজিত হওয়াতে এই পরিকল্পনাও নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ারই একটা পরিকল্পনা আছে যা কাজে লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। ব্রিটেনের পরিকল্পনা,—অবশ্য যদি একে পরিকল্পনা বলা যায়—হচ্ছে ফ্রান্স এবং সম্ভব হলে আমেরিকার সাহায্যে শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠা করা,—সেটাই হচ্ছে তার স্বার্থ। আমেরিকা

যদিও আমেরিকাব্দ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অভিলাষী, তবু আটলাণ্টিকের ওপার থেকে য়্যুরোপের ব্যাপার পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ব্রিটেন ও আমেরিকা হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশ, য়্যুরোপ পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাদের পরিকল্পনা য়্যুরোপের জাতিরা মেনে নেবে না।

কাজেই, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে পরিকল্পনা প্রয়োগ করে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেছে নিজেদের ক্ষেত্রে য়্যুরোপের জাতিদের তা পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায় নাই। অবশ্য ব্রিটেন ও আমেরিকা, বিশেষ করে ব্রিটেন এই পরীক্ষা ব্যর্থ করবার জন্য সব রকমে চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। গত পাঁচ বছরে এবং নাৎসীদের পতনের পরে য়্যুরোপের সর্ব্বত্র চিন্তাধারা বামপন্থী হয়ে পড়েছে। বামপন্থী না হলে কোনও পরিকল্পনা সাফল্য লাভও করতে পারে না। জার্ম্মাণীতে বারো বছর নাৎসী শাসনের ফলে পুরণো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে। জার্ম্মাণীতে সোভিয়েট য়্যুনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা ছাড়া গতি নাই। এই দিকে কি ভাবে কাজ এগুবে সেটা নির্ভর করে জার্ম্মাণদের সঙ্গে মিত্রশক্তি কেমন ব্যবহার করবে তারই ওপরে।

জার্ম্মাণীকে অপমানিত করে জাতিগত প্রতিশোধ নেবার জন্য বাধ্য না করলে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই তারা ন্যাশন্যাল সোসালিজম থেকে আরও প্রগতিপন্থী সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে। কিন্তু জার্ম্মাণদের অপমান করলে তাদের সমাজতন্ত্র প্রীতি লোপ পাবে। ফলে গোঁড়া জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হতে পারে যার ফলে আর একটি য়্যুরোপীয় অথবা বিশ্বযুদ্ধ বাধা আশ্চর্য্য নয়।

একজন লোকের হাতে যদি য়্যুরোপের জাতিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা থেকে থাকে তবে তা মার্শাল স্ট্যালিনেরই আছে। আগামী কিছুদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট য়্যুনিয়ন কি করে তা

দেখবার জন্য সমগ্র য়ুরোপ বিশেষ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা যে সহানুভূতি দেখিয়েছিল, যে ভাবে সাহায্য করেছিল, তার জন্য জার্মাণীর এই দুঃখের দিনে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১১। বর্মার অবস্থা

(আজাদ হিন্দ ফৌজের কেন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে ২৬শে মে, ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

বর্মার অনেক জায়গায় এখনও যুদ্ধ হচ্ছে, এ যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজরাও যুদ্ধ করছে। তাই এখন আমার পক্ষে বর্মার অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটুও ইতস্ততঃ না করে আমি একটি মন্তব্য করতে পারি—বর্মাতে মিত্রপক্ষের যে জয় আজ পর্য্যন্ত হয়েছে তা ভারতীয় সৈন্যের জন্য হয়েছে, মিত্রপক্ষের অন্য কারও বাহিনীর জন্য নয়।

গত বছর আমরা যখন ভারতবর্ষে যুদ্ধ করছিলাম তখন ভারতীয় সৈন্যেরাই ইম্ফল, কলকাতা ও দিল্লীর পথ অবরোধ করেছিল। এ বছরেও আজ পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষের যতটুকু জয় হয়েছে তার সবটাই ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ করবার ফলে। আমরা যখন আমাদের দেশের মুক্তির জন্য, ও সেই সঙ্গে বর্মার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিলাম তখন আমাদের দেশবাসীদের কাছ থেকেই বাধা পাওয়াটা অত্যন্ত করুণ অভিজ্ঞতা। এই সব ভারতীয় ব্রিটিশের অধীনে সৈন্য, নিজেদের দেশে তারা দাস হয়ে আছে।

এই দুঃখের মধ্যে একটা সামান্য সান্ত্বনা আছে। আজ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় সৈন্যদের বলেছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট দেশপ্রেমিক বিপ্লবী হিসাবে সংগ্রাম করছে না,

সংগ্রাম করছে বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে। আমাদের শত্রুরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে নাম দিয়েছে জাপানী হিন্দ ফৌজ, জে, আই, এফ। ভারতীয় সৈন্য ও অন্যান্য ভারতীয়েরা আজ যারা ব্রিটিশের সঙ্গে বর্মায় এসেছে তারা নিজ চোখে দেখে যাবে যে বিপুল বিরূপ অবস্থাতেও স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কি রকম নিঃস্বার্থ ভাবে ভারতের মুক্তিবাহিনী দিয়ে কী অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে।

ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যদের ওপর এবং ভারতবাসীদের ওপর এই অভিজ্ঞতার ফল যতই দিন যাবে ততই বুঝতে পারা যাবে। শত্রুদের প্রচারে এর মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া গেছে। আজকাল শত্রুদের রেডিও থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আর ক্রীড়নক বলা হয় না, বলা হচ্ছে জাপানীদের সাহায্যে গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। গত পনের মাস ধরে আমরা অনেক হেরেছি, আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে, তবে আমাদের বিজয় সম্বন্ধে বিশ্বাস এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। গত য়্যুরোপীয় যুদ্ধের সেনানায়ক মার্শাল ফস একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উক্তি করেন—একটি বাহিনী নিজেদের পরাজিত বলে মনে না করলে তাদের কখনও সত্যিকার পরাজয় হয় না। আমি বলতে গৌরব অনুভব করি যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের কোন সভ্য মনে করে না যে তারা পরাজিত হয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্য ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত, কাজেই আমরা মনে করি আমরা অজেয়। আধুনিক সমর বিজ্ঞানের স্রষ্টা জেনারল ক্লোজেভিৎস বলেছেন—'যুদ্ধে বিস্মিত হবার ঘটনা প্রায়ই ঘটে।' জার্মাণীর পরাজয় তেমনি একটি ঘটনা। কিন্তু আরও অনেক ঘটনা পৃথিবীর লোকে দেখতে পাবে। এই ঘটনার কতকগুলো আমাদের শত্রুদের পছন্দ হবে না।

নিজেদের শাসনের অধীনে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইঙ্গ-আমেরিকানদের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হবে সেখানেই যুদ্ধ করবে। 'দিল্লী চলো' ধ্বনি আমাদের উচ্চারিত হবেই। দিল্লী যাবার পথ রোমে যাবার পথের মতই অসংখ্য। বর্ত্তমানে জাগরিত পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে—এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তার পূর্ণ সুবিধা আমরা গ্রহণ করব।

দেশে ও বিদেশে আমাদের দেশবাসীদের আমি অনুরোধ করি যে আমরা যেমন বিজয়ে বিশ্বাসী তাঁরাও যেন তেমনি বিশ্বাস রাখেন। আমাদের শত্রুরা যদি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্য্যন্ত ক্রমাগত হেরেও যুদ্ধ বাধিয়ে রাখতে পারে তবে আমাদের শত্রুর মত আমাদেরই বা বিজয়ে বিশ্বাস থাকবে না কেন—বিশেষ করে আমরা যখন যুদ্ধ করছি ন্যায়ের জন্য, দেশের জন্য।

১২। প্রথম ওয়েভেল-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা

(আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ১৮ই জুন, ১৯৪৫ সালে সাইগনের বক্তৃতা)

ভাই ও বোনেরা, গত ১৪ই জুন নিউ দিল্লী থেকে বড়লাট লর্ড ওয়েভেল যে বক্তৃতা করেছেন তা আমি অতি মনোযোগ দিয়েই শুনেছি। এই বক্তৃতায় ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। বড়লাটের বক্তৃতার ধরণ ও সুর থেকে মনে হয় যে ভারতীয়েরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এ সম্বন্ধে তাঁর এতটুকুও আশা নেই। আমার মনে হয় যে ভারতের জনসাধারণ এ সম্বন্ধে এখন আলোচনা আরম্ভ করেছে।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় যে সব ভারতীয় আছে তারা এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কি ভাবে তা বলে রাখা অসময়োচিত অথবা অবান্তর হবে না।

প্রথমত, বড়লাট বলেছেন যে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের সমস্ত শক্তি সংহত করা। ব্রিটিশ জাতি রণক্লান্ত। য়্যুরোপের যুদ্ধ শেষ হবার পরে তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই তারা চায় অন্যে তাদের হয়ে যুদ্ধ করুক। যদিও জয়ের ফল তারাই উপভোগ করবে। ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যরাও ক্লান্ত। বর্মায় সাম্প্রতিক সাফল্যের পরে তারাও বিশ্রাম চায়। তাই ব্রিটিশের এখন প্রয়োজন যে ভারতবাসীরা তাদের অর্থ দিয়ে রক্তপাত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করবে। যখন ভারতবর্ষের ভেতরে এবং সীমান্তে যুদ্ধ হচ্ছিল তখন ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের বুঝিয়েছে দেশ রক্ষার জন্য তাদের যুদ্ধ করতে হবে। তারা এও বুঝিয়েছিল যে, বর্মা-অভিযান ভারতরক্ষা অভিযানেরই পর্য্যায় মাত্র।

কিন্তু এখন ব্রিটিশ চায় ভারতীয়েরা অর্থ ও লোক দিয়ে বর্মার বাহিরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ করুক। কাজেই ভারতীয়দের সমর্থন লাভের জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা করতেই হবে। তাই তারা একটা নতুন ব্যবস্থা স্থির করেছে, যেটা কার্য্যত স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের ব্যবস্থারই নতুন সংস্করণ।

এর উত্তরে আমরা কি বলব তা ঠিক করতে হলে আমাদের স্থির করতে হবে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের কি লাভ হবে। ভারতবর্ষকে শোষণ করে ব্রিটেনের যুদ্ধ চালানো এ কথা আর ভারতীয়দের স্বেচ্ছায় ব্রিটেনের হয়ে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখন ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে যোগ দিলে আমরা এতদিন যে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছি নীতির দিক থেকে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কংগ্রেসের পক্ষে এবং ভারতবাসীদের পক্ষে তা আত্মহত্যা করবারই সামিল হবে।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ প্রচারকেরা হয়ত ভাঁওতা দিতে সক্ষম হয়েছিল যে ভারতের জাপানীদের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা

করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই প্রস্তাব ১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের প্রস্তাবেরই সারাংশ। এবারে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও অর্থ সচিবের তিনটি গদিও আমাদের দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পদে ও অন্যান্য পদেও বড়লাটই নিয়োগ করবেন, তারা জনসাধারণের প্রতিনিধির কাছে দায়ী থাকবে না, থাকবে বড়লাটের কাছে। সব চাইতে প্রধান পদ ব্রিটিশ জঙ্গীলাটের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বর্ত্তমান প্রস্তাব স্যার স্ট্যাফর্ড ক্রীপসের প্রস্তাব দিব্য পরিবর্ত্তিত হয়ে যদিও দেখা দিয়েছে এর মধ্যে কয়েকটা অত্যন্ত হীন ব্যবস্থা আছে যার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। বড়লাট কংগ্রেসকে ভারতের অন্যান্য দলের মতই একটি মনে করেন, ব্রিটিশের মনোভাবও তাই। ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি এই মনোভাবের অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। চিরকাল কংগ্রেস দাবী করে এসেছে যে কংগ্রেসই ভারতীয় সকলের প্রতিনিধি। আজ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে এই দাবী অস্বীকার করতে হবে। ব্রিটিশ চিরদিন বলেছে কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দলমাত্র, প্রস্তাব গ্রহণে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হবে। আমি ত ভাবতেই পারি না যে জাতীয়তাবাদী ভারত এই প্রস্তাব কেমন করে গ্রহণ করতে পারে।

আর একটি দুরভিসন্ধি প্রণোদিত ব্যবস্থা আছে। লর্ড ওয়েভেল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ১৯৪২ এর আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের আটক রাখবেন বলেছেন। অবশ্য তাঁর বক্তৃতায় এটা কোথায়ও উল্লেখ নাই যে যদি তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলে ১৯৩৯ এবং ১৯৪২ যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের রীতি এই যে শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তনের সময় দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের ব্যাপারে এই রীতি বিসর্জ্জিত।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের বলেছে যে যুদ্ধের সময় কোন শাসনতান্ত্রিক

পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যেই আমরা দেখছি যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ'ল। পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। যুদ্ধের মধ্যেই কয়েকটা স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আপনারা দেখছেন যে ব্রিটিশের যুক্তি ফাঁকা, এটা শুধু ভারতের দাবী বাদ দেবার জন্য। যদি ব্রিটেন সত্যিই দায়িত্বশীল গর্ভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা হলে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ব-শাসন-অধিকারী ঘোষণা করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া উচিত।

ভাই-বোনেরা, আপনারা দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কারণে অত্যাচার, এবং অর্থনৈতিক শোষণ সহ্য করেছেন। আরও কিছুদিন এ কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সব রকম ঐহিক ও নৈতিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। স্বাধীনতার পতাকা আমরা উড্ডীন রাখবই। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, স্বাধীনতার ব্যাপারে সন্ধি না করে আমরা পৃথিবীর জনমতের সম্মুখে আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলে ধরতে পারব। এই উপায়েই স্বাধীনতা আসবে। অন্যদিকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা আমাদের হীন প্রতিপন্ন করব এবং পৃথিবীর কাছে নৈতিক সমর্থনও পাব না।

হয়ত আপনারা কেউ কেউ ভাবছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করবার সব চাইতে প্রকৃষ্ট উপায় কি। তার উত্তর আমার কাছে খুবই সোজা মনে হয়। ভারতবর্ষের বাহিরে আমাদের শেষ সৈন্য পর্য্যন্ত আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তা ছাড়া ভারতের এমন বহু মিত্র আছে যারা পৃথিবীর কাছে আমাদের উদ্দেশ্য সমর্থন করবে, আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনগুলোয় আমাদের কথা বলবে। আপনাদেরও বিপ্লব সৃষ্টি করবার জন্য তৈরী হতে হবে,

সময় হলে বিপ্লবের আগুন আপনারা জ্বালিয়ে দেবেন আর তা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়বে। এই বিপ্লবে ভারতীয় সৈন্যরা পর্য্যন্ত যোগ দেবে।

ভাই এবং বোনেরা, পরিশেষে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি আপনারা আশা ছেড়ে দেবেন না। আমি আবার বলছি আজ ভারতের ভেতরে ও বাইরে যে সব শক্তি কাজ করছে তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। ধৈর্য্য ও সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলে আমরা জয়লাভ করবই। আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বড়লাট প্রার্থনা করেছেন। তাঁকে আপনারা বলুন যে আপনাদের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা একমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যই রক্ষিত। আর কাউকে তা দেওয়া যায় না।

১৩। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বোঝাপড়া চলে না

(সিঙ্গাপুর থেকে ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

স্বদেশবাসী ভাই বোনেরা, কাল আমি মোটামুটি ভাবে ওয়েভেল প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, আমাদের তার প্রতি কি মনোভাব তাও ব্যক্ত করেছি। এই বিষয় নিয়েই আজও আবার আলোচনা করতে চাই। কিন্তু তার আগে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছে তার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করছি। এই বিবৃতি এখান থেকে গতকাল এবং আজ রেডিও মারফৎ ঘোষিত হয়েছে। এই বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ, ইহা পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের সুচিন্তিত অভিমত। এই বিবৃতির আরও একটি তাৎপর্য্য আছে। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীরা এখন কি করবে বিবৃতিতে তাও বলা হয়েছে। যদি কংগ্রেস ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করে, এবং তার ফলে

কংগ্রেস নেতাদের আয়োজনে ভারতীয় সৈন্য ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সংগ্রাম করতে সুদূর প্রাচ্যে আসে, তবে তা হলে আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংঘর্ষ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না, কারণ তখন কংগ্রেস হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মিত্র।

ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতের প্রত্যেক দিনকার ঘটনা প্রকাশ করছে। এই সব সংবাদ থেকে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারা যায়। দেশ থেকে যে সব সংবাদ পাচ্ছি তা থেকে মনে হয় দেশের অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ প্রস্তাবের অবান্তর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, কিন্তু যেগুলো মৌলিক ব্যাপার তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না। সেইজন্য প্রথমেই ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণের ফলাফল সম্বন্ধেই আগে আপনাদের কাছে বলব। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেস নেতাদের অন্তত পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পাঠাবার দায়িত্ব নিতে হবে। তারা বর্মায় যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ করবে বর্মার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরে। যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে আমি মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই ও অন্যান্য নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই তাঁরা ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান কি না এবং পাঁচ লক্ষ ভারতীয়ের জীবন বিসর্জ্জন দিতে রাজী আছেন কি না।

আমাদের দেশবাসীরা হয়ত ভেবে দেখেন নি যে এটাই হচ্ছে প্রস্তাবের বাইরের প্রকৃত কারণ। আমি আগে আপনাদের বলেছি আমি গোপনসূত্রে অবগত আছি যে আমেরিকা ব্রিটেনের কাছে বহু সংখ্যক সৈন্য অর্থ ও রসদ সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য দাবী করেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট টাকা ও রসদ দিতে রাজী, কিন্তু কোন কারণে লোক যোগান দিতে অক্ষম। সেই কারণ সম্বন্ধে

আমি পরে বলছি। তাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লর্ড ওয়েভেলকে ডেকে পাঁচ লাখ সৈন্য সংগ্রহ করতে বলেন যাতে আমেরিকার দাবী মিটানো যায়। লর্ড ওয়েভেল ভারতের অবস্থা জানেন, তাই তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় স্থল ও নৌ সৈন্য আফ্রিকা, য়ুরোপ এবং এশিয়ায় যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। লর্ড ওয়েভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদকে বলেছেন যে দেশে যদি যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব না হয় তবে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য পাঁচ লাখ সৈন্য পাওয়া যাবে না। তাই সুরু হল চিঠি লেখালেখি ওয়েভেল ও ব্রিটিশ মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে—কি ভাবে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে ভারতের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ভারতের সমর্থন এবং কংগ্রেসের সহায়তায় পাঁচ লাখ সৈন্য পূর্ব্ব-এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় প্রেরণ করা। যদি ভারতীয় সৈন্য সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে যোগ দেয় তবে চুংকিং-এর খুব সুবিধে। তাই চুংকিং সরকার এবং তাদের প্রচার বিভাগ লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবে খুব খুশী এবং কংগ্রেসকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলছে। হতে পারে যে ভারতবর্ষে এমন কেউ আছেন যিনি জানেন যে ভারতীয় সৈন্য সুদূর প্রাচ্যে পাঠালে তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে লড়তে হবে। কিন্তু এমন কেউ নেই যিনি এই সম্ভাব্য ঘটনার সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কেউ নেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে পাঁচ লাখ ভারতীয়ের জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

আমি আগে বলেছি যে সুদূর প্রাচ্যে অভিযান চালাবার মত যথোপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা ব্রিটেনের পক্ষে কেন সম্ভব নয় তার কতকগুলো স্পষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে গত পাঁচ বছর ন' মাস ধরে তারা নানা রণক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেছে।

যার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণ রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই ব্রিটিশ সৈন্য আর একটা অভিযানে প্রস্তুত নয়—এবারকার যুদ্ধ আরও দীর্ঘদিন ধরে হবে এবং এ যুদ্ধ য়্যুরোপের যুদ্ধের চাইতে আরও কঠোর হবে। দ্বিতীয়তঃ এ যুদ্ধে ব্রিটেনের অধিক সর্ব্বনাশ হয়েছে, যা গত যুদ্ধে হয় নি। যুদ্ধের চাপে এবং যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন হওয়াতে ব্রিটিশ-শিল্পের সবটাই যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত হয়েছে। আমেরিকার শিল্পের এমন অবস্থা হয়নি। ফলে ব্রিটেন যুদ্ধের আগেকার বাজার হারিয়ে ফেলছে এবং তা আমেরিকার শিল্পের হাতে গিয়ে পড়ছে। এইভাবে যদি আরও কিছুদিন চলে তা হলে যুদ্ধের আগেকার বহির্বাণিজ্য হারিয়ে ব্রিটেনের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। তাই ব্রিটেনের নেতারা চায় যে তাদের ফ্যাক্টরীর কর্ম্মীদের সৈন্যের কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব আবার শিল্পগুলো চালু করে তুলতে। সুদূর প্রাচ্যে দীর্ঘদিনের জন্য অভিযান চালানো এবং সেই সঙ্গে তার শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা—এই দুটো কাজ একসঙ্গে ব্রিটেনের পক্ষে করা অসম্ভব।

তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে আর একটি জনবলে বলীয়ান দেশ আছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে আগামী সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে কামানের মুখে লোক ধরবার কাজ দিতে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা হচ্ছে। যদি এই পাঁচ লক্ষ সৈন্য ভারতের জনমতের সহায়তা ছাড়া সংগ্রহ করা যেত, তবে ওয়েভেল প্রস্তাব কখনই আসত না। ব্রিটিশের অধীনস্থ ভারতীয় বাহিনীও রণক্লান্ত বলে লর্ড ওয়েভেল এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদ কংগ্রেসকে দলে টেনে সুদূর প্রাচ্যের অভিযানে বল সংগ্রহ করতে চায়।

অবস্থা যদি স্বাভাবিক থাকত তবে কোনও কংগ্রেসের সভাই ওয়েভেল প্রস্তাব বিবেচনার মধ্যেই আনত না। এখন এই প্রস্তাব আলোচনা করতে হলে কংগ্রেসের চিরদিনকার নীতি ও বিশ্বাস বিসর্জ্জন দিতে হবে। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। মহাত্মা গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওয়েভেল প্রস্তাবে স্বাধীনতা কথাটিও নাই। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দেবে না ও তাতে বাধা দেবে বলেছে। তৃতীয়ত, কংগ্রেস এখনও "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব ছাড়ে নি—তিন বছর আগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পর স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির ধ্বনি হচ্ছে "করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা"। কাজেই কোনও কংগ্রেস সভ্য তার আদর্শ ও নীতির দিক থেকে ওয়েভেল প্রস্তাব কানেই তুলতে পারে না, বিবেচনা করা ত দূরে থাকুক। কিন্তু বাস্তবত দেখা যাচ্ছে বহু কংগ্রেসের সভ্য ও নেতারা আজ এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে কারণ ইঙ্গ-আমেরিকানদের য়্যুরোপ জয় হবার পরে ভারতবর্ষে একটা পরাভব স্বীকার করবার মত ঢেউ উঠেছে। নিরাশা ও পরাভব জন্য বহু কংগ্রেস সভ্য তাদের আজীবনের আদর্শ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত এবং ১৯৪২ সালে যে প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখান করেছিলেন তাই গ্রহণ করতে উদ্যত।

আমি আমার দেশবাসীকে খোলাখুলি ভাবে বলছি যে নিরাশা অথবা পরাভব স্বীকার করবার মত কিছুই হয় নি। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের অথবা রাজনীতিক পরিস্থিতি সমালোচনা করলে নিরাশ হবার মত কিছুই হয়নি দেখতে পাওয়া যাবে। পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে কঠোর সংগ্রাম এখানে হবে। তথাকথিত সম্মিলিত জাতিদের মধ্যে সত্যিকার মিল নেই। সোভিয়েট য়্যুনিয়নের যুদ্ধের আদর্শ ইঙ্গ-আমেরিকার আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র এবং সোভিয়েট ও ইঙ্গ-আমেরিকার মধ্যে বিরোধ রোজই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুই দলই অবশ্য য়্যুরোপে তাদের বিভেদ মিটিয়ে নিচ্ছে। তার কারণ সুদূর প্রাচ্যে তাদের এখন যুদ্ধে নামতে হবে। জার্মাণীর পরাজয়ের পরে সোভিয়েট রাশিয়া এশিয়ার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে পড়েছে। তা যদি না হত তবে মলোটভ 'সানফ্রানসিসকো'তে একথা বলতেন না যে অচিরে স্বাধীন-ভারতের কণ্ঠ পৃথিবীতে শ্রুত হবে।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ যখন চলতে থাকবে তখন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে

আশ্চর্য্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে বাধ্য। তার কোন কোনটি আমাদের শত্রুদের কাছে প্রীতিদায়ক হবে না, এবং সেগুলো থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে। য়্যুরোপে মিত্রপক্ষের জয় না হওয়া সত্ত্বেও সিরিয়া ও লেবানন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকাকে ফরাসী সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ লাগিয়ে দিয়ে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেমন করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে সিরিয়া এবং লেবানন ভারতবর্ষের সামনে তার এক আদর্শ স্থাপন করেছে। এখন সিরিয়া এবং লেবানন ব্রিটেন এবং আমেরিকার সাহায্য নিচ্ছে বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রগুলো বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যে ব্রিটেনের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। ব্রিটেনের রাজনীতিকেরা এটা অনুভব করেছে। তারা এটাও বুঝতে পেরেছে যে, ভারতবর্ষ বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করবে। সম্মিলিত জাতিদের মধ্যেও এমন বন্ধুভাবাপন্ন শক্তি মিলতে পারে। এই যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষকে এভাবে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবে রাখতে চায় না; তারা চায় ভারতবর্ষ তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়েই থাকুক। আমাদের ভুললে চলবে না যে, মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী ভারতে সন্ধি হয়ে যাবে, তখন থেকেই ভারতীয় সমস্যা হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরের ব্যাপার। তখন সোভিয়েট রাশিয়ার মত বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না।

আমাদের শত্রুরা সম্প্রতি সামরিক জয় অর্জ্জন করেছে বটে, তবু স্বাধীনতা লাভের দিকে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। দেশে ভারতবাসীরা যা করছে, তার ওপরে আর দুটো শক্তি স্পষ্টতই ভারতের

স্বাধীনতা লাভের পক্ষে কাজ করছে। প্রথম যারা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেছে, দ্বিতীয়ত যারা পৃথিবীর জনমতের কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ তার শেষ লোক দিয়ে যুদ্ধ করবে। তেমনি যারা ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবে দেখে, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে, তারা ভারতবর্ষের কথা বলবেই। ভারতবর্ষের বাইরে যে শক্তিগুলো কাজ করবে দেশের মধ্যেকার সংগ্রাম যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তাকে বাধা দিতে কেউ পারবে না। দেশের মধ্যে যদি দেশবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম না করতে পারে তবে অন্তত তার সঙ্গে সন্ধি করতে অস্বীকার করে নৈতিক বিরোধিতা দেখাতে ত পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেসের সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটি এবং তাদের পেছনে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী আছে তাঁদের কাছে আবেদন করছি এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাঁরা যেন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ভুল না বোঝেন। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ঠিক না বুঝতে পারলে ভারতের রাজনীতিতে ভুল পন্থা অবলম্বিত হতে পারে। ভারতবর্ষ পরাভূত হয় নি। আমরা এখন বিজিত নই। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা আমাদের প্রতিকূল নয়। এবং তা আমাদের অনুকূল, যতদিন যাবে ততই আরও অনুকূল হয়ে উঠবে। তবে কেন আমরা সন্ধি করব, কেন এ প্রস্তাব গ্রহণ করব যা তিন বছর আগে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি।

যে চিরজীবন কংগ্রেস ও দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে এমন এক জন কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য হিসাবেই আমি এখন কথা বলছি। আপনারা যদি মনে করেন যে আমাদের মিত্রদের পরাজয় হবে এবং ইঙ্গ-আমেরিকার হবে জয়, তবু ভারতবর্ষের জন্য চিন্তা করবার কিছু নাই। বিশ্বের রাজনীতিতে ভবিষ্যতে যাই হোক না

কেন, ভারতবর্ষের জয় হবেই। ভারতের ভাগ্যাকাশে শুভ গ্রহের উদয় হয়েছে। এই সময় একটা ভুল পথ নিয়ে সব নষ্ট করবেন না। দীর্ঘকাল ধরে বহু কষ্ট আমরা সহ্য করেছি। আর কিছুদিন আমরা কষ্ট সহ্য করব। ভাইবোনেরা, আপনারা কি বুঝতে পারছেন না লর্ড ওয়েভেলের কেন এত তাড়া? মিঃ জিন্না সিমলা অধিবেশন স্থগিত রাখতে বলেছিলেন, কেন লর্ড ওয়েভেল সে কথা শোনেননি তা কি আপনারা বুঝছেন না? ভারতবর্ষের বাইরে আমরা যারা আছি তাদের কাছে সমস্যাটি অত্যন্ত সহজ এবং পরিস্কার। ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন ৫ই জুলাই তারিখে হবে। সংরক্ষণশীল দল ভারতীয় সমস্যাকে নির্ব্বাচনের ইস্যু করতে চায় না। তাই ওয়েভেল প্রস্তাব নির্ব্বাচনের ঠিক আগে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নির্ব্বাচনে কি ফল হবে তা কেউ বলতে পারে না। লেবার দল অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত না হলেও ৬ জুলাইয়ের পরে তাদের দলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সংরক্ষণশীলদলের ভয় আছে যে যদি লেবার দল নির্ব্বাচনে জিতে যায়, তা হলে ভারতীয় সমস্যা সমাধান করবার জন্য তারা আবার চেষ্টা করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার দর কষাকষিতে বিশ্বাস নেই। তবু যদি আপনারা সন্ধি করতেই চান তবে ৫ই জুলাইয়ের আগে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করবেন না। আমি জানি না মিঃ জিন্না কি ভেবে সিমলা বৈঠক বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। তবে তিনি যদি ৫ই জুলাইয়ের আগে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করতে না চান তবে আমি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রশংসাই করব। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে ৫ই জুলাইয়ের আগে একটা বোঝাপড়া করে নিতে লর্ড ওয়েভেল প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। যদি তিনি সফল হন তবে সেটা সংরক্ষণশীল দলের গৌরবের বিষয় হবে এবং ঐ দল নির্ব্বাচনে বিপুল ভোট লাভ করবে। আবার যদি লর্ড ওয়েভেল ৫ই জুলাইয়ের আগেই সাফল্য অর্জ্জন করেন, এবং তার পরে শ্রমিক দলের হাতে শাসনক্ষমতা আসে, তখন

ভারতীয় সমস্যা নিয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করতে রক্ষণশীল দলই বাধা দেবে।

শ্রমিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে ফল হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস অন্য রকম। আমার কল্পনা হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে, ফৌজের শেষ সৈন্যের শেষ রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে যাব। আপনারা যদি এই পথে না আসতে চান, যদি মনে করেন এটা একটা দুঃসাহসী বিপদ সঙ্কুল অভিযান—আপনারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে আমি বলব আলোচনার সময় ৫ই জুলাইয়ের পরে। লর্ড ওয়েভেলের সঙ্গে ৫ই জুলাইয়ের আগে যদি আপনারা রফা না করেন তবে শ্রমিক দলের প্রার্থীরা বেশী ভোট পাবে। এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে ক্রীপস ও ওয়েভেল প্রস্তাব টোরি মন্ত্রী পরিষদ দ্বারাই উদ্ভাবিত। এ দুবারই শ্রমিক দল ছিল সংখ্যায় কম, কাজেই উদ্যম ও দায়িত্ব শ্রমিক নেতাদের হাতে ছিল না। লর্ড ওয়েভেল বিফল হলে ব্রিটিশ জনসাধারণ আবার শ্রমিকদলকে ভারতীয় সমস্যা সমাধান করবার সুযোগ দেবে। আমার বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে এই, যদি আপনাদের আপোষ আলোচনায় বিশ্বাস থাকে তবে লর্ড ওয়েভেলের কাছ থেকে বিদায় নিন, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। তার ফলে ভোটে শ্রমিকদলের সুবিধা হবে এবং তারা হয়ত শাসনক্ষমতাও লাভ করতে পারে। সংরক্ষণশীল দল যেখানে বিফল হয়েছে, লেবার দল সেখানে সাফল্য অর্জ্জন করবে এই বিশ্বাসে তারা আবার ভারতীয় সমস্যা নিয়ে তখন আলোচনা করবে নিশ্চয়ই। ৫ই জুলাইয়ের পরে যে মন্ত্রী পরিষদই গঠিত হউক, যে সমস্যার দীর্ঘদিন সমাধান করা সম্ভব হয় নি তা নিয়ে আবার চেষ্টা করা তাদের কর্ত্তব্য হবে। তাই শ্রমিক মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করে আপনারা যা পারেন তা ভারতবর্ষের পক্ষে অনেক বেশী ভাল হবে, সংরক্ষণশীল দল কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবের চাইতে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

ভাই বোনেরা, আগামী কাল আবার এই রকম সময়ে আপনাদের কাছে আমি বলব। আজ আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। বড়লাট শাসন পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানদের সমান সংখ্যক আসন দিয়েছেন বলে আপনারা তাদের নিন্দা করছেন। কিন্তু আপনারা এই ব্যাপারের আরও গভীরে প্রবেশ করে পেছনে কে আছে দেখছেন না কেন? আমি যে সব রিপোর্ট পেয়েছি তা দেখে মনে হয় এখন পয্যন্ত একজন নেতাও সে দিকটা ভাবেন নি। হিন্দু মহাসভা যে তাদের অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করেছে সেটা দুঃখের বিষয়। শাসন পরিষদে মুসলমানদের বেশী আসন পাবে বলে আমাদের আপাত্তর কিছু নাই। প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ শ্রেণীর মুসলমানদের শাসন পরিষদে নেওয়া হবে? যদি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলি, রফি আহ্‌মদ কিদওয়াই এর মত লোক আসেন তবে ভারত নিশ্চিন্ত হতে পারে। এই সব দেশ-প্রেমিকদেরই গৌরবের আসন দেওয়া উচিত। দেশসেবী হিন্দু ও মুসলমানে কোন প্রভেদ নাই। ব্রিটিশ চায় সব কটি মুসলমান আসন মুসলিম লীগকে দিতে। হিন্দুদের সব আসনও কংগ্রেসকেই দিতে হবে। আর বাকি আসনগুলো বড়লাট নিজের খুসীমত লোকদের দেবেন যারা বড়লাটের অঙ্গুলি হেলনে চলবে।

মুসলিম লীগ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করবে এবং ফলে কংগ্রেস চিরদিনই সংখ্যালঘু থাকবে। দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ যেমন আগে শাসন করছিলেন একটা চাল দিয়ে ঠিক তেমনিই শাসন করতে থাকবেন শুধু তা নয়, এর পরে আপোষ ভাবে কংগ্রেসেরও সমর্থন আদায় করে নেবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শাসন পরিষদের মুসলিম লীগের সভ্যেরা বড়লাটের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কি না। বড়লাট তাদের শাসন পরিষদে বেশী আসন দিয়েছেন। কাজেই তারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলেই আমার বিশ্বাস। সমর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করলে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে।

আমার একটুও সন্দেহ নাই যে এই ওয়েভেল প্রস্তাবে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অর্থবা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটা বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু মিঃ জিন্না এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা লর্ড ওয়েভেলকে ফাঁকি দেবে। শাসন পরিষদে মুসলিম লীগ পাকিস্তান লাভের আশায় ব্রিটেনে সমর প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে। কংগ্রেস যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে শাসন পরিষদে সব সময়ে তারা থাকবে সংখ্যালঘু। তবু এই আপোষ করার ফলে কংগ্রেসকেও ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করতে হবে। কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভ করবার পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কৌশলে কংগ্রেসকে দিয়ে পাকিস্তান দাবী স্বীকার করিয়ে নেবে। ইতিমধ্যে এই রফা স্বীকার করা কংগ্রেসের আত্মহত্যারই সামিল হবে, কারণ পক্ষান্তরে এই কাজে এটা স্বীকার করে নেওয়া হবে যে কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নয়, ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি দল মাত্র।

আপনাদের কাছে আমি তাই অনুরোধ করছি এই নির্লজ্জ পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। যে সব নেতারা এখনও ওয়েভেল প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, তাঁদের আমি বুঝি। কিন্তু যাঁরা কিছু বলেছেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত লোকও সিমলা বৈঠকের আগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলেন নি। যারা ১৯৪২ সালের আগে ও ৪২ এর আন্দোলনের পরে কারারুদ্ধ হয়েছে, তাদের কথা একেবারেই অবজ্ঞাত বলে তাঁরা বড়লাটের কাজের সমালোচনা পর্য্যন্ত করেন নি। বড়লাট বলেছেন যে কংগ্রেসীদের সুবোধ শিশু হয়ে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, এবং ১৯৪২-এর আন্দোলনে যারা বন্দী হয়েছে তাদের মুক্তির বিষয় শাসন পরিষদে বিবেচিত হবে। নতুন শাসন পরিষদ যে তাদের মুক্তি দেবেই এমন কোন অঙ্গীকার পর্য্যন্ত নাই।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, আমি হিন্দু মহাসভার পাকিস্থান বিরোধী নীতি সমর্থন করি না। তবু আমার মনে হয় যে মহাসভা ওয়েভেল প্রস্তাব সম্বন্ধে তাদের মতামত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে ভারতবর্ষের উপকারই করেছে। আমি আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলব যে আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর কর্ত্তব্য দেশের সর্ব্বত্র ওয়েভেল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন আরম্ভ করা। নেতার যেমন জনমত গ্রহণ করতে হয়, মহাত্মা গান্ধীও তেমনি বরাবরই জনমতে সাড়া দিয়েছেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে সিমলা বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে তিনি ঠিক কাজই করেছেন। যে পথ সত্য, জনমতের দাবী অনুযায়ী সেই পথ গ্রহণ করবার স্বাধীনতা তিনি এইভাবে অব্যাহত রেখেছেন। আমার একটুও সন্দেহ নাই যে জনমত এবং কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য ওয়েভেল প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। মহাত্মা গান্ধী সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন এবং তখন তিনি এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। ভাইবোনেরা, ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে, আপনারা উঠে পড়ে লাগুন। ১৯৪২ সালে ক্রীপস্ প্রস্তাবের মত লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবের একই ফল হোক।

জয় হিন্দ।

৭৪। ওয়েভেল-প্রস্তাবের স্বরূপ

(সিঙ্গাপুর থেকে ২০শে জুন, ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

ভাই ও বোনেরা, আজ এই সঙ্কটকালে যদি আপনাদের মাঝে আমি থাকতাম তা হলে আপনাদের কাছে যে ভাবে কথা বলতাম ঠিক তেমনি ভাবেই আমি আজ আপনাদের কাছে বলছি। ১৯২১ সাল থেকে নানা ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে একজন কংগ্রেসসেবী হিসাবেই

আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দিয়ে সমর প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা করেছিল; কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হয় নি এবং এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ নাই বলে কংগ্রেস তখন যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করতে রাজী হয় নি। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে নি, এগারটি প্রদেশের যে আটটিতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছিল, সেগুলোতেই প্রবল সহযোগিতার কথা উঠেছিল। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসী এই সহযোগিতা করতে রাজী হয় নি বলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছিল, যদিও তখন প্রত্যেক কংগ্রেস সভ্যের মনে হয়েছিল যে যদি এই মন্ত্রীরা পদত্যাগ না করত তবে দেশের জনসাধারণের অনেক উপকার তারা করতে পারত। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবার পরে কংগ্রেস আবার ধীরে ধীরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করে। ১৯৪২ সালে "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গ্রহণ করবার পর অবস্থা চরমে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দেশের জনগণ একটা নতুন ধ্বনি জাগিয়ে তোলে "করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা।"

আজ ১৯৪৫ সালে আমাদের সামনে ওয়েভেল প্রস্তাব উত্থাপিত। আমাদের বলা হয়েছে যে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ করতে কংগ্রেস রাজী হলে দু'টো বিষয়ে কংগ্রেসের লাভ হবে, উপরন্তু ভবিষ্যতে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতিও আছে। দুটো বিষয় হচ্ছে বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকটা চাকুরী, এবং প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব।

ভারতবর্ষ থেকে যে সব সংবাদ আমি পাচ্ছি, তাতে মনে হয় যে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ও শাসন পরিষদের আসনেই কংগ্রেস তুষ্ট হয়ে ওয়েভেল প্রস্তাব আলোচনা করছে, স্মরণ রাখবেন যে এই আলোচনায় স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠছে না, ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি মাত্র আছে। কিন্তু এই সব লোভ কংগ্রেসের সামনে ত বরাবরই আছে। প্রথমত

স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন বরাবরই দিয়েছে, দ্বিতীয়ত আটটি প্রদেশে ১৯৩১ সালেই ত আমাদের মন্ত্রিত্ব ছিল, আমরাই সে পদ ত্যাগ করেছি। বড়লাটের শাসন পরিষদের পদ কংগ্রেসীরা আত্মবিক্রয় করে সব সময়েই পেতে পারে।

ওয়েভেল-প্রস্তাবে দুটো সর্ত্ত আছে। শাসন পরিষদে পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে এটা গ্রহণ করলে সুদূর প্রাচ্যের অভিযানের সব রকম দায়িত্ব নেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করে তখন অবস্থা এমন ছিল না। ১৯৩৭ সালে ব্রিটেনের যুদ্ধে সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি না দিয়েও ইচ্ছে হলে এই ধরণের কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

যারা ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ আমাদের সমস্যা কি তা পরিষ্কার করতে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। (১) লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবে আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে আংশিক উক্তিও নাই, আমাদের স্বাধীনতা আদর্শের কি হবে? (২) পূর্ণ স্বরাজের অর্থ কি বড়লাটের শাসন পরিষদ ভারতীয়করণ, না তার অর্থ ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ? (৩) ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কেন পদত্যাগ করেছিল? (৪) আমাদের "করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা" ধ্বনির কি হল? (৫) আমরা ডাঃ খারে, শ্রীঅ্যানে প্রভৃতির ন্যায় কংগ্রেসীদের বড়লাটের শাসন পরিষদে কাজ নেওয়াতে কেন নিন্দা করেছি?

বন্ধুগণ, যাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান তাঁরা একথা কিছুতেই বলতে পারবেন না যে আজ ওয়েভেল প্রস্তাবে যে শাসন পরিষদ গঠনের কথা আছে তা অতীতের শাসন পরিষদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বড়লাট নিজেই এদিক থেকে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেন নি। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন যে বর্ত্তমান শাসন তন্ত্রের ভেতরেই এই

প্রস্তাব কার্য্যকরী হবে, এই প্রস্তাব কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আনবে না। উপরন্তু বড়লাটই শাসন পরিষদের সভ্যদের নিয়োগ করবেন, সভ্যেরা তাঁর কাছেই দায়ী থাকবে, আইন সভার কাছে নয়।

এই পরিষদের সব চাইতে খারাপ ব্যবস্থা যাচ্ছে যে অধিকাংশের মত অনুযায়ী কোন কাজ হবে না, পরিষদের সিদ্ধান্ত বড়লাট ভোট দিয়ে রদ করে দিতে পারেন। ব্রিটেনের কাছে ভারতবর্ষ এই ধরণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রই আশা করতে পারে, এমনি ধরণের নব ব্যবস্থাই তারা দেবে। বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও বৈদেশিক দপ্তর প্রভৃতি কয়েকটা নতুন পদের সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু প্রধান পদ যুদ্ধের দপ্তর থাকবে জঙ্গীলাটের অধীনে। সমর সচিব তাঁর দপ্তর চালনা ত করবেন*, দরকার হলে যুদ্ধের প্রয়োজনের অজুহাতে অন্য বিভাগের ওপরও খবরদারী করতে পারবেন। পরিষদের সমর সচিব যা বলবেন বড়লাট তার সমর্থন করবেন, আর অন্য সভ্যদের তাতে সায় না দিয়ে উপায় থাকবে না। আইনের দিক থেকে সভ্যেরা বড়লাটের কাছে দায়ী, আর সমর-প্রচেষ্টা-সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে নীতির দিক থেকেও বাধ্য।

কাজেই ওয়েভেল প্রস্তাবকে ভিটলভাই প্যাটেলের ভাষায় বলা যেতে পারে "বড়লাটের স্বরাজ" শাসন পরিষদের স্বরাজও নয়। একজন ভারতীয় সভ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ ভারতের দেশীয় রাজ্য ও সীমান্তের উপজাতির ব্যাপারগুলো তার দপ্তরের বাইরে থাকবে। যদিও যৌথ-দায়িত্ব অথবা অধিকাংশের মত অনুযায়ী কোন কাজ হবে এমন ব্যবস্থা নাই, এবং বড়লাটের আগের মতই স্বৈরাচার-ক্ষমতা আছে, তবু রাজনীতিক চাল দিয়ে তাঁর এই ক্ষমতা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করবেন। এই চাল হচ্ছে পরিষদের অধিকাংশ যাতে বড়লাটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলে তার জন্য ব্যবস্থা করা।

আমার মনে হয় শাসন পরিষদের সব কটি মুসলমান আসন যদি মুসলিম লীগ চায়, তবে বড়লাট তাও দিয়ে দিতে রাজী হবেন। সব কটি বর্ণ হিন্দুর আসন কংগ্রেস দাবী করলে তিনি তাও দিয়ে দেবেন। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের আর সব আসনগুলোতে তিনি নিজের পছন্দ মত লোককে নিয়োগ করবেন। বলা বাহুল্য—এই সব সভ্য বড়লাটের তাঁবে থাকবে। যদি বড়লাট পরিষদের কংগ্রেস অথবা লীগ সভাদের টানতে পারেন তা হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ওপরে তাঁর প্রভাব স্থায়ী হবে। কথা হচ্ছে এ দুটো দলের মধ্যে কোনটি বড়লাটের কাছে আত্মবিক্রয় করবে? কংগ্রেসের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, কারণ জনসাধারণ এবং কংগ্রেসের সভ্যরা সকলে তাকে বাধা দেবে। "কিন্তু মুসলিম লীগকে লোভ দেখিয়ে, সুবোধ শিশুর মত চললে পাকিস্তান দিয়ে দেব বলে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে যোগ দিতে রাজী করানো সম্ভব নয়। মুসলিম লীগের সভ্যরা বড়লাটের বিরোধিতা করলে তিনি তাদের ভয় দেখাবেন যে তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের দিকে কাজ করবেন, এবং পাকিস্তানের কোন আশাই নাই।

প্রসঙ্গত, শাসনপরিষদে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করবে বলে ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যদি একটা চুক্তি হয়ে থাকে তবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। উপরের বিশ্লেষণ যদি সত্য হয়,—সত্য বলেই আমার বিশ্বাস—তা হলে শাসন পরিষদে কংগ্রেস চিরদিনের জন্য সংখ্যালঘু হয়ে থাকবে, উপরন্তু ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করতে কংগ্রেস বাধ্য হবে, কারণ এই প্রতিশ্রুতিতেই রফা হচ্ছে।

অতএব আমাদের এখন ধীরভাবে বিচার করতে হবে এখন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের কি লাভ হবে। আমি বিচার করে দেখেছি যে কংগ্রেসের একমাত্র লাভ হবে শাসন পরিষদের কয়েকটা পদ, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলিম লীগ উভয়েরই খুব বেশী লাভ হবে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ও ভারতবাসীর নাম নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে, দেশের সম্পদ ও জনবল আরও অধিক মাত্রায় যুদ্ধে নিয়োগ করবে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দিয়ে টেক্কা দিয়ে যাবে। উপরন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাদের পাকিস্থানের স্বপ্ন সফল করে তুলবে।

কংগ্রেসের সহযোগিতায় এই যুদ্ধ পরিচালনার আশু উদ্দেশ্য সফল হলে পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কংগ্রেসের সহযোগিতার আর কোন প্রয়োজন হবে না। তখন কংগ্রেসকে দূরে ঠেলে দিয়ে মুসলিম লীগকে আলিঙ্গন করে ভারতবর্ষ বিভক্ত করবে। কিন্তু এর মধ্যে জগৎবাসীর দৃষ্টিতে কংগ্রেসের সম্মান কমে যাবে, কংগ্রেস হাস্যকর হয়ে উঠবে। মৌলিক আদর্শ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে রফা করতে হবে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দিলে কংগ্রেসের সংগ্রামশীল বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য লোপ পাবে। কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি এই দাবী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে ভারতের একটি রাজনৈতিক দল বলে নিজেদের এইভাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ রাজনৈতিক আত্মহত্যা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রফা করলে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে, সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ যে সব বৈদেশিক শক্তি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল তারাও বিমুখ হবে।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা ভেবে দেখুন এই প্রস্তাব গ্রহণ না করলে আপনাদের কী ক্ষতি হবে। লাভ হবে কয়েকজন উচ্চাভিলাষী কংগ্রেস সভ্যের কয়েকটা শাসনপরিষদের চাকুরী। আপনাদের ধৈর্য্যের ওপর আর অত্যাচার না করে কাল যা বলেছি আর কয়েকটা বিষয় আবার বলব। প্রথম, ওয়েভেল প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ভুলবেন না। উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ধোঁকা দিয়ে সুদূরপ্রাচ্যে ব্রিটেনের যুদ্ধে পাঁচ লাখ সৈন্য সংগ্রহ করা। আপনারা যদি ভারতের স্বাধীনতা দাবীর সাহায্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন, তবে আমাদের শত্রুর সাম্প্রতিক বিজয়ে

হতাশ হবার বা দমে যাবার কিছু নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থা আজ যতটা দৃঢ় হয়েছে, আগে তেমন ছিল না। দেশের ভেতরে আপোষহীন সংগ্রাম করে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রাম করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে আমরা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবই। এমনি করেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে, যা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন স্বায়ত্ত শাসন অথবা বড়লাটের শাসন পরিষদ ভারতীয়করণ মাত্র নয়। স্বাধীনতার পরিপন্থী সব চাইতে বড় বাধা আমাদের জীবনে আজ দেখা দিয়েছে—তা হচ্ছে হতাশ ও পরাভূত মনোভাব। যারা রক্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সংগ্রাম করে তারা হতাশ হয় না, পরাভব স্বীকার করে না। চেয়ারে বসে যে সব ভীরু রাজনীতি করে থাকে তারা পরাজয় স্বীকার করে, দমে যায়।

আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্প্রতি বর্মার রণক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেছে। কিন্তু তার ফলে শেষ সৈন্য পর্য্যন্ত সংগ্রাম করবার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। আমাদের বাহিনীর অঙ্গীকার এখনও অটুট, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। ইঙ্গ-আমেরিকান প্রচারকেরা যা বলে আনন্দের বিষয় যে আমাদের বাহিনীর অবস্থা তেমন হয় নি। বর্মায় এখনও তীব্র যুদ্ধ চলেছে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় অন্যান্য দেশে ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যদের দীর্ঘদিন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে।

দেশবাসীগণ, যারা স্বাধীনতার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করেছে, যারা কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আজও রয়েছে, তাদের কথা বিস্মৃত হবেন না। যারা ১৯৪২ সাল থেকে জেলে আছে, ১৯৪২ এর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন যারা আছে তাদের কথা লর্ড ওয়েভেল উপেক্ষা করেছেন। আপনারা যদি ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ করাই স্থির করেন, তবে ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। শ্রমিক অথবা সংরক্ষণশীল যারাই মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করুক, ৫ই জুলাইয়ের পরে আলোচনা করে আপনারা ভাল সর্ত্ত পাবেন। ৫ই জুলাইয়ের

আগে একটা রফা করবার জন্য লর্ড ওয়েভেল খুব চেষ্টা করবেন, কারণ এই সিদ্ধান্তের ওপর সংরক্ষণশীলদের নির্ব্বাচনের ফলাফল নির্ভর করবে। আপনাদের জন্য যে ফাঁদ পাতা হয়েছে তাতে পা দেবেন না।

দেশবাসী ভাই বোনেরা, এই সঙ্কট-সময়ে ভারতের ভবিষ্যত আপনাদের ওপরেই নির্ভর করছে। সমস্ত দেশ জুড়ে "কুইট-ইণ্ডিয়া" আন্দোলন সুরু করবার এই সময়, যদি তা করেন তা হলে আর কারো রফা করা সম্ভব হবে না।

জয় হিন্দ!

১৫। ওয়েভেল-প্রস্তাব ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিন

(সিঙ্গাপুর থেকে ২১ শে জুন, ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

ভারতের ভাই বোনেরা, গত তিন দিন আমি জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েভেল প্রস্তাব আলোচনা করেছি, ভারতীয় সমস্যার সঠিক পঠভূমি অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবেও আলোচনা করেছি। নানা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যাঁরা আজ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করছেন তাঁরা সমগ্র বিষয়টি অতি অল্প পরিসর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। যাঁরা সত্যই সঠিক পটভূমিতে এই বিষয় আলোচনা করতে সক্ষম তাঁদের স্বর ভারতের বাইরে থেকে শোনা যায় না, আবার তাঁদের অনেকেই এখনও কারারুদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটি যদি আলোচনা করবার আগে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করতেন তবে উদ্বেগের কোনও কারণ থাকত না, সমস্ত রাজনৈতিকদের মুক্তির পরে এ, আই, সি, সির একটা অধিবেশন হলে সমগ্র কংগ্রেস সঙ্ঘের

মতামত বুঝতে পারা যেত। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ধূর্ত্ত, তাই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রেখে শুধু ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দিয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেসের বামপন্থীরা যেন মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ না পায়।

আমার আদৌ সন্দেহ নেই যে ১৯৩৯ সালের পরে ভারতের, বিশেষ করে কংগ্রেসের জনমত বামপন্থী হয়ে পড়েছে। তার ফলে যদি আজ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হত, এমন কি এ, আই, সি, সিরও একটা সভা হত, তা হলে বিপুল ভোটাধিক্যে ওয়েভেল প্রস্তাব নিশ্চয়ই বর্জ্জিত হত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং লর্ড ওয়েভেল ভারতের অবস্থা জানেন। ব্রিটিশের এই প্রস্তাব সাধারণ কংগ্রেসের সভ্যদের বিচারের ওপর, অথবা এ, আই, সি, সির সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিলে তা গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনা থাকত না। তারা তাই এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে একমাত্র ওয়ার্কিং কমিটিই কংগ্রেসের পক্ষে ওয়েভেল প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা ওয়াকিং কমিটির নাই।

সে রকম কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে নিজের দায়িত্বে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ওয়াকিং কমিটির এই রকম একটা গুরু সিদ্ধান্ত করবার মত আইনত না হলেও, নীতিগত একটা ক্ষমতা আছে এটা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু সবাই জানে যে বামপন্থীদের যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ওয়াকিং কমিটিতে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই। কেউ একথা বলবে না, যে দেশে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার জন্যে এ, আই, সি, সি-কে উপেক্ষা করে কংগ্রেস এই রকম একটী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য অথবা এ, আই, সি, সি-র সামনে

উপস্থিত না করে কেন ওয়াকিং কমিটির কাছে পেশ করেছে সেটা আমি বুঝি, কিন্তু ওয়াকিং কমিটির সভ্যেরা কেন যে লর্ড ওয়েভেলের এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন সেটা আমি বুঝতে অক্ষম। কংগ্রেসের গণতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের আলোচনা অথবা আইন প্রণেতা কোন কমিটি নয়, কংগ্রেসের কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করবার ক্ষমতা মাত্র তার আছে। যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের এবং সমগ্র দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কয়েক দশকের জন্য নির্দ্দিষ্ট করবে, নৈতিক দিক থেকে তা গ্রহণ করা ওয়াকিং কমিটির পক্ষে গুরুতর অন্যায় হবে। অনতিবিলম্বে আবার আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবেদন করছি তিনি যেন কংগ্রেসের বিনা সম্মতিতে এমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। আমার এই আবেদনের কারণ হচ্ছে যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমাদের এতদিনকার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে, কংগ্রেসের মূল নীতি প্রস্তাবাবলী বিসর্জ্জিত হবে, দীর্ঘকাল ত্যাগ ও কষ্ট বরণ করে কংগ্রেসের যে লাভ হয়েছে তার সবটাই নষ্ট হবে।

ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার ফল কি হবে তা আপনাদের কাছে এখন বলব। প্রথমত, কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা, লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবে স্বাধীনতা কথাটিরও উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৮-৩৯ সালে কংগ্রেস ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দিতে অসম্মত হয়েছে, যুদ্ধবিরোধী কার্য্যের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু ওয়েভেল প্রস্তাবের ভিত্তি হচ্ছে যারা তা গ্রহণ করবে তাদের সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। এই যুদ্ধকে কোন ক্রমেই ভারত রক্ষার জন্য যুদ্ধ বলা যায় না। তৃতীয়ত, এই প্রস্তাব গ্রহণে ১৯৪২-এর "কুইট ইণ্ডিয়া" আন্দোলনের বিরোধিতা করা হবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পরে "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু", "করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা" ইত্যাদি ধ্বনি ত্যাগ করে ওয়েভেল-প্রস্তাবানুকূল ধ্বনি সৃষ্টি করতে হবে।

আমি প্রশ্ন করছি যে কংগ্রেস যদি তার মূল নীতি ও প্রস্তাব পরিত্যাগ ক'রে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে লিবারেল ফেডারেশন থেকে কংগ্রেসের পার্থক্য কি রইল? আমি আগে বলেছি যে স্বাভাবিক অবস্থায় এই পরিকল্পনা কংগ্রেস সভ্যেরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। কংগ্রেস নেতাদের বর্ত্তমান আপোষ মনোভাবের পেছনে একমাত্র চিন্তা কাজ করছে যে ইঙ্গ-আমেরিকানরা এই যুদ্ধে জয়ী হবে, আর আমাদের স্বাধীনতা লাভের কোন উপায় নাই। পরিস্থিতি এইভাবে বিচার করা একেবারেই ভুল। য়ুরোপ ও ব্রহ্মে ইঙ্গ-আমেরিকানদের সাম্প্রতিক বিজয় সত্ত্বেও ভারতীয় সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবেই এখনও বিবেচিত হয়। পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইঙ্গ-আমেরিকানরাও বলছে যে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে, কারণ জাপানীরা প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে। ব্রহ্মে আমরা সম্প্রতি হেরে গেলেও এখনও দেশের নানা অংশে কঠোর সংগ্রাম হচ্ছে। জাপানীরা দৃঢ়তা ও সাহস নিয়ে যুদ্ধ যতদিন চালিয়ে যাবে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা যত ভারতীয় আছি সকলে মিলে ততদিন ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের সঙ্গে লড়াই করব। ব্রহ্মে মর্ম্মান্তিক পরাজয় সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অংশ এখনও অটুট এবং এই ফৌজ শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করবে।

ভারতবর্ষের ভাইবোনেরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছেড়ে না দেয় তা হলে যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে বাধা দিতে কেউ পারবে না। ভারতের অভ্যন্তরে সংগ্রাম, পূর্ব্ব-এশিয়ায় সশস্ত্র যুদ্ধ এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তবদৃষ্টিসম্মত নীতি গ্রহণ করলে এই যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হিসাবে দেখা দেবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করতে হলে দেশের ভেতরে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবার নিশ্চয়তা দিতে হবে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় সশস্ত্র যুদ্ধ চালাবার নিশ্চয়তা দেবার ক্ষমতা আমার আছে। ভারতবর্ষের

ভেতরে যদি সংগ্রাম অব্যাহত থাকে তবে ভারতীয় সমস্যা যে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হবে এ নিশ্চয়তাও আমি দিতে পারি এবং এও বলছি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুটনৈতিক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য লাভে অনেকটা সহায়ক হবে। যদিও ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ হলে ব্রিটিশের এখন চিন্তার কিছু নাই, তবে তারা দুটো ব্যাপারে ভয় পায়। তাদের ভয় আছে নীতিগত বিরোধিতা ভারতবর্ষে চলতে থাকলে ভারতের ব্যাপার আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তারা এটাও ভয় পায় যে ভারতবাসী ব্রিটিশবিরোধী থাকলে কখনও ভারতবর্ষ থেকে সুদূর প্রাচ্যে জনবল ও সম্পদের যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাবে না। ব্রিটিশ বেশ জানে ভারতীয়দের অনেকখানি সাহায্য ও ভারতের জনশক্তি ব্যতীত সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা অল্প। লর্ড ওয়েভেল এই প্রস্তাবে এক ঢিলে দু'টো পাখী মারবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, প্রস্তাব গ্রহণ করবার অর্থ হচ্ছে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেওয়া, দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভারতীয় সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে, সোভিয়েট রাশিয়া প্রমুখ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের যারা ভারতবর্ষকে সাহায্য করছিল তারা আর কোন সাহায্য করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে গত ১৯শে আমি যা বলেছি তা' আবার বলতে চাই। আমি বলেছিলাম যে সুদূর প্রাচ্যে লড়াই করবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ লাখ সৈন্য চায় এ সংবাদ আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পেয়েছি, এবং তা থেকেই ওয়েভেল প্রস্তাবের উৎপত্তি। ভারতের জনগণের সাহায্য ছাড়া যদি এটা সম্ভব হত, তা হলে ওয়েভেল প্রস্তাবের কোন কথা বোধ হয় আমরা শুনতাম না। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা বাহিনী, ব্রিটিশ সৈন্যদের মতই রণক্লান্ত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং লর্ড ওয়েভেল বুঝতে পেরেছেন যে ভারতবর্ষ থেকে এখন এই পরিমাণ সাহায্য সংগ্রহ করতে হলে সাধারণের সহানুভূতি প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা দরকার।

ওয়েভেল-পরিকল্পনা গ্রহণ করবার আগে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পাঁচ লাখ ভারতীয়কে বলি দেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে তৈরি হতে হবে। ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেসের কি ক্ষতি হবে তা আমি দেখিয়েছি। কাজেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে লাভ যা হবে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হবে কি না সেটা ওয়ার্কিং কমিটিকে ধীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। যদি লাভের চাইতে ক্ষতি বেশী হয়, তবে ১৯৪২ এর ক্রীপস পরিকল্পনার মত ওয়েভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাও যুক্তিসঙ্গত। অনেক কংগ্রেস সভ্য হয়ত ভাবেন যে আজ আমরা যা করতে যাচ্ছি ভবিষ্যতে তেমনি কিছু করতেই হবে এ রকম ধারণা ভুল। আমি আগের আলোচনায় বলেছি যে এই যুদ্ধকালেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে না পারি তবে যুদ্ধের শেষে আবার সে সুযোগ আসবে।

যুদ্ধের পরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সময়টা খুবই অস্থির। এই সময়ে বিজয়ীরও নানা অসুবিধা থাকে, কারণ তাদের বিশ্রাম ও আরাম দরকার। এই কারণেই আয়ার ও তুর্কীতে গত যুদ্ধের সময় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে যুদ্ধের শেষে তা সম্পূর্ণ সফল হয়।

আমার সামনে একটা খবর রয়েছে, সেটা পড়ে আজ দেখছি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টা বিফল হলে আমরা আর একটা আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্য যুদ্ধান্ত কাল অপেক্ষা করব। যুদ্ধের মধ্যে যে আমাদের আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত নয় কংগ্রেস সভাপতির এই মতের সঙ্গে আমার অনৈক্য আছে; তবে তাঁর উক্তির এই অংশ আমি স্বীকার করি যে যুদ্ধের শেষেও যদি ভারতবর্ষ পরাধীন থাকে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে। যুদ্ধের পরে এই সংগ্রামে কর্ম্মচ্যুত ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যেরা যে ভালভাবেই যোগ দিবে সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের যে সব নেতা ওয়েভেল-প্রস্তাব আলোচনা করবেন, তাঁরা বিষয়টি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে ছোট দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছেন বলে মনে হয়। তাই ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণে লাভ ক্ষতির তুলনামূলক আলোচনা আমি করতে চাই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে আমরা আন্তরিক যোগ দিতে সম্মত হলে ওয়েভেল প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা পাব এই সব: (১) বড়লাটের শাসন পরিষদে কয়েকটা পদ এবং (২) প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের পুনরায় পত্তন। এই সব ত বরাবরই আমাদের সামনে খোলা আছে, ১৯৩৯ সালে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আটটা প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ছিল। আমরা ইচ্ছে করেই তা ছেড়ে দিয়েছি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বরাবরই আমাদের স্বায়ত্ত শাসন দিতে অঙ্গীকার করেছে। যে সব কংগ্রেসী আত্মবিক্রয় করতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে বড়লাটের শাসন পরিষদের পদ সর্ব্বদাই লভ্য। বলতে পারেন, ওয়েভেল-প্রস্তাবে আরও অনেক বেশী পদ দেওয়া হবে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে স্পষ্ট অঙ্গীকার দিতে হবে যে আমরা ব্রিটিশের হয়ে প্রাণপণে লড়াই করব। এই কারণেই কি ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে নি! ১৯৩৯ সালে যুদ্ধে যোগ দিতে অঙ্গীকার না করেও মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা যেত। কিন্তু দেশের সম্পদ ব্রিটিশের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করবার চাইতে পদত্যাগ করাই তারা শ্রেয় মনে করেছিল।

শাসন পরিষদ সম্পুর্ণ ভারতীয় করবার প্রস্তাব হয়েছে বলে ব্রিটেনে অনেকে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। আমি আশা করি কোন ভারতীয়ের ওয়েভেল প্রস্তাব সম্পর্কে এই মনোভাব থাকবে না, কারণ কংগ্রেসের দাবী শাসন পরিষদ ভারতীয়করণ নয়, কংগ্রেসের দাবী হচ্ছে বড়লাট ও জঙ্গীলাট সহ ব্রিটিশেরা সবাই ভারত ত্যাগ করবে। লর্ড ওয়েভেল বলেছেন এই প্রস্তাবে কোন রকম শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করবার কথা নেই। উপরন্তু নব নির্ব্বাচিত শাসন পরিষদ শুধু মাত্র পরামর্শ দেবে, বড়লাটই

সভ্যদের নির্ব্বাচিত করবেন। সভ্যদের দায়িত্বও বড়লাটের কাছে, আইন সভার কাছে নয়। শাসন পরিষদে অধিকাংশের মত যে গ্রাহ্য হবে এমন কোন কথা নেই। বড়লাট অধিকাংশের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারবেন। যৌথ-দায়িত্ব, সংখ্যাধিক্যের কোন প্রশ্নই নাই। অতএব শাসন পরিষদকে কোন ক্রমেই মন্ত্রিসভা বলা যায় না। শাসন পরিষদে প্রধান পদ সমর-সচিবের—সেটা থাকবে জঙ্গীলাটের অধীনে। সমর সচিব যা জারী করবেন বড়লাট তাই সমর্থন করবেন। কাজেই বড়লাটের পরেই জঙ্গীলাটের ক্ষমতা থাকবে বেশী। একযোগে কাজ করলে বড়লাট এবং জঙ্গীলাট মিলে সব বিভাগগুলো নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। শাসন পরিষদের অন্য সভ্যেরা কোনও রকম বাধা দিতে পারবে না, কারণ আইনত তাদের দায়িত্ব রয়েছে বড়লাটের কাছে এবং নৈতিক দিক থেকেও তারা বড়লাটকে সমর্থন করতে বাধ্য, কারণ ব্রিটেনের যুদ্ধে প্রাণপণ সাহায্য করবার অঙ্গীকারেই তারা শাসন পরিষদে যোগ দিয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তর একজন ভারতীয়ের অধীনে থাকবে বটে, কিন্তু আসলে তাও ফাঁকি, কারণ পররাষ্ট্রঘটিত সব বিষয় এই দপ্তরে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। এই বিভাগের সদস্যের অবস্থা হবে সেই ভারতীয় সমর-সচিবের মত, যিনি কেবল সৈন্যদের ক্যানটিনগুলো পরিচালনা করবার ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

র কংগ্রেস সভ্য ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান, তাঁদের
তে চাই যে মন্ত্রিত্ব তাঁরা ১৯৩৯ সালে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে
আবার তা গ্রহণ করবেন কোন মুখে? প্রশ্ন করি• মিঃ
র শাসন পরিষদের পদ গ্রহণ করেছিলেন বলে কেন
লোচনা করেছিলাম, আজ আবার যখন কংগ্রেসই
া জন্য উদ্যত? আমি যতই ভাবছি ততই
আমরা ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করি তবে
ং ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হবে। প্রস্তাব

গ্রহণ করবার অর্থ ২৫ বছর পিছিয়ে যাওয়া। আমাদের নীতি ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেবার পরিবর্ত্তে আমরা শুধু পা'ব ক্ষমতা-লোভী কয়েকজন কংগ্রেসীর জন্য কয়েকটা শাসন পরিষদের পদ।

আমি এখন দেখাব যে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলে, কংগ্রেসের ওপর দিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলিম লীগের বহু লাভ হবে। আমার বিশ্বাস মুসলিম লীগ যদি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব কটা আসন দাবী করে তবে লর্ড ওয়েভেল তাদের ঐ আসনগুলো দিয়ে দেবেন। তেমনি কংগ্রেস যদি চায় তবে বর্ণ হিন্দুদের আসনও কংগ্রেসকে দেবেন। অবশিষ্ট সদস্যদের লর্ড ওয়েভেল নিজের খুসীমত নিয়োগ করবেন। বলা বাহুল্য এই সভ্যেরা সর্ব্বদাই লর্ড ওয়েভেলের বাধ্য থাকবে। দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস অথবা লীগকে দলে টানতে পারলে বড়লাট সব সময়ই সংখ্যাধিক্যের সমর্থন পাবেন। শাসন পরিষদের কংগ্রেস দল যে বড়লাটের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এটা আমি ধরে নিচ্ছি। কারণ তা হলে কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যেরা তাদের আচরণের তীব্র বিরোধিতা করবে। কিন্তু বড়লাট যদি মুসলিম লীগকে এই বলে লোভ দেখান যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাদের পাকিস্থান দাবী সমর্থন করবে, তা হলে মুসলিম লীগ দলের বড়লাটের সঙ্গে চুক্তি করবার সম্ভাবনা। এটা হয়ে গেলেই বড়লাট শাসন পরিষদে চিরতরে সংখ্যাধিক্য দলের সমর্থন পাবেন এবং কংগ্রেস সংখ্যালঘু দলে পরিণত হবে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে ব্রিটেনের যুদ্ধে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়লাটের নীতি সমর্থন করতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহযোগিতায় ভারতের জনসাধারণের নামে যুদ্ধ পরিচালনা করবার সুযোগ পাবে এবং তাদেরই হবে সব চাইতে বেশী লাভ। মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করবে এবং বড়লাটের ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় তাদের আদর্শ পাকিস্থান লাভ করবে।

এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের কি ক্ষতি হবে তা আমি দেখালাম। কংগ্রেস যদি সামান্য কিছুদিনের জন্যও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে তা হলে কি অসুবিধা হতে পারে এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রথমত স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশের লোকের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হবে। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দিয়ে কংগ্রেস তার বিপ্লবী মনোভাব ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ ভুলে যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে কংগ্রেস পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী লোকদের সহানুভূতি হারাবে, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মত বন্ধুভাবাপন্ন শক্তির সমর্থন হারাবে। সোভিয়েট রাশিয়ার আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে, তারা আমাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে রাজী আছে।

বন্ধুগণ, আজ পর্য্যন্ত ওয়েভেল পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিকটা সম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করেছি, এর সাম্প্রদায়িক দিক সম্বন্ধে কিছু বলিনি। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রত্যক্ষভাবে না হলে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে সাম্প্রদাকিয়তা সমর্থন করতে হবে। কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, আজাদ মুসলিম লীগ, জমিয়েত উল-উলেমা, সিয়া কনফারেন্স, মজলিস-ই অহ্‌র, নিখিল ভারত মোমিন দল, প্রজা পার্টি, প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে—এই সব দলগুলো অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে এসেছে। উপরন্তু কংগ্রেস স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে কংগ্রেস ও বর্ণ হিন্দু কথা দু'টোর অর্থ একই, কংগ্রেসের মধ্যে সমগ্র হিন্দু জড়িত নেই।

এটা ধরে নিয়েই আমি আজ একথা বলছি যে বড়লাট কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিদের বর্ণহিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো দেবেন। এবং মুসলমানদের আসনগুলো দেবেন মুসলীম লীগকে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের আসনগুলোতে নিজেরই মনোনীত ব্যক্তিকে বসিয়ে দেবেন।

লর্ড ওয়েভেলকে আমি একটি প্রশ্ন করছি। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত খ্যাতিমান ব্যক্তি যাঁরা মুসলিম লীগের সভ্য নন, তাঁদের স্থান দেবেন কি? গত নির্ব্বাচনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোট কংগ্রেস পেয়েছে, এই কারণে অনুন্নত সম্প্রদায়ের আসনের জন্য কংগ্রেসকে মনোনয়নের অধিকার দেবেন? এতে যদি তিনি সম্মত না হন তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দুর দল বলে প্রমাণিত করতে চান। লর্ড ওয়েভেলকে এই ভাবে কেউ যাচাই করে দেখুন। এই পরীক্ষা থেকে আসল ব্যাপার ধরা পড়বে।

ওয়েভেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর যে কোন আপত্তি থাকুক না কেন, সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে এই একটি মাত্র আপত্তি দিয়ে এই প্রস্তাব বর্জ্জন করা যায় এবং এ প্রস্তাব কোন জাতীয়তাবাদী দলের কাছে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয় না। কংগ্রেস ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সর্ব্বভারতীয় সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে রূপ রক্ষা করবার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘদিন কঠোর সংগ্রাম করেছে। আজ যদি কংগ্রেস নিখিল ভারতীয় রূপ পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে তবে সেটা তার পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল হবে। তেমনি জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করলে কংগ্রেস ভারতবর্ষের অনেকগুলো দলের অন্যতম বলেই বিবেচিত হবে। গত পরশুদিন আমি বলেছি, আজ আবার বলছি যে সংরক্ষণশীল দল লর্ড ওয়েভেলের মারফতে ৫ই জুলাইয়ের আগে কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। লর্ড ওয়েভেল সফল হলে সংরক্ষণশীলদল মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করবে এবং তখন ব্রিটিশ লেবার দল যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে নীতি পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা করে তবে তাতে বাধা দিতে পারা যাবে। কারণ ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ওয়েভেল প্রস্তাব কার্য্যকরী করবার অঙ্গীকার করে বসে আছে। আমরা এখন যদি

এই প্রস্তাব গ্রহণ না করি এবং লেবার দল শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন ভারতীয় সমস্যা তারা আবার বিবেচনা করতে বাধ্য। তখন আমরা ভাল সর্ত্ত পাব। সংরক্ষণশীলদল ক্ষমতালাভ করলেও তাদের আবার আর একটা প্রস্তাব দিতেই হবে। কেননা, তখনও ভারতবর্ষের ব্যাপার আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা থেকে যাবে। সেটা ব্রিটেনের পক্ষে অসুবিধেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমরা আপোষ রফা করবার আবার সুযোগ পাব—যারা ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ করবার পক্ষপাতী এবং যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত নয় তাদের জন্যই আমি এ কথাগুলো বলছি।

গতকাল যা বলেছি আজ আবার তাই বলে আমি শেষ করছি। এই সঙ্কটসময়ে ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের জনগণের হাতেই, দায়িত্বও তাদেরই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নয়। তাই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করুন, প্রস্তাবটি ৫ই জুলাইয়ের আগেই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিন।

১৬। ওয়েভেল-প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা

(সিঙ্গাপুর থেকে ২২শে জুন, ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভারতের ভাইবোনেরা, শেষ খবর পেলাম যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিমলা বৈঠকে যোগ দেবার জন্য লর্ড ওয়েভেলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। যারা কংগ্রেসের বর্ত্তমান মনোভাব অবগত আছে তাদের কাছে এই খবর আশ্চর্য্যজনক কিছু নয়। ওয়াকিং কমিটির সভ্যদের বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত কি সে সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড প্রেসের রাজনৈতিক সংবাদদাতা মন্তব্য করেছে "বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের মতামতকে তিনটি বিভাগ করা যায়। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে একদল বড়লাটের বেতার-বক্তৃতায় বর্ণহিন্দু

কথাটি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে। মধ্যবর্ত্তী দল মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু প্রমুখেরা এই প্রস্তাবে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হবে তাতে খুসী নয়, তবে যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে এই প্রস্তাব সহায় হয় এবং বর্ত্তমানে দরিদ্রদের প্রকৃত উপকার করা যায় তবে প্রস্তাবটির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। মিঃ রাজাগোপাল আচারি ও মিঃ ভুলাভাই দেশাই মনে করেন যে সিমলা বৈঠকের প্রস্তাব এত ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক যে কংগ্রেসের কোনপ্রকার দ্বিধা অর্থহীন। তাঁরা বলছেন আর না খুঁড়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে দেখান হোক যে কংগ্রেস সত্যিই কাজ চায়।"

এত দূর থেকে এসোসিয়েটেড প্রেসের এই বিশ্লেষণ সত্য কি না বোঝা মুস্কিল; তবে সত্য হলে আমি আশ্চর্য্য হব না। বস্তুত কাল আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান মনোভাব সম্বন্ধে যা বলেছি এ বিশ্লেষণে তারই সমর্থন পাচ্ছি। দেখছি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাউকে আমন্ত্রণ করা হয়নি বলে এই বৈঠকের নিন্দা করেছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ থেকে মনে হয় যে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এ উক্তি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্যের কাছ থেকে সমর্থন পায় নি। বোধ হয় তাদের বক্তব্য এই যে বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তারা কোন কিছুই মতামত প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু তা বললে চলবে কেন, বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ও তার তাৎপর্য্য অতি পরিষ্কার। যারা বৈঠকে যোগ দিবেন তাদেরই পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধে যোগ দেবার পুরোপুরি যোগ দিতে তৈরী থাকতে হবে; কংগ্রেস যুদ্ধ সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছে যার জন্য ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছে, সেই নীতিই কংগ্রেসকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। উপরন্তু এই বৈঠকে যোগ দেবার অর্থ হচ্ছে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বড়লাট ও শাসন পরিষদের যে ক্ষমতা তা স্বীকার করে নিয়ে পরামর্শদাতা হিসাবেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব তারা পাবে না। এসম্বন্ধে লর্ড

ওয়েভেল কিছুই গোপন রাখেন নি, বরং তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে শাসন পরিষদের সদস্যদের তিনিই নিয়োগ করবেন। তাই, সদস্যেরা তাঁর কাছেই দায়ী থাকবে, আইন সভার কাছে নয়। সংখ্যাধিক্যের মতামত গ্রহণ করা অথবা যৌথ-দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নাই। এতএব যাঁরা সিমলা বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন তাঁদের স্বাধীনতার দাবী ছেড়ে দিতে হবে। আইন সভার কাছে দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী ছেড়ে দিয়ে শাসন পরিষদ ভারতীয়করণে খুশী হয়ে ১৯৩৫ এর শাসন আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কোন সন্দেহই নাই যে সিমলা বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার অর্থ যে "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গ্রহণের ফলে এখন হাজার ভাইবোন জেলে পচছে সেই প্রস্তাব সহ কংগ্রেসের সমস্ত নীতি ও পন্থা বিসর্জ্জন দেওয়া। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে একজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনায় যায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দেবার কথা বলেন নি, যদিও অনেকই ওয়েভেল প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন।

গতকাল আমি বলেছি যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মাত্র, কোটি কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা দেশের লোককে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শবিরোধী কাজ করবার ক্ষমতা এ কমিটির নাই। যে হেতু ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি নাই, এবং যেহেতু দেশেও এই ব্যাপারে কোন ঐক্য নাই, সেইজন্য এ, আই সি, সি অথবা সমগ্র কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে এমন একটা গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবার নৈতিক ক্ষমতাও ওয়ার্কিং কমিটির নাই, আইনত আছে কি না সে না হয় তুললাম না। নিজের দায়িত্বে সিমলা বৈঠকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই, কারণ সমগ্র প্রস্তাবটি কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের বিরোধী।

এত বড় একটা ব্যাপারে এ, আই, সি, সি, ও কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে ওয়ার্কিং কমিটি যে কত বড় একটা দায়িত্ব নিজেদের ওপরে নিচ্ছে

সেটা ভাল করে চিন্তা করে দেখবার জন্য আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবেদন করছি। কেন ওয়ার্কিং কমিটি এমন একটা জটিল কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছে আমি ভেবেই পাই না। লর্ড ওয়েভেল ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তাড়া আমি বুঝি। তাদের উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম লর্ড ওয়েভেল এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জানে যে ইঙ্গ আমেরিকার সাম্প্রতিক জয়ে ভারতবাসীরা বিস্মিত হয়েছে, এবং ইঙ্গ-আমেরিকানরা যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে এ ধারণা তাদের হয়েছে। এই মানসিক অবস্থার সুযোগ লর্ড ওয়েভেল ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করতে চায়, তাই এত তাড়া। তাদের মনে ভয় আছে যে কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবীর লোকে দেখতে পাবে যে জার্মাণীর পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের হারানো সহজ নয়। ৫ই জুলাই ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও লর্ড ওয়েভেল তার আগেই ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চান। এই তিনটি উদ্দেশ্য থেকেই বোঝা যায় লর্ড ওয়েভেল ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেন এত তাড়াহুড়ো করছেন। কিন্তু তাই বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেন ফাঁদে পা দেবে। ৫ই জুলাইয়ের আগে লর্ড ওয়েভেল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলতে কেন চান সে সম্বন্ধে আমি অগেও বলেছি, আবার আজ বলছি।

যদিও লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবে শ্রমিকদলের সম্মতি আছে, এই প্রস্তাব গৃহীত করাবার দায়িত্ব রক্ষণশীলদলের, বর্ত্তমান শাসনভার তাদের দলের অধিকাংশের হাতেই। কাজেই লর্ড ওয়েভেল যদি নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলতে পারেন তবে সেটা রক্ষণশীল দলেরই কৃতিত্ব হবে, এবং তার ফলে এই দল নির্ব্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে আবার শাসনভার হাতে নিতে পারবে। লর্ড ওয়েভেল সফল হবার পরে যদি শ্রমিকদলই শাসনক্ষমতা পায়, তবু সংরক্ষণশীলদল ভারতীয় সমস্যা পুনরায় উত্থাপন করতে বাধা দিতে পারবে। কিন্তু লর্ড ওয়েভেল

বিফল হলে সে ব্যর্থতা হবে রক্ষণশীল দলেরই। ফলে লেবার দল বেশী ভোট পাবে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সমর্থন লাভের জন্য শ্রমিকদলকে এমন কিছু করতে হবে যা রক্ষণশীল পারেনি, এই কারণেই তারা আবার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হলেও যদি রক্ষণশীলদল ক্ষমতা লাভ করে তবু তাদের আবার ভারতের ব্যাপার হাতে নিতে হবে। রক্ষণশীল দল মন্ত্রিত্ব নেবার পরেও যদি ভারতের অচল অবস্থা দূর না হয় তবে ভারতের ব্যাপার আন্তর্জ্জাতিক সমস্ত বৈঠকে তা আলোচিত হবে, এমন "বড় ত্রিশক্তির" বৈঠকেও তা আলোচনা হবে।

আমি দেশবাসীকে বুঝে দেখতে বলি যে রক্ষণশীল দল ভারতের ব্যাপারকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় পরিণত করতে সব রকমে বাধা দেবে। শেষ পর্য্যন্ত ওয়েভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ রফা করবার আরও একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, নির্ব্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন। সুদূর প্রাচ্যে দীর্ঘ দিনের জন্য কঠোর সংগ্রাম এখনও পড়ে রয়েছে, তাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষকে খুসী করতেই হবে।

আরও কিছু বলবার আগে আমি বলতে চাই যে ব্রিটিশদের 'ভারত-ছাড়া' করা ব্যতীত আপোষ করবার কিছু নাই। কিন্তু দেশে যখন অনেক লোকই আপোষ চায়, তখন কখন এবং কি ভাবে আপোষের কথা তুলতে হবে সেটা ভেবে দেখা তাদের কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে আমি বলছি যে সব চাইতে ভাল সময় হচ্ছে ৫ই জুলাইয়ের পরে। শ্রমিকদল যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবে তা মনে হয় না, তবু তাদের সঙ্গে রফা করলে ভাল সর্ত্ত পাবার সম্ভাবনা। লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করবার মাত্র দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত যদি স্বাধীনতা লাভ করবার কোনই সম্ভাবনা না থাকে ; ও দ্বিতীয়ত রফা করবার যদি এটাই শেষ সুযোগ হয়। প্রথমটি

সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে ইঙ্গ-আমেরিকানরা সম্প্রতি অনেক সাফল্য লাভ করলেও, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করবার সম্ভাবনা এখনই সব চাইতে বেশী হয়েছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমি বলছি যে দলই শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন ৫ই জুলাইয়ের পরে ভারতবর্ষ আরও একটা আপোষ আলোচনার সুযোগ পাবে।

আমার মতে তিনটি বিষয় এই যুদ্ধ শেষ হবার আগে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভের সহায়তা করবে। (১) ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন (২) ভারতের বাইরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম (৩) আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক আলোচনা। ভারতের অভ্যন্তরে নীতিগত বিরোধিতাই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের ব্যাপারটি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবে বজায় রাখতে পারলে কূটনৈতিক আলোচনা দিয়ে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হব। যে সব জাতি ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাদের কাছ থেকে রসদ ও অন্যান্য সাহায্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তারা হচ্ছে ব্রিটেনের শত্রু। বর্মায় সম্প্রতি পরাজিত হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অংশ কখনই যুদ্ধ করা বন্ধ করবে না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত শেষ সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করে যাব। আমরা যারা পূর্ব্ব-এশিয়ায় আছি তাদের পক্ষে যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করা দেশের লোকদের চাইতে সহজ, কারণ তারা ব্রিটিশের প্রচারে ভুলে মনে করে যে ইঙ্গ-আমেরিকানদের শক্তি খুবই বেড়ে গেছে। যদি দেশবাসীর আমাদের কথায় বিশ্বাস থাকে তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণ গ্রহণ করে কংগ্রেসের পন্থা পরিবর্ত্তিত করুন।

যে সব কংগ্রেসী ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করবার কথা ভাবছেন, তাদের পাঁচ লাখ দেশবাসীকে কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তারা ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ব্ব-এশিয়াতে যুদ্ধ করবার জন্য প্রেরিত হবে। শুধু তাই নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের

সঙ্গে দেশবাসীর যুদ্ধ করতে হবে কেন না আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশের সামনাসামনি হলেই যুদ্ধ করবে। এই সব কংগ্রেসীরা যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজেদের ভাইবোনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লজ্জিত না হন, তবু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য পাঁচ লাখ দেশবাসী কামানের মুখে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করতে পারেন। যাদের মনে সন্দেহ আছে যে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের শেষে স্বাধীন হতে পারবে কি না, তাদের আমি বলতে চাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবার এর চাইতে বড় সুযোগ আর আসবে না। চক্রশক্তির জয়ে যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন এবং পৃথিবীর নূতন ব্যবস্থায় তার যথাযোগ্য স্থান নিতে পারবে, এশিয়া থেকে ইংরেজ ও আমেরিকার প্রভাব দূর করতে পারবে। যদি জাপান হেরেও যায়, তবে ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার আরও একটা সুযোগ আসবে। কিন্তু আমাদের দেশের যুবশক্তিকে এই ভাবে বলি দিতে রাজী হওয়া, দেশের সম্পর্কে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিয়োজিত হতে দেওয়া হবে অপরাধ। তাই আপনাদের কাছে আমি আবেদন করছি আপনার ওয়েভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ-শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং তার পরে অবস্থা অনুযায়ী কার্য্যক্রম স্থির করবেন। কংগ্রেসের নেতাদের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন হুড়মুড় করে রফা করতে না ছোটেন।

১৭। ওয়েভেল-প্রস্তাব বর্জ্জন করুন

(অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে ২৩ জুন, ১৯৪৫ এর বক্তৃতা)

ভারতের ভাই বোনেরা, আমি কাল আপনাদের বলেছি যে নীতির দিক থেকে ও কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রের দিক থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এ, আই, সি, সি অথবা সমগ্র কংগ্রেসের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

অন্যায়। আমার বলা উচিত ছিল যে তেমন কিছু করা অবিবেচনার কাজও বটে। বাইরের লোকের কাছে ওয়ার্কিং কমিটির এই তাড়াটা দৃষ্টিকটু ঠেকবে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির তুলনায় মিঃ জিন্না অনেক ধীরে ও সাবধানতার সঙ্গে এগোচ্ছেন। যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা থেকে দেখছি যে তিনি বলেছেন, ২৪শে তারিখে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে তিনি মুসলিম লীগের সভ্যদের সিমলা বৈঠকে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে না। মিঃ জিন্নার প্রকৃত উদ্দেশ্য যাই হোক লর্ড ওয়েভেল প্রস্তাব করবামাত্র তিনি লাফিয়ে ওঠেন নি। লর্ড ওয়েভেলকে এই বৈঠক স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করে তিনি আর একটি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার মনে হয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও যদি সিমলা বৈঠক স্থগিত রাখবার জন্য চাপা দিত তবে লর্ড ওয়েভেলের আর কোন উপায় থাকত না। যাই হোক, ওয়াকিং কমিটি বৈঠকে যোগ দেবার আগে এবং বৈঠকের সময় যে আলোচনা করবে স্থির করেছে এটা ভাল। যদি মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের পরামর্শ দেবার জন্য কয়েকজন ওয়ার্কিং কমিটি সিমলা রওনা দিতেন তবে সেটা খুবই অবিবেচনার কাজ হত। তেমন করলে মনে হত ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশের প্রস্তাব গ্রহণ করতে যেন উদ্‌গ্রীব। এখন খানিক সময় পাওয়া গেছে, কাজেই আমি আশা করি চূড়ান্ত মতামত দেবার জন্যে এ, আই, সি, সির একটা অধিবেশন আহ্বান করা হবে। কয়েকজন এ, আই, সি, সির সভ্য এখন জেলে-এই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করলেই ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না।

যদি মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটি দাবী করেন তবে বড়লাট তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন এবং এই ব্যাপারে অন্তত কংগ্রেসের কথা রাখতে বাধ্য হবেন। যদি বড়লাট এ, আই, সি, সির

সভ্যদের ছাড়তে রাজী না হন তবে তাঁর আন্তরিকতা ধরা পড়ে যাবে।

ওয়েভেল প্রস্তাব বিবেচনা করবার জন্য এ, আই, সি, সির সভা ডাকতে বলছি বলে আমি এটা মনে করি না যে এ, আই, সি, সির বর্ত্তমান সভ্যেরা আমাদের জাতীয় মতামত প্রকাশ করতে সক্ষম। কংগ্রেসের উচ্চতম ব্যবস্থা পরিষদ ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছেন বলে যে সব এ, আই, সি, সির সভ্য আন্দোলন করেছিলেন, সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াতে এ, আই, সি সির প্রতিনিধি-মূলক রূপ নষ্ট হয়ে গেছে। বহু পুরাতন কর্ম্মী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করতে বলেছিলেন বলে তাদের কংগ্রেস থেকে বার করে দেওয়া হল অথচ রাজাগোপাল আচারির মত ব্যক্তি যারা প্রকাশ্যে বিনা সর্ত্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য আন্দোলন করলেন তাদের কিছুই করা হল না, এটা কি কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের অন্যায় নয়, বা তাদের এই কাজ হাস্যকর নয়? ভুলাভাই দেশাই গত সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনে যোগ দেন নি, তবু তাঁকে কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতা নির্ব্বাচন করা কি হাস্যকর নয়? সেই যাই হোক, আমি এ, আই, সি, সি-র সভাতে এই গুরুতর বিষয়টি আলোচিত হতে বলছি তার কারণ এ নয় যে এ, আই, সি, সি-তে অনেক দল আছে; আমার বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটাই হবে সঠিক পন্থা। সমস্যাটি কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী ও মূলনীতিতে আঘাত করবে। বিশেষ করে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ব্যাহত করবে, কাজেই তেমন সিদ্ধান্ত করবার অধিকার জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরই মাত্র আছে।

আমি আগেই বলেছি মহাত্মা গান্ধী যদি খুব সাবধান না হন তবে বড়লাট ও মিঃ জিন্না এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে যখন বর্ণহিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোর জন্য সদস্য মনোনীত করতে কংগ্রেস

বাধ্য হবে। অন্য ভাষায় বলা যায় যে অবস্থা এমন হয়ে উঠতে পারে যখন মহাত্মাজী স্বীকার বাধ্য করতে হবেন যে কংগ্রেস এবং বর্ণহিন্দু একই ব্যাপার। সেটা হবে কংগ্রেসের মৃত্যুরই মত—ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

সিমলা বৈঠকে যদি কংগ্রেস প্রতিনিধিরা এক জঙ্গীলাটের নাম বাদ দিয়ে আর সব কটি আসনের জন্য নাম দাখিল করেন তবেই এই বিপদ এড়ানো যেতে পারে। আমি জেনে সুখী হয়েছি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে চিন্তা করছেন। কিন্তু চিন্তা করলেই শুধু চলবে না। বড়লাটের কাছে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের এই দাবী করতে হবে যে ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তি পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক ও জাতীয় ভিত্তিতেই শাসন পরিষদ গঠন করতে হবে। আমাদের সম্মুখে কি অসুবিধা রয়েছে তা বিস্মৃত হলে চলবে না। আমি বরাবরই মনে করি যে শান্তি বৈঠকে শুধু যুধ্যমান জাতিদেরই মিলিত হবার অধিকার আছে। সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের প্রথম সোপান হিসাবে ব্রিটিশ এখন শাসন পরিষদ অংশত ভারতীয়করণে রাজী হয়েছে তার কারণ মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রভাব নয়, কারণ হচ্ছে কংগ্রেস সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে।

১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমি বলেছিলাম যে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে যারা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে তারাই গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকরী। দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এমনি একটা ব্যাপারে ডি, লয়েড জর্জ্জ আয়ার-লণ্ডের সিন ফিন দলকে চালে মাত করবার চেষ্টায় আয়ারলণ্ডের সমস্ত দলকে নিয়ে একটা জাতীয় বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলন আয়ারলণ্ডের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না—এই কারণে সিন ফিন দল তাতে যোগ দেয় নি। সিন ফিন দল তাদের সংগ্রাম সমান চালিয়ে যায় অবশেষে এমন দিন আসে যখন শুধু সিন ফিন

দলের প্রতিনিধিদের এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করতে ব্রিটিশ বাধ্য হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে যারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করছে তারাই শুধু গোল টেবিল বৈঠকে ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। উপরন্তু, মুসলিম লীগের এত প্রতিপত্তির কারণ হচ্ছে যে তারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পোষকতা লাভ করছে। মুসলিম লীগকে এতটা প্রাধান্য দিয়ে জমিয়েত-উল-উলেমা, মজলিস-ই-অর্হর, খুদাই খিদমতগার, আজাদ মুসলিম লীগ, সিয়া কনফারেন্স, প্রজা পার্টি, মোমিন পার্টির মত পুরাতন বন্ধুভাবাপন্ন দলগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। এ সব ছাড়া কংগ্রেসে, বহুসংখ্যক মুসলমান আছেন যাঁরা বহু স্বার্থ ত্যাগ করে জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ বজায় রেখেছেন।

যে সব সংবাদ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় বিভিন্ন দল ওয়েভেল প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছে। দুঃখের বিষয় এই মতগুলো একত্রে করা হয় নি। ১৯৪০ সালে যখন এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে কংগ্রেস আপোষ রফার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা রামগড়ে এক আপোষ বিরোধী সম্মেলন করেছিলেন। যেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিপন্থীদল তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছে। এ রকম আরও একটা সম্মেলন অবিলম্বে আহ্বান করা দরকার। ওয়েভেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে. সংগ্রাম ও বিরোধিতা সংহত করবার জন্য যদি এখন একটা ওয়েভেল-প্রস্তাব বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা যায় তবে খুবই উপকার হয়। এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে ভারতের সর্ব্বত্র সভা করে ওয়েভেল প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রকৃত মতামত ব্যক্ত করা উচিত। ৫ই জুলাই ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচনের দিনে 'নিখিল ভারত ওয়েভেল প্রস্তাব-বিরোধিতা দিবস' পালন করবার উপায়টি মন্দ নয়।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা ৪ঠা জুলাই একটি উৎসব করব। ৪ঠা জুলাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হিসাবে জ্ঞাত। পূর্ব্ব-

এশিয়ায় ৪ঠা জুলাই তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ এক নূতন দৃষ্টি দিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যেখানে যত ভারতীয় আছে তারা একত্রিত হয়ে উৎসব করবে—তাদের মত গ্রহণ করা হবে। পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের আমরা ওয়েভেল প্রস্তাব সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে আহ্বান করব। যদি এই প্রস্তাবের নিন্দা করাই মত হয়, তবে এমন কি যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তথাপিও সর্ব্ব অবস্থায় আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ভাই বোনেরা, আজকার মত আমি শেষ করছি। সোমবার ২৫শে জুলাই আমি ভারতের বিপ্লবীদের আবার সম্বোধন করব, এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ওয়েভেল প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাদের কর্ত্তব্য কি হবে তাও বলব। বড়লাট আসবে, বড়লাট যাবে, কিন্তু ভারতবর্ষ থাকবে চিরদিন, তার স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হবে।

জয় হিন্দ

১৮। ব্রিটেনের সঙ্গে কোন আপোষ নাই

(সিঙ্গাপুর থেকে ১৯৪৫, ২৪শে জুন তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা)

বন্ধুগণ, প্রায় ছ মাস পরে আবার আপনাদের কাছে বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্বন্ধে বলতে উঠেছি। বর্মা থেকে আপনাদের কাছে শুভ সংবাদ নিয়ে আসতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। গত বছর ইম্ফলে আমাদের ব্যর্থতার পরে শত্রুরা বর্মায় অগ্রসর হতে পেরেছে। শত্রু সৈন্যের প্রধান অংশকে জাপানী বাহিনী ও আজাদ হিন্দের সৈন্যেরা অবশ্য ঠেকিয়ে রেখেছে, তবু শত্রুর ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর বাহিনী আমাদের রক্ষা ব্যূহ ভেদ করে আমাদের প্রধান ঘাঁটি আক্রমণ করতে উদ্যত। এটা আমাদের অচিরে স্থির করা প্রয়োজন

হয়ে পড়ে যে প্রধান ঘাঁটি যথাস্থানে রেখে শত্রুকে আক্রমণ করবার সুযোগ দেব না, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে তা স্থানান্তরিত করব। আজাদ হিন্দ ফৌজের কমরেডদের ফেলে রেখে রেঙ্গুনের বিপদসঙ্কুল স্থান পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা অনেক চিন্তা করে স্থির করেন যে বিশেষ কারণে আমাদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াই ভাল।

রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেও আমাদের প্রধান ঘাঁটি বর্মায় রাখা সম্ভব ছিল, যেমন বর্মী আদি পদি গভর্ণমেণ্টের নেতা ডাঃ বা ম করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেটা করা উচিত বিবেচিত হয় নি। বর্মার অবস্থা এখন এইরূপ: সান রাজ্যের সর্ব্বত্র যুদ্ধ হচ্ছে, টুঙ্গু ও প্রোমের কাছে এবং আরাকানে যুদ্ধ হচ্ছে। শত্রুসৈন্যের প্রধান অংশ এখনও আটকে আছে, কিন্তু কতদিন ধরে যুদ্ধ হবে বা কবে শত্রুরা বর্মা দখল করবে তা বলা যায় না। জাপানী বাহিনীর তুলনায় আজাদ হিন্দের ফৌজের সংখ্যা যদিও কম, তবু অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের কমরেডরা অপূর্ব্ব শৌর্য্যের সঙ্গে লড়াই করছে। আমাদের যে কমরেডরা এখন বর্মায় যুদ্ধ করছে তাদের সাথে আমাদের ফৌজের একটা প্রধান অংশ রয়েছে। আমরা বর্মা ছেড়ে আসায় জেনারেল লোকনাথন এবং চীফ অফ স্টাফ লেঃ কর্ণেল আরশাদের নেতৃত্বে নবগঠিত বর্মা-কম্যাণ্ডের অধীনে এখন এই ফৌজ আছে।

বর্মার বাহিরে শক্তি সংহত করবার জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান ঘাঁটি বর্মা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে যেখান থেকে আরও অন্যান্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালানো যাবে। বর্মার বাহিরে যদি আমাদের আর কোন সেনাবাহিনী না থাকত তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কমরেডদের সঙ্গে বর্মায় থেকে যেতাম এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতাম। আরও একটি কারণে আমাদের বর্মা

থেকে প্রধান ঘাঁটি সরাতে হয়েছে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সাম্প্রতিক সাফল্যের পরে আমাদের শত্রুরা আরও নানা দিকে সামরিক ও রাজনৈতিক অভিযান আরম্ভ করবে। সময় থাকতে এ অভিযানের বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে য়্যুরোপের বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্মাতেও বিপর্য্যয় দেখা দিল। শত্রুরা তারই সুযোগ নিয়ে রাজনীতির দিক থেকে ভারতের উপর অভিযান আরম্ভ করেছে। এই অভিযান হচ্ছে ওয়েভেল-প্রস্তাব।

ওয়েভেল-প্রস্তাবের পেছনে প্রধানত দু'টো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত আগামী পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষের সাহায্য লাভ করা। দ্বিতীয়ত ভারতবাসীদের সঙ্গে আপোষ করে ফেলে ভারতীয় সমস্যা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে পরিণত করা। লোক, অর্থ ও উপকরণ দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটেনকে আমেরিকার সহায়তা করতে হবে। ব্রিটিশ বাহিনী এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী রণক্লান্ত, তারা সুদূর প্রাচ্যে দীর্ঘকাল অভিযান চালাতে রাজী নয়, কারণ য়্যুরোপের চাইতে এ সব দেশের অবস্থা অনেক খারাপ। কাজেই কামানের মুখে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত সংখ্যক লোক একমাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যেতে পারে। ভারতবাসীদের সম্পদ ও শক্তি সংহত না হলে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগরিত না হলে, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য যত লোক দরকার তা ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া যাবে না। লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবের পেছনে অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় সমস্যা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে পরিণত করা, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন অন্য কোনও রাষ্ট্র ভারতীয় সমস্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মিত্রশক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে এত বক্তৃতা করেছে যে পরাধীন জাতির-তার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছে। সিরিয়া এবং লেবানন তার দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট

পররাষ্ট্র সচিব সানফ্রানসিসকোতে ভারতের প্রতিনিধিদের স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে সেদিন অদূরে যখন স্বাধীন ভারতের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুনতে পাওয়া যাবে। এই উক্তি ব্রিটেনের কাছে সতর্কতাচসূক। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছেন যে যদি ভারতবাসীর সঙ্গে আপোষ না হয়, তবে ভারতবর্ষের ব্যাপার আন্ত-র্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবেই সকলে দেখবে এবং ভারতবাসীরা যদি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না-ও করে তবু বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলো ভারতের স্বাধীনতার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে।

আপনারা যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নীতি বুঝতে চান, তবে এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে ব্রিটেন বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে ভারতের স্বাধীনতার দাবী নিয়ে কোন কথা বলতে দিতে চায় না। এইজন্যই আমাদেরও নীতি হওয়া উচিত যে আমরা কোনক্রমেই ভারতীয় সমস্যা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ঘরোয়া সমস্যায় পরিণত হতে দেব না। তার জন্য একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও রকম আপোষে বাধা দিতে হবে।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক বছর আগে যখন লীগ অফ নেশ্যনের অস্তিত্ব ছিল তখন স্বর্গীয় ভিট্ঠলভাই প্যাটেল ও আমি ভিয়েনায় লীগ অফ নেশ্যনের কাছে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লীগ অফ নেশ্যনের কোন সভ্যই ভারতের স্বাধীনতার সমর্থন করে ব্রিটেনের বিরাগভাজন হতে রাজী হয়নি বলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তার পর থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। পৃথিবীর মতামতের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠাবার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশী। জাপান এবং আরও আটটি দেশ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করেছে, তার ফলে পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাব আলোচনা করবার আগে আমি জাগতিক

পরিস্থিতি আলোচনা করব। ছ' মাস আগে আমি যা বলেছিলাম, জার্মাণীর পরাজয় হওয়াতে সোভিয়েট ও ইঙ্গ-আমেরিকানদের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে তারা য়্যুরোপে একটা মীমাংসা করেছে বটে, কিন্তু এশিয়ায় তা আবার পুরামাত্রায় দেখা দেবে। সাময়িক মীমাংসা সত্ত্বেও এই দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক বিভেদ আছে এবং তা কখনই দূর হতে পারে না। জার্মাণী পরাজিত হওয়াতে য়্যুরোপে ইঙ্গ-আমেরিকানদের চাইতে সোভিয়েটের প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে।

আমেরিকা এখন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য চাইছে। আমার মতে পূর্ব্ব-এশিয়াতে দু'টো প্রধান যুদ্ধ হবে। একটা জাপানে, অপরটি হবে চীনে। এ দুটোর কোনটি আগে হবে আমি তা এখন বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে, দুটো যুদ্ধের জন্যেই জাপান তৈরী। আমি এও জানি যে পূর্ব্ব-এশিয়ায় সর্ব্বত্র জাপানী সৈন্যদের সম্পূর্ণ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে এক জায়গায় পরাজিত হলেও অন্যত্র জাপানের সংগ্রামের শক্তি ব্যাহত হবে না। ইঙ্গ-আমেরিকানরা স্পষ্ট জানে যে তাদের দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন প্রধান ব্রিটিশ সেনানায়ক ব্রিটিশ ১৪শ আর্মির জেনারেল স্লিম সেদিন ইংলণ্ডে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করব সব জাতিই বলে, কিন্তু একটি মাত্র জাতি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে—সে হচ্ছে জাপান। জাপান সব অবস্থাতেই যুদ্ধ করবে। আমরাও আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

ব্যক্তিগতভাবে আমার গভীর সন্দেহ আছে যে পূর্ব্ব-এশিয়ার ব্যাপারে মার্শাল স্টালিন, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মিঃ চার্চিলের মধ্যে

কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে কি না। আমার মনে হয় না যে চুংকিং ও ইয়েনানের মধ্যে বিভেদ এবং চীনে আমেরিকার স্বার্থ আছে বলে চীনের সমস্যা সমাধান হওয়া সহজ। কি করে যে এই তিনটি শক্তির ভেতরে মিল হবে তা আমি বুঝতে অক্ষম। আমার মনে হয় যে ইয়েনান গভর্ণমেণ্টের চুংকিং-এর চাইতে নানকিংয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া তবু সহজ। কিন্তু যতদিন চুংকিংএর ওপরে আমেরিকার প্রভাব থাকবে ততদিন চীনের ঐক্য সম্ভব নয়। জাপানের চীন সম্বন্ধে নূতন নীতি ও যুদ্ধ শেষ হলে চীন থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণ করা হবে এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে জাপান চীনের ঐক্য চায়, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চীন থেকে ইঙ্গ আমেরিকান প্রভাব দূর করা। প্রত্যেক ভারতবাসীর চীন সম্বন্ধে শুভেচ্ছা আছে। তারা চায় চীন ঐক্যবদ্ধ হোক, ডাঃ সান ইয়াৎ সেন চীনের অগ্রগতির যে কার্য্যক্রম স্থির করে দিয়েছেন সেই পথে অগ্রসর হয়ে শক্তিলাভ করুক। স্বাধীন চীন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ ছাড়া স্বাধীন এশিয়া কল্পনাতীত।

বর্মায় আমাদের সাম্প্রতিক পরাজয় সত্ত্বেও আমাদের আশা ও বিজয় সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস অব্যাহত আছে। যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে তার তিনটি কারণ বর্ত্তমান! প্রথম পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কূট নৈতিক সম্বন্ধ, তৃতীয় ভারতবর্ষের ভেতরে আন্দোলন। ভারতবর্ষের ভেতরে আন্দোলন যত তীব্র হবে তত শীঘ্র যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করব তা না বললেও চলে। যদি এই আন্দোলন শুধুই নীতিগত হয় তবু ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় থেকে যাবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিষয় আলোচিত হবার সুযোগ থাকবে। আমাদের পক্ষে বড় কথা পূর্ব্ব-এশিয়ায় তীব্র সংগ্রাম চালানো। তার দুটো ফল হবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত এই সংগ্রাম বিশেষ

ভাবে প্রভাবান্বিত করবে এবং দেশে শক্রর প্রচারের ফলে যে পরাজয়ের মনোভাব দেখা দিয়েছে তা দূর করবে। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা জগত সমক্ষে দেখাতে পারব এবং আমাদের মিত্রশক্তিদের কাছ থেকে সমর্থন পাব। সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হলে আমাদের বিজয় সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে গত যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সেনানায়ক মার্শাল ফস যা বলেছিলেন তাই আবার বলতে চাই। জয় পরাজয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্শাল ফস বলেন, "সেই শত্রুই পরাজিত হয় যে মনে করে যে পরাজিত হয়েছি, কোন এক বিশেষ রণক্ষেত্রে পরাজয়ে সত্যিকার পরাজয় হয় না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি যে ১৯৪২। ব্রিটিশ বর্মা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, কিন্তু আবার তারা বর্মায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। কে বলতে পারে যে বর্মায় আমরা যা হারিয়েছি তা আবার দখল করতে পারব না। বর্মা ত্যাগ করবার সময় আমি আমার কমরেডদের মার্শাল ফসের এই উক্তি স্মরণ করিয়ে দিই, এবং বলি যে আমাদের আদৌ পরাজয় হয় নি, কারণ পরাজিত হয়েছি বলে আমরা কেউ মনে করি না অথবা যুদ্ধে হার হয়ে গেল তাও মনে করি না।

সেই প্রকৃত বিপ্লবী যে কখনও পরাজয় স্বীকার করে না, কখনও হতাশ হয় না বা দমে যায় না। প্রকৃত বিপ্লবীর নিজের সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস এবং স্থির জানে যে তার উদ্দেশ্য সফল হবেই। যদি যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে আমাদের হার হয়েছে, তবু আমরা দেখছি যে শত্রুর দেশেও আমাদের সংগ্রাম-প্রভাব পড়েছে। বর্মায় এসে শত্রু আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু দেখবে ও শুনতে পাবে। শত্রুরা আমাদের বলতো জাপানের পোষা বাহিনী। বর্মায় ঢুকে তারা বলছে জাপানী দ্বারা উদ্বুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। এখন শুধু বলে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী।

মান্দালয় দখল করবার পরে ব্রিটিশ একটা আদেশ জারি করেছিল যে কোনও ভারতীয় 'জয় হিন্দ' বলে কাউকে অভ্যর্থনা করতে পারবে না। কারণ জয় হিন্দ অর্থ হচ্ছে ভারতের বিজয়। তার ফলে মান্দালয়ে আমাদের বালক সেনাবাহিনী পথে বেড়িয়ে এসে ব্রিটিশ অফিসারদের উদ্দেশ্যে জয় হিন্দ ধ্বনি করতে থাকে। এ সব কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যদি আমরা আমাদের রক্তপাত করে সংগ্রাম করতে পারি তা হলে নিরুৎসাহী দেশবাসীর মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে ত' পারবই, উপরন্তু আমাদের শত্রুর মনে দাগ এঁকে দিতে পারব।

এবারে ওয়েভেল-প্রস্তাবের কথাই আলোচনা করা যাক। এ প্রস্তাবে তিনটি বিষয় আছে, প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন, দ্বিতীয় বড়লাটের শাসন পরিষদে অধিকতর আসন, তৃতীয়ত প্রদেশে মন্ত্রীদের স্থাপনা। এই প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছু নাই যা জাতীয়তাবাদী কোন ভারতবাসীর পছন্দ হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন কংগ্রেসসেবীও এই প্রস্তাব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। প্রথমত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চিরকালই স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গীকার করেছে। দ্বিতীয়ত শাসন পরিষদের সভ্যদের দায়িত্ব একমাত্র বড়লাটের কাছে ছাড়া আর কোথাও নয়, তাই শাসন পরিষদে বেশী সংখ্যক আসন পেলে আমরা আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতার দিকে একটুকুও এগোব না। উপরন্তু বড়লাটের ভেটো দেবার ক্ষমতা থাকবে, তার বলে শাসন পরিষদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবই তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে শাসন পরিষদ মন্ত্রী সভার মত কাজ করবে না, তার কাজ হবে পরামর্শদাতার, আসল ক্ষমতা বড়লাটেরই থেকে যাবে।

তৃতীয়ত, প্রদেশে মন্ত্রীদের স্থাপনার কোন গুরুত্বই নেই। কারণ ১৯৩৯ সালে ব্রিটেনের যুদ্ধের বিরোধিতা করে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে।

দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমানে সব ভারতীয় নেতারা জেলের বাইরে আছেন, তারা ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তির সাম্প্রতিক জয়ে একেবারে ঘাবড়ে গেছেন এবং তাঁদের মনে একটা পরাভূত-ভাব এসে পড়েছে। তাই মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটি ওয়েভেল-প্রস্তাব আলোচনা করবার জন্য ২৫শে জুন সিমলা সম্মেলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণে দেশবাসীকে অসম্মত করতে যা কিছু করা সম্ভব আমরা সেটা করছি, যাতে সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হয়। আমরা যদি সফল না হই এবং ওয়ার্কিং কমিটি ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন আমরা দেশে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে দেখতে পাব যখন কংগ্রেস শাসন পরিষদের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টায় আমরা বাধা দেব সঙ্কল্প করেছি; আমরা চাই ভারতীয় সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে থেকে যাক তা হলে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আমরা কাজ করতে পারব।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের দুটো কাজ। প্রথমত ১৯৪৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমরা যে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছি তা চালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয়ত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করা এবং তথাকথিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আভ্যন্তরিক বিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা, বিশেষ করে সোভিয়েট য়্যুনিয়নের সঙ্গে ইঙ্গ-আমেরিকার বিরোধের সুযোগ নেওয়া। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ করবার জন্য মালয় হবে আমাদের ঘাঁটি। যতদিন পর্য্যন্ত মালয় থেকে ব্রিটিশদের হঠিয়ে রাখা যাবে ততদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিনা বাধায় চলবে। অতএব মালয়ে ব্রিটিশ নামবার চেষ্টা করলে সর্ব্বশক্তি দিয়ে আমাদের বাধা দিতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস যখন রচিত হবে, মালয়ের ভারত-বাসীদের তাতে এক গৌরবময় উল্লেখ থাকবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মালয়ের ভারতবাসীরা লোক, অর্থ ও সম্পদ দিয়ে যে সাহায্য

করেছে তার তুলনা নাই। ভারতবর্ষ সেজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। মালয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের উৎপত্তি। মালয় থেকে বহুসংখ্যক যুবক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বাহিনীতে অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করেছে, মালয় থেকেই ঝাঁসীর রাণী সব চাইতে বেশী মেয়ে যোগ দিয়েছে। মালয়ের ভারতবাসীরা তাদের এই আদর্শ যেন বজায় রাখে। মালয় থেকেই প্রথমে সমস্ত ভারতবাসীকে সংহত হতে আহ্বান করা হয়েছে।

আজ আপনাদের কাছে আমি আরও লোক, আরও অর্থ আরও সম্পদের জন্য আবেদন করছি। বর্মায় সম্প্রতি পরাজয়ের পরে আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। অতীতে আপনারা কি করেছেন তা আমি জানি, কাজেই ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী যে আপনারা করবেন তা আমি জানি। শুধু আমাদের মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনাদের অবিচলিত বিশ্বাস রাখতে হবে। এই বিশ্বাস যতদিন থাকবে ততদিন আপনাদের উৎসাহ এবং শেষ পর্য্যন্ত জয় সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে। *

জয় হিন্দ

১৯। ব্রহ্ম শাসননীতি

(সিঙ্গাপুর থেকে ২৫শে জুন, ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

ব্রহ্মের লোকের মোহমুক্তির প্রথম পর্য্যায় উপস্থিত। সদ্য অর্জ্জিত স্বাধীনতার বদলে বর্মীরা পাচ্ছে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত এক নতুন আইন। এই আইনে স্বায়ত্ত শাসনে অস্পষ্ট, চিরাচরিত অঙ্গীকার আছে।

---

* সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক বিরাট সভায় নেতাজী ২৪শে জুন, ১৯৪৫ সালে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই সারাংশ। এই সারাংশ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের রেডিও থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছিল।

এখন তারা পাবে একটা শাসন পরিষদ যার দায়িত্ব বর্মীদের কাছে অথচ আইন সভার কাছে নয়, দায়িত্ব হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার কাছে। কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী লোক এবং কয়েকজন ব্রিটিশকে এই পদগুলো দেওয়া হবে। আইন পরিষদ নামে এক বিতর্ক সভা থাকবে। যাদের শাসন কর্ত্তা অথবা শাসন পরিষদের ওপরে কোনই প্রভাব থাকবে না, যারা শুধু কথা বলতে ভালবাসে তাদের পক্ষে এই সভা হবে খুবই আমোদের জিনিষ।

সামান্য কিছুদিনের জন্য হলেও স্বাধীনতা উপভোগ করবার পরে বর্মীরা এই সব ভাঁওতাবাজীতে ভুলবে বলে যদি ব্রিটেন মনে করে থাকে, তবে পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে বিতাড়িত হবার পরে এই দীর্ঘ দিনে তারা কিছুই শেখেনি বলতে হবে। বলা বাহুল্য, বর্মীদের মোহ যেভাবে মুক্ত হচ্ছে সেটা পূর্ণ হবে যখন তারা দেখবে যে ব্রিটেনের এই স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি অতীতের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ছাড়া বেশী কিছু নয়। এই অবস্থা হলে বর্মীরা আবার ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, যে অস্ত্রে কিছুদিন আগে তারা স্বাধীনতা উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল।

কৌতুহলের বিষয় বর্মার জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে কোন কথাই নেই। স্বাধীন বর্মার ছোট হলেও সেনা বাহিনী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ মুক্তিদাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। ব্রিটিশেরা যদি মনে করে থাকে যে বর্মীদের এটা নজরে পড়বে না, তবে তারা ভুল করবে। ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের চলতি টাকা বাতিল করে দিয়েছে। এটা থেকেও তাদের চোখ খুলবে। এটা ত জানা কথা যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটি শাসন পরিবর্ত্তিত হয়ে নূতন শাসন স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত চলতি টাকাই বাজারে চলে যতদিন নূতন টাকা চালু না হয়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বর্মার চলতি টাকা বাতিল করেছে বলে আমি এক হিসেবে খুসীই হয়েছি,

কারণ এর ফলে দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হবে এবং ফলে বর্মীদের ক্রোধের উদ্রেক হবে।

ভারত ও ব্রহ্ম সচিব মিঃ আমেরি ও প্রধান মন্ত্রী যে প্রস্তাব করেছেন তার চাইতে খারাপ কিছু আর কল্পনাই করা যায় না। আমি আশা করি যে এই ধরণের ভুল তারা আরও করবে যার ফলে বর্মার অনিবার্য্য বিপ্লব আশাতীতভাবে এগিয়ে আসবে। পার্লামেণ্টের কাছে উপস্থাপিত এই আইন রাজনীতির দিক থেকে বর্মাকে ১৯০৯ সালে ঠেলে দেবে, অর্থনীতির দিক থেকে এর আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে বর্মা অয়েল কোম্পানী, বর্মা কর্পোরেশন, এবং অন্যান্য ব্রিটিশ ফার্ম যে শোষণ চালাতো তা অব্যাহত থাকবে। বর্মীরা যুদ্ধের আগেকার অর্থনৈতিক অবস্থা চুপ করে মেনে নেবে এ কথা যারা মনে করে তারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়েছে বলতে হবে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে কোয়ালিশন মন্ত্রিপরিষদের এই ব্যবস্থা শ্রমিকদল সমর্থন করেছে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের মত পরাধীন দেশে অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলে যে কোনই প্রভেদ নেই এটা তারই একটা প্রমাণ—অবশ্য তা বুঝতে কোন প্রমাণই দরকার করে না। যে সব ভারতীয় মনে করেন যে শ্রমিকদল ক্ষমতা লাভ করলে ভারতবর্ষের স্থবিধা হবে তাঁরা ব্রহ্মের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই যে রক্ষণশীল-দলই শাসনভার লাভ করুক, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাড়নায় ভারতের জনগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবে।

২০। জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা

(সিঙ্গাপুর থেকে ১৯৪৫ সালে ২৬শে জুন তারিখের প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভারতবর্ষ এক রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে; এ সময়ে যদি একটা ভুল পদক্ষেপ করা হয় তবে আমাদের স্বাধীনতার পথে সেটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আমার মনে আজ কি পরিমাণ চিন্তা জমা হয়েছে তা আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না। আমার চিন্তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের স্বাধীনতা দৃষ্টিপথেই রয়েছে অথচ একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপে তা সুদূরে চলে যাবে। প্রথমেই বলে রাখি যে ভারতবর্ষে শত্রুর প্রচার এতটা সফল হয়েছে যে প্রভাবসম্পন্ন নেতারা যাঁরা এক সময় মনে করতেন স্বাধীনতা করায়ত্ত যাঁরা স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন পণ করেছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ এখন বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য কিছু হবার জন্য উদগ্রীব।

অস্ত্র ধা্যারা ভারতবর্ষের বাইরে আছি, আমরা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা করতে সক্ষদের স্বদেশবাসী অপেক্ষা অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখি। আমরা কৌতূহবি তাই আজ আপনাদের কাছে বলা কর্তব্য মনে করি। রেঙ্গুণ নেই। .ক আমাদের প্রধান ঘাঁটি সরিয়ে নেবার পরে বর্মার অন্যত্র ঘাঁটি মুক্তি-স্থাপন করতে আমরা পারতাম। কিন্তু আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে য়্যুরোপ ও বর্মায় সাম্প্রতিক সাফল্যের পর শত্রুরা শীঘ্রই রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযান সুরু করবে। এই অভিযানকে বাধা দেবার জন্য আমাদের দাঁড়াতে হবে। কাজেই আমাদের এমন এক জায়গা বেছে নিতে হবে যেখান থেকে ভারতবাসীর কাছে দরকার হলে বার্ত্তা পাঠানো যায়। সেই জন্যই আমরা আজ শোনান যার নাম সিঙ্গাপুর—এখানে এসেছি।

ভারতে আজ এই সঙ্কট উপস্থিত হবার কারণ মাত্র তিন বছর আগে আমাদের যে সব দেশবাসী "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু" এই ধ্বনি

জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁদেরই অনেকে আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ওয়েভেল-পরিকল্পনার ভিত্তিতে আপোষ করবার জন্য উন্মুখ। এই মনোভাব উপস্থিত হবার কোন কারণ ঘটেনি দুটি দিক থেকে তা বোঝা যায়। প্রথম স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন আপোষ চলে না, দ্বিতীয়ত যে রকম আমাদের দেশবাসী কল্পনা করেছেন অবস্থা মোটেই সে রকম নয় অথবা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিরোধিতা চালিয়ে যাই তবে এই যুদ্ধ শেষে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করবই।

যারা এখন আমার এই বক্তৃতা শুনছেন তাদের মনে যদি এমন কোন সন্দেহ হয়ে থাকে যে আমি পৃথিবীর অবস্থা ভাল করে জানি না, তবে একটা ব্যাপার থেকে তাঁরা নিজেরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারেন। গত সপ্তাহে আমার বক্তৃতা থেকে তিনি বেশ বুঝতে পারবেন যে আমি দেশের প্রত্যেক দিনকার ঘটনা অবগত আছি। দেশের ভেতরকার রোজকার খবর যদি আমার জানা সম্ভব হয়ে থাকে তবে পৃথিবীর সব খবরও আমি অনায়াসে পেতে পারি। কিন্তু দেশের যে সব লোকের পক্ষে ইঙ্গ-আমেরিকানদের তাঁবে যে সব জায়গা আছে তার বাইরের খবর পাওয়া সম্ভব নয় এবং যাঁরা শত্রুর প্রচার রোজই গেলেন, তাঁদের পক্ষে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা শক্ত।

পৃথিবীতে আজ মস্ত ওলোটপালট হতে চলেছে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যতও পৃথিবীর ঘটনাবলীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। যখন কয়েকজন খ্যাতিমান নেতা পরাভূত মনোভাব আশ্রয় করেছেন, কেন আমি সেই সময়েই আরও আশান্বিত হয়েছি? তার দুটো প্রধান কারণ আছে। প্রথমত আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি; এবং বর্মাতে সম্প্রতি পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পূর্ব্ব ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়িনি। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমস্যা এখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, যদি তা আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে না দাঁড়ায় তবে পৃথিবীর মতামতের সম্মুখে ভারতীয়

সমস্যা উপস্থাপিত হবে। আপনারা নিজ চোখে কি দেখছেন না যে যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় সিরিয়া ও লেবানন সম্মিলিত জাতিদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে নিয়ে কি ভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে। সিরিয়া ও লেবাননের নেতাদের চাইতে আমাদের বুদ্ধি অথবা দূরদৃষ্টি কম নয়। কিন্তু পৃথিবীর মতামতের কাছে ভারতীয় সমস্যা উপস্থাপিত করতে হলে আমাদের দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমত ব্রিটিশের সঙ্গে সব রকম আপোষে বাধা দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জোর দিয়ে দাবী করতে হবে।

দেশবাসী যদি অস্ত্র ধারণ না করতে পারে, তারা যদি সত্যাগ্রহও চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়, নীতির দিক থেকে অন্তত তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করে আপোষ করতে অসম্মত হোক। অস্ত্র দিয়ে আমরা ভারতের স্বাধীনতা দাবী করব। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নাই যে আমাদের এই কাজের ফলে ভারতের ব্যাপারকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হতে বাধা দেয়। কিন্তু ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ করে আমাদের সংগ্রাম পরিত্যাগ করলে তা হবে না।

আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ করতে বাধা দিচ্ছি বলে আমি জানি যে দেশের কয়েকজন নেতা আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভুল দেখিয়েছি বলে তাঁরা আমার ওপর চটা। ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেসের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি নেই বলেছি বলেও তাঁরা আমার উপর ক্ষেপেছেন। এই সব সাম্রাজ্যবাদী নেতারা আমি জাপানের সাহায্য নিয়েছি বলে আমাকে গাল দেন। জাপানের সাহায্য নিয়েছি বলে আমি আদৌ লজ্জিত নই। জাপান ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে বলেই আমি জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে তারা ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু যাঁরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ

দিতে রাজী হয়েছেন তারা ব্রিটেনের বড়লাটের অধীনে চাকরী নিতে রাজী। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃতির ভিত্তিতে যদি এই নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করত তবে সেটা অন্য ব্যাপার হত। উপরন্তু জাপান আমাদের অস্ত্র দিয়েছে যার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের বাহিনী গঠন করেছি। এই সৈন্যবাহিনী আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এই বাহিনী ভারতের জাতীয় পতাকা বহন করে এবং তাদের সব ধ্বনিই হচ্ছে ভারতের জাতীয় ধ্বনি। ভারতীয় সেনানায়কের অধীনে নিজেদের শিক্ষা শিবিরে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা এই বাহিনী শিক্ষা লাভ করছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তারা চলে ভারতীয় সেনানায়কের পরিচালনায়। এই সব সেনানায়ক অনেকে জেনারেল হয়েছেন। এই বাহিনীকে যদি পোষা বাহিনী কেউ বলে, তবে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীকেও পোষা বাহিনী বলতে হবে কেননা তারা ব্রিটিশ সেনানায়কের হুকুম মত ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ করছে। পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে নগণ্য কয়েকজন মাত্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সম্মান ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভের যোগ্য এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আজ পর্য্যন্ত একজন ভারতীয়কেও জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়নি।

কমরেড, আমি বলছি জাপানের সাহায্য নিয়েছি বলে আমি লজ্জিত নই। আমি আরও বলতে পারি যে সর্ব্বশক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ যদি নতজানু হয়ে আমেরিকার সাহায্য ভিক্ষা করে থাকতে পারে তবে আমরা পরাধীন নিরস্ত্র জাতি কেন আমাদের বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য নেব না? আজ আমরা জাপানের সাহায্য নিয়েছি, কাল প্রয়োজন মত অন্য জাতির সাহায্য নিতে ইতঃস্ততঃ করব না। বিদেশী কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় তবে আমি কারো চাইতে কম আনন্দিত হব না। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত একটিও এমন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে বিদেশের

সাহায্য ছাড়া কেউ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের মত পরাধীন জাতির পক্ষে ব্রিটিশের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া ব্রিটেনের নেতাদের ও রাজনৈতিক দলে দয়া ভিক্ষা করবার চাইতে অনেক সম্মানজনক। .আমাদের অসুবিধা এই যে আমরা আমাদের শত্রুদের তত ঘৃণা করতে শিখিনি এবং আমাদের নেতারা শত্রুকে সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এটা কি হাস্যকর নয় যে আমাদের কোন কোন নেতা বাইরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে দেশে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে হাত মেলান? বন্ধুগণ, এখানে যদি আমি চেয়ারে বসে রাজনীতি করতাম তবে আজ আমি খুলে কিছুই বলতাম না। আমি এবং আমার সঙ্গীরা কঠোর সংগ্রামে রত আছি। যারা প্রকৃত রণক্ষেত্রে নেই তাদেরও প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদের সম্মুখে উপস্থিত হতে হচ্ছে। বর্মাতে আমরা রোজ বোমা ও মেশিন গানের সম্মুখীন হয়েছি। রেঙ্গুনে আমি দেখেছি আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতাল ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, রোগীরা অসংখ্য হতাহত হয়েছে। আমি এবং আরও অনেকে যে বেঁচে আছি তা জনগণের দয়ায়। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আমরা বেঁচে কাজ করছি ও যুদ্ধ করছি বলে আপনাদের কাছে কথা বলবার ও উপদেশ দেবার অধিকার আছে। বোমা পড়া যে কি তা আপনারা অনেকেই জানেন না। কানের কাছে ডানে বাঁয়ে দিয়ে গুলী চলে যাবার অভিজ্ঞতা আপনাদের অনেকেরই নেই। যাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের দৃঢ়তা অটুট এবং তারা ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রাহ্যই করে না।

কমরেড, আমাদের স্থির করতে হবে ওয়েভেল-প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা কি করব। প্রথমত যদিও আপনাদের এখন সময় কম তবু কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আপনাদের বাধা দিতে হবে। যদি তাতে সফল না হন তবে দেশে এমন

অবস্থা সৃষ্টি করবেন যাতে শাসন পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যেরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এটা খুব কঠিন হবে না। বড়লাট ও শাসন পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে। নতুন শাসন পরিষদ গঠিত হবার পরে বড়লাট দেশের লোক, অর্থ ও সম্পদ ব্রিটেনের সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে নিয়োগ করবার চেষ্টা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন আপনাদের একটা তীব্র আন্দোলন ও বিরোধিতা সৃষ্টি করতে হবে কারণ তখন এমন অনেক বিষয় উঠবে যাতে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের স্বার্থ সংঘাত হতে বাধ্য। তখন শাসন পরিষদের কংগ্রেসী সভ্যেরা ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক অবলম্বন করতে বাধ্য। তার ফলে বড়লাটের সঙ্গে বিরোধ বাধবে এবং তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ভারতীয়দের কামানের মুখে ঠেলে দিতে অস্বীকার করে আপনারা আন্দোলন করবেন। ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ধ্বংসমূলক কাজ আরম্ভ করবেন এবং যাতে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো অসম্ভব করে তুলবেন। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে সব দেশ থেকে ব্রিটিশ পালিয়ে এসেছিল বা যে সব দেশ চক্রশক্তির হস্তগত হয়েছে সেখানে গোপন আন্দোলন চালাবার জন্য গত পাঁচ বছর ধরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে। আপনারা যদি এই উপদেশ-গুলো তাদের বিরুদ্ধেই নিয়োগ করেন তবে খুব ভাল ফল পাবেন।

কমরেড, আমি আজকার মত শেষ করব। শেষ করবার আগে আমি আবার বলছি সে-ই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবী যার নিজ উদ্দেশ্যের ন্যায়ে পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং যে বিশ্বাস করে তার উদ্দেশ্য সফল হবেই। বিফলতায় যে মুষড়ে পড়ে সে বিপ্লবী নয়। বিপ্লবীর আদর্শ হচ্ছে "ভাল হবে বলে আশা করতে হবে, যে কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" সংগ্রাম অব্যাহত রেখে যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের চাল ভুল না হয় তা হলে যুদ্ধ শেষ হতে হতে আমরাও স্বাধীনতা লাভ করব। জয় হিন্দ্।

২১। আমি বিপ্লবী

(২৭শে জুন, ১৯৪৫ সিঙ্গাপুর থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা)

কমরেড, ভারতবর্ষে থাকলে আমি যে ভাবে কথা বলতাম, একজন বিপ্লবীর কাছে আর একজন যে ভাবে বলে, গেল কয়েকদিন ধরে আপনাদের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেছি। বিপ্লবী আমি তাকেই বলি যে দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন আপোষ রফা করতে রাজী নয়। বিপ্লবী তার উদ্দেশ্যের ন্যায়ের প্রতি আস্থাবান, তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে অবশেষে সে জয়ী হবেই। সাময়িক বিফলতায় বিপ্লবী কখনও হতাশ হয় না বা মুষড়ে পড়ে না। বিপ্লবীর আদর্শ হচ্ছে "ভাল হবে বলে আশা কর, কিন্তু যে কোনও অবস্থা'র জন্য তৈরী থাক।" আমরা বিপ্লবী হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি; কাজেই বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই, তেমনি সব অবস্থায় সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যও আমাদের অবিচলিত সঙ্কল্প। এই অজেয় মনোভাব নিয়ে আমরা ব্রিটিশের সম্মুখীন হচ্ছি এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। বিপ্লবীদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় হতে পারে। একমাত্র অনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে সময়।

সময় সম্বন্ধে আমি বলব যে দুটো বিষয় আমাদের স্বাধীনতা লাভের সময় স্থির করবে প্রথমত আমরা কতখানি পরিশ্রম ও ও কতখানি স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত তাই দেখতে হবে, দ্বিতীয়ত বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা কাজে লাগাতে আমরা কতটা তৈরী হয়েছি। এদিক থেকে আমাদের করণীয় অন্তত তিনটি বিষয় আছে। ভারতবর্ষের ভেতরে ও বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাতে হবে। দ্বিতীয়ত নৈতিক হলেও একটা

বিরোধ সব সময়েই বজায় রাখতে হবে যেন কোন সময়েই ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ না হতে পারে। তৃতীয় ভারতবর্ষের ব্যাপার আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হিসাবে পরিণত করে তা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করা।

আমি আগেই বলেছি যে পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করব। দেশবাসী যদি ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে আমাদের দাবী অস্বীকার না করেন, তবে যতদিন আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব ততদিন ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা বলেই বিবেচিত হবে। সামরিক সাফল্য ও মিথ্যা প্রচার দিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে আপোষ সম্ভব হয়। এক অংশ দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ এমন বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছে যে এই যুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকার জয় হবে এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের আর স্বাধীন হবার আশা নাই, তাই এখন ব্রিটিশ যা দিতে অগ্রসর হয়েছে ভারতবাসীর গ্রহণ করা উচিত।

ব্রিটিশ যেই বুঝতে পারল যে তাদের প্রচার ভারতবর্ষে সার্থক হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তারা এমন একটা প্রস্তাব পাঠাল যে আসলে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ক্রীপস প্রস্তাব। সাধারণ অবস্থায় একজনও খাঁটি কংগ্রেসসেবী লর্ড ওয়েভেলের এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করত না। কিন্তু দেশবাসীর কারও কারও এই পরাভূত মনোভাবের ফলে আমাদের কয়েকজন নেতা নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণ কুটা আশ্রয় করে তেমনি এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন।

শত্রু আমাদের স্বাধীনতার পথে একটি বাধা উপস্থিত করেছে, বিপ্লবী হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বশক্তি দিয়ে এই বাধা দূর করা যেন ভারতের ভেতরে ও বাইরে স্বাধীনতার জন্য যে সভাব শক্তি কাজ করছে তাদের প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। যদিও সময় আমাদের কম তবু ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটেনকে জাপানের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করলে কি বিপদ হতে পারে দেশবাসীকে যদি তা বুঝিয়ে দিতে পারি তবে আমরা সফল হব বলেই আশা করি। প্রথমত ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা স্বাধীনতার পথ থেকে সরে যাবে। দ্বিতীয়ত প্রস্তাব গ্রহণ করলে অবস্থা এমন দাঁড়াবে যখন কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বে দাবী ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, ভারতের আর সব রাজনৈতিক দলের অন্যতম দল হিসাবে কংগ্রেস পরিগণিত হবে, এবং ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কংগ্রেস যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সে দাবীও আর করা যাবে না।

আমার কষ্ট হয় যে আজ এমন কয়েকজন ভারতীয় আছেন যাঁরা বড়লাট ও তার প্রভুরা যে ভারতবাসীর জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে তা বুঝতে পারছেন না। এই সব মহোদয়েরা বড়লাটের আন্তরিকতা বিশ্বাস করে তাঁকে প্রশংসা পর্য্যন্ত করেছেন, কিন্তু আমি ত দেখতে পাচ্ছি যে বড়লাট নিজের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নিজেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ২৫শে জুন সিমলা বৈঠক উদ্বোধন করে তিনি ভারতীয় নেতাদের উপদেশ দিয়ে বক্তৃতা করেছেন, "যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন না হচ্ছে, ততদিন আপনাদের আমার নেতৃত্ব মেনে নিতেই হবে। ভারতবর্ষে সুশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য আমার হিজ ম্যাজেষ্টির গভর্ণমেণ্টের কাছে দায়িত্ব আছে।" এই বক্তৃতাতেই তিনি আগে বলেছেন "ভারতবর্ষকে ঐশ্বর্য্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের দিকে নিয়ে যেতে উপদেশ দেবার জন্য আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আপনাদের আহ্বান করেছি।"

এই ধরণের মাতব্বরি কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। আমার যতদূর জানা আছে লর্ড ওয়েভেলকে কেউ ভারতবর্ষের অভিভাবক নিযুক্ত করেনি, বা তাঁর হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেয়নি। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে লর্ড ওয়েভেল যে মধ্যস্থতার দাবী করেছেন তা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মেনে নিতে

রাজী কি না আমি বলতে চাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ অত্যাচারের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ইঙ্গ-আমেরিকানরা দাবী করছে যে তারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে; এই সময়ে আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অত্যাচার, লুঠতরাজ ও হত্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে ব্রিটিশের ভারতে থাকবার কোন অধিকার নাই। এখন ভারত-সুহৃদ অথবা ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা না সেজে অতীতেব কুকীর্ত্তির কথা স্মরণ করে এখন তারা এমন পরিতাপ করবে এটাই আশা করেছিলাম। অত্যন্ত নীচ ধরণের অহঙ্কার থাকলেই এই সিমলা বৈঠকে লর্ড ওয়েভেলের মত মনোভাব অবলম্বন করা সম্ভব।

বৈঠকে আসনগুলোর যেমন বন্দোবস্ত হয়েছে তা থেকেও লর্ড ওয়েভেলের মনোভাব বুঝতে পারা যায়। ডান দিকের আসন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দেওয়া হয়নি। নিউ দিল্লী অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে এটা ঘোষণা করা হয়েছে। কংগ্রেস এই ব্যাপারে কোন আপত্তি জানিয়েছে কি না তা জানানো হয়নি। যদি আপত্তি না করা হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে যে কংগ্রেস প্রতিনিধি-দের সিমলা বৈঠকে যোগ দিতে এতই আগ্রহ যে তারা সব রকম মান অপমান ভুলে যেতে প্রস্তুত।

আর একটি কৌতুককর বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কি না আমি ভাবছি। লর্ড ওয়েভেল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই নতুন প্রস্তাব যে সময়ে ঘোষণা করেছিলেন ঠিক একই সময়ে লণ্ডনে ঘোষণা করা হয় যে ইংলণ্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য লোক নেবার ব্যবস্থা সুরু হয়েছে। এটাই পরিষ্কার প্রমাণ যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগের অধিকার আদৌ শিথিল করতে চায় না। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেছেন "দীর্ঘ দিন ধরে ভারতবর্ষ থেকে বহু টাকা নেবার এইরূপ ব্যবস্থা করাতে ভারতের জাতীয়তাবাদী ও

ভারতবাসীদের কাছে মনে হবে যে ভারতবর্ষ ত্যাগকরতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হবে একথা ব্রিটিশেরা জানে তাই এইভবিষ্যৎ ক্ষতি-পুরণ হিসেবেই এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হল।"

সিমলা বৈঠক কেন গোপনে বদ্ধ দুয়ারের অন্তরালে হবর ব্যবস্থা হয়েছে সে কথা আমার শ্রোতারা চিন্তা করেছেন কি না আমি জানি না। শুনেছি গোপনতা রক্ষা করবার একটা প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক আমন্ত্রিত সভ্যকে দিতে হয়েছে। কেন এমন হবে? যে সম্মেলনে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে তা গোপনে অনুষ্ঠিত হবার দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এর একমাত্র কারণ হতে পারে এই যে লর্ড ওয়েভেল ভারতের জনমত ভয় করেন। বদ্ধ দুয়ারের অন্তরালে তিনি ভারতীয় নেতাদের ভাঁওতা দেবার চেষ্টায় আছেন, কেন না তাঁর মনে ভয় আছে সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হলে ভারতের জনমত জাগ্রত হয়ে নেতাদের ফাঁদে পা দিতে বাধা দিতে পারে।

সিমলা বৈঠক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি মহাত্মা গান্ধীকে বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করাতে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই থেকে মনে হয় ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তারা যে ব্যবহার করেছিল, গান্ধিজি তা ভোলেন নি। তখন এমন একটা চাল চালা হয়েছিল কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধির অবস্থা দাঁড়িয়েছিল উপস্থিত অন্যান্য দলের একজন সামান্য প্রতিনিধির মত। এই বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মত হয়ে মহাত্মা গান্ধী নিজেকে দলাদলির উর্দ্ধে রেখেছেন। বৈঠকে যোগ না দেওয়াতে তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান শুধু রক্ষা হয়েছে তা নয়, হয়ত এটা ভারবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সহায়ক হবে।

কমরেড, ওয়েভেল-প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য এখন স্থির করতে হবে। যদিও আমাদের হাতে সময় একেবারেই নাই, তবু কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই প্রস্তাব যাতে গ্রহণ করতে না পারে তার জন্ত

সব কিছু করতে হবে। দেশের সর্ব্বত্র ওয়েভেল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম সুরু করতে হবে। চেষ্টা করবেন যেন সংহত বাধা দেওয়া সম্ভব হয়। এত দূরে থেকেও আমি বুঝতে পারছি যে ওয়েভেল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশে যথেষ্ট বিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু বিরোধিতা এই প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দিতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না। প্রস্তাব বর্জ্জনের আন্দোলন করবার সময় আপনারা ওয়ার্কিং কমিটির কাছে দাবী করবেন যে নতুন শাসন পরিষদের একটা পরিকল্পিত কার্য্যক্রম দেশের সম্মুখে উপস্থিত করা হোক। এই কার্য্যক্রম থেকে দেশবাসী বুঝতে পারবে যে, এই নতুন শাসন পরিদেষ কাজ হ'বে শুধু পাঁচ লক্ষ লোক বলি দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের যুদ্ধ সাহায্য করা কিম্বা লর্ড ওয়েভেল-কথিত ভারতবর্ষকে সম্পদ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের পথে নিয়ে যাওয়া।

ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করবার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উচিত নতুন শাসন পরিষদের কর্ম্মসূচী বড়লাটের কাছে পেশ করা। এই কর্ম্মসূচীতে যদি বড়লাট সম্মত হন তা হলেই সত্য সত্য প্রমাণিত হবে যে নতুন শাসন পরিষদ ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে কি না। প্রস্তাব গ্রহণে যদি আপনারা বাধা দিতে না পারেন, তবে দেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করবেন যেন কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বড়লাটের শাসন পরিষদের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এটা খুব কঠিন হবে না। আপনারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করবেন। এই একটি দাবীতেই বড়লাট ও শাসন পরিষদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বিহার ও যুক্ত পরিষদে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে গেলে লাটের সঙ্গে মন্ত্রীসভার এমনি সংঘাত বেধেছিল। নতুন শাসন পরিষদ গঠিত হলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে বড়লাট নিশ্চয়ই ভারতের জনবল, অর্থ ও সম্পদ নিয়োগ করবার চেষ্টা করবেন। এতে এমন অনেক ব্যাপার দেখা দেবে যেখানে ভারতের স্বার্থ ও ব্রিটেনের

স্বার্থে বিরোধ উপস্থিত হবে। পরিষদে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যদি আপনারা আন্দোলন সজাগ রাখেন তবে এই প্রতিনিধিরা ভারত-বর্ষের স্বার্থ আগে বিবেচনা করতে বাধ্য হবে। তার ফলে বড়লাটের সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় সৈন্য সুদূর প্রাচ্যে কামানের মুখে পাঠানোর বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করবেন। এতে যদি বিফল হন তবে যুদ্ধের রসদ উৎপাদনের কাজে ধ্বংসমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, যানবাহন চলাচলে বাধা জন্মাবেন এবং সংবাদ আদানপ্রদানের পথ বন্ধ করবার চেষ্টা করবেন।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি যে সব দেশ মিত্রপক্ষের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল সেই সব দেশে গুপ্ত আন্দোলন করবার জন্য ব্রিটিশ গত পাঁচ বৎসর ধরে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে তা আপনারা জানেন। ব্রিটেনের মত ভারতবর্ষেও গোপন আন্দোলন চালাবার শিক্ষা অনেকে পেয়েছে। এই সব লোককে যদি কাজে লাগাতে পারেন অথবা গোপন আন্দোলন চালাবার যে উপদেশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এতদিন দিয়েছে তা যদি ভারতবর্ষেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে পারেন তা হলে খুবই সুফল পাবেন আশা করা যায়।

উপরন্তু ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে দেশের ভেতরেই বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবেন। ১৯৩৯ সালে ভারতীয় বাহিনীর যে অবস্থা ছিল আজ আর তা নেই। ভারতীয় বাহিনীর সংখ্যা ২,৫০০,০০০। এই বাহিনীতে অনেকেরই রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব আছে। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার সময় হচ্ছে যখন এই বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হবে, অবশ্য যদি ততদিনও ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়। এই যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশের এই ২,৫০০,০০০ লোক অস্ত্র ব্যবহার শিখেছে। সেনা বাহিনী ভেঙ্গে দেবার সময় হলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে আপনারা ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার

লুণ্ঠন থেকে জানা যায় কি করে শত্রুর অস্ত্র দখল করে আবার তারই বিরুদ্ধে সেগুলো প্রয়োগ করা যায়।

যদি আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাই, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের চালে যদি ভুল না হয় তবে আমরা এই যুদ্ধ শেষ হবার আগেই স্বাধীন হব। তার অর্থ এ নয় যে বিফল হলে আমারা হতাশ হব অথবা দমে যাব। এমন যদি হয় যে এই যুদ্ধের শেষে আমরা স্বাধীন হতে পারলাম না, তবে যুদ্ধের পরে বিপ্লব করবার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। তাতেও সফল না হলে আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসবে তখন আমরা স্বাধীন্ হব। এই যুদ্ধের পরে দশ বছরের মধ্যেই আবার যুদ্ধ বাধবে বলে আমার বিশ্বাস, হয়ত আগেও হতে পারে যদি সমস্ত পরাধীন জাতি এই যুদ্ধের মধ্যে স্বাধীনতা না পায়।

আমি আগে বলেছি ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়ই একমাত্র অনিশ্চিত। সব চাইতে অশুভ হচ্ছে যে আমাদের স্বাধীনতা লাভে হয়ত আরও কয়েক বছর দেরী হয়ে গেল। তা হলেই বা আপোষ করবার জন্য আমরা কেন বড়লাট প্রাসাদে ছুটব? বিপ্লবী হিসাবে আপনাদের কাজ হচ্ছে স্বাধীনতার নিশান ওড়ানো, যতদিন ভারতের জনগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা বড়লাটের প্রাসাদে না ওঠাতে পারে ততদিন এই পতাকা উড্ডীন রাখ।

জয় হিন্দ

২২। সংগ্রাম চালিয়ে যান

(অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে ২৮শে জুন, ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)

বিপ্লবী বন্ধুগণ, গেল রাতে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি যে ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের কোনই লাভ হবে না। বরং

আমোদের জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কয়েকজন কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তি কয়েকটা বড় বড় পদ পাবে সত্যি। জাতি হিসাবে আমরা একবারেই ডুবে যাব, এতদিন ধরে কংগ্রেস যা চেয়েছে সবই ত্যাগ করতে হবে।

একটা দেশে কোন বিপ্লবী আন্দোলন শক্তি লাভ করলে সে দেশের ওপরে যে বিদেশী শক্তির প্রভাব আছে তারা চায় সেই বিপ্লবী আন্দোলনের একটা বোঝাপড়া করে নিতে, যাতে দেশের ওপরে তাদের প্রভাব নষ্ট না হয়। তার জন্য সামান্য কিছু কিছু বিষয় তারা ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। সিন ফিন দল আয়ারলণ্ডে বিপ্লব সৃষ্টি করলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আয়ারলণ্ডের শাসনতন্ত্র রচনা করবার জন্য একটা সর্ব্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেছিল। সিন ফিন দল এই বৈঠক বর্জ্জন করে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে তারাই কেবল শাসনতন্ত্রের আলোচনায় যোগ দিতে অধিকারী। তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল এবং কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবল সিন ফিনদের সঙ্গেই আপোষ করতে বাধ্য হল।

আপনাদের হয়ত মনে আছে যে ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবার সময় আমি বলেছিলাম যে শুধুমাত্র কংগ্রেসেরই এই বৈঠকে যোগ দেবার অধিকার আছে। যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে নি তাদের এই ধরণের বৈঠকে যোগ দেবার অধিকার নাই। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মাজী অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একজন ভারতীয়কে আর একজনের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়। সেখানে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন তা আর ভোলেন নি। এই কারণে তিনি সিমলা বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না। সিমলা বৈঠকে যোগ দিতে রাজী না হয়ে তিনি তাঁর সম্মান বাড়িয়েছেন, এর ফলে দেশের মঙ্গলই হবে। তিনি দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি সমর্থন

করেছিলেন বলেই যদিও বড়লাট বিলাতে গিয়ে একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তবু বৈঠকে যোগ না দিয়ে মহাত্মাজী উচিত কাজই করেছেন। একমাত্র তিনিই কংগ্রেস ও দেশকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। আমার মতে ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে মহাত্মাজী যে ভুল করেছিলেন কংগ্রেস সিমলা বৈঠকে যোগ দিয়ে ঠিক তেমনি ভুল করছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, কংগ্রেস আজও তাই আছে। কাজেই যেন কোন শক্তির সঙ্গে চুক্তি করবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। কাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে যোগ দিয়ে কংগ্রেস তার মান খোয়াবে। ভারতবর্ষে একমাত্র কংগ্রেসই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের প্রতিনিধি এবং সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে কথা বলবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাব ও পরিকল্পনা থেকে বড়লাটের চাল বুঝতে পারা যাচ্ছে। তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়কে আহ্বান করে কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁর কাজ ঠিকই করেছেন। বড়লাটকে মৌলানা আজাদকে বৈঠকে আহ্বান করতে বাধ্য করে তিনি বৈঠক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এই ভাবে তিনি বড়লাট ও মিঃ জিন্নার কুমতলব ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। মৌলানা আজাদ কংগ্রেসসেবী মুসলমান, তাঁর সামনে মিঃ জিন্না খুব আরামে চলতে পারবেন না। তাই তিনি পণ্ডিত পন্থের সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছেন।

প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি থাকবে, তা ছাড়া শিখ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতিরাও থাকবে। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা দেশের স্বার্থ ভেবে কাজ করবে সন্দেহ নেই, তবে মুসলিম লীগকে বড়লাট দলে টানতে পারেন। তা হলে বড়লাট যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। কংগ্রেস এবং লীগ যদি একমতও হয় তবু বড় লাট ভেটো দিয়ে তা নাকচ করে দিতে পারবেন। কাজেই

তাঁর মতেই সব সময়ে কাজ হবে। তার ওপরে যখন আমরা স্মরণ করি যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁর পাঁচ লাখ সৈন্য চাই, তখনই আমরা বেশ বুঝতে পারি যে সিমলা বৈঠকে যোগ দেওয়াটা নিছক নির্ব্বুদ্ধিতা।

ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত আশ্বাস দেবে যে বড়লাটের ভেটো-ক্ষমতা কদাচ প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকেই তেমন আশা লোপ পায়। প্রথমত বৈঠকের প্রধান আসন কংগ্রেসের সভাপতিকে দেওয়া হয়নি—হয়েছে অন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে। সর্ব্বত্রই প্রধান আসন বৃহত্তম সঙ্ঘকেনই দেওয়া হয়ে থাকে। দিল্লী রেডিওতে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস-সভাপতির আসন দক্ষিণ দিকে নয়, বাম দিকে। এটা ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন নয়। যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা ভালবাসি তার প্রতি এটা অপমান। এই আসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে কোন আপত্তি করা হয়েছে কি না আমি জানি না। যদি না হয়ে থাকে তবে বলব দেশের কাছে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে এই অপমান সত্ত্বেও কংগ্রেস আপোষ করবার জন্য উন্মুখ।

আমাদের কোন কোন দেশবাসী বড়লাটের আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেছেন "ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনের নিকটবর্ত্তী করতে সাহায্য করবার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান করছি। একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ছুটি নেব না। হিজ ম্যাজেস্টির গভর্ণমেণ্টের কাছে আমি ভারতের সুশাসন ও শান্তি-রক্ষার জন্য দায়ী। আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি।" আশ্চর্য্য যে এর পরেও লর্ড ওয়েভেল নিজে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে মধ্যস্থ হতে চান। তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিত যে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসী নিজেরাই মধ্যস্থতা করবে। সে দিন এখন গত যখন এই রকম উক্তিতে ভারতবাসী

গৌরব বোধ করত, এখন এই ধরণের পিঠ চাপড়ানীতে তারা অপমানিত বোধ করে।

বন্ধুগণ, সিমলা বৈঠকে যোগ দিয়ে কংগ্রেস যে ভুল করেছে তা সংশোধন করতে আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি। দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিন যে এই রকম গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটির নাই। এই অধিকার আছে একমাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্মেলনের। বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটিতে বামপন্থী প্রতিনিধি কেউ নেই, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

বন্ধুগণ, আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। মনে রাখবেন আমরা বিপ্লবী, আমরা আশাবাদী। সব রকম লোভ সত্ত্বেও আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। জয়লাভ আমাদের সুনিশ্চিত।

জয় হিন্দ!

২৩। আশার আলো

(২৯শে জুন ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুর থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভাই ও বোনেরা, সিমলা থেকে যে শেষ সংবাদ গেছে সেটা আমাদের সম্মুখে আজকার মেঘের ভেতরে আলোর রেখা বলা যেতে পারে। আজ মুসলিম লীগ বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সব কটি আসন দাবী করেছে। কংগ্রেসের এই দাবী অগ্রাহ্য করাই স্বাভাবিক, তার পাল্টা দাবী করা উচিত যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কয়েকটি জাতীয়তাবাদী যে সব মুসলমান লীগের বাইরে আছেন তাঁদেরই পাওয়া উচিত। আমি আশা করি, মনে মনে প্রার্থনা করি যেন কংগ্রেস এই দাবীর এক চুলও ছেড়ে না দেয়। মুসলিম লীগের এই অযৌক্তিক দাবী স্বীকার করা কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল হবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কংগ্রেস যদি এই মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্নে মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে কংগ্রেসের মধ্যেই যে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু যে বামপন্থীরা বিদ্রোহ করবে এমন নয়, যারা বামপন্থী নন এমন কংগ্রেসী সভ্যও বিদ্রোহ করবে। সম্প্রতি পাঁচটি জাতীয়তাবাদী মুসলমান সঙ্ঘ দিল্লীতে সভা করে যে পুনরায় ঘোষণা করেছে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়, তা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এই সম্মেলন আহ্বান থেকেই বোঝা যায় দলগত বিভেদ ভারতবর্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি আশা করি যে সব প্রতিষ্ঠান ওয়েভেল-প্রস্তাব বিরোধী অথবা সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা যেন এমনি সভা আহ্বান করেন। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা তাদের দাবী জানাবে এটা আমার কাছে কাম্য বলেই মনে হয়। আজাদ মুসলিম লীগ অথবা জমিয়েত-উল-উলেমা কর্ত্তৃক ভারতের সর্ব্বত্র এই সম্মেলন আহূত হওয়া উচিত। সাম্প্রতিক যে সংবাদ আমি পেয়েছি তাতে দেখছি সীমান্তের খুদা-ই-খিদ্‌মৎগার এবং বাংলাদেশের প্রজা-পার্টি এই সম্মেলনে যোগ দেয়নি। মজলিস-ই-অহ্‌রও যোগ দিয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। আমি যে সম্মেলনের কথা বললাম তাতে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলকেও আহ্বান করা যেতে পারে, কারণ এই দলের মুসলমান সভ্যেরা মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে না।

যাঁরা আমার মত গভীরভাবে অনুভব করেন তারা স্বীকার করবেন যে ভারতের স্বার্থের খাতিরে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ওয়েভেল-প্রস্তাব আমাদের বর্জ্জন করাই উচিত এবং বিপদ সম্পূর্ণ না কেটে যাওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। প্রথমে আমরা যদি হেরে যাই, কংগ্রেস ওয়েভেল-প্রস্তাব গ্রহণ করে তবুও আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, দেশের মধ্যে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে

হবে যেন কংগ্রেস শাসন পরিষদের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী সংগ্রামে আমাদের হতাশ হওয়া অথবা দমে যাওয়া চলে না, বিশেষ করে এমন একটা সময় এখন এসেছে যখন আন্দোলনের সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

মহাত্মা গান্ধী সিমলা বৈঠকে যোগ দেবেন না সিদ্ধান্ত করেছেন বলে আশা হয় যে হয়ত দুর্ভাগ্য এড়িয়ে যাওয়া যাবে। বৈঠকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আহ্বান করাতে মুসলিম লীগ কেন অসন্তুষ্ট হয়েছে তা আমি বুঝি। মহাত্মা গান্ধী যা করেছেন তা শুধু চমৎকার নয়, অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত কাজ হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি শুধু মুসলমান বলেই যদি তাঁকে কংগ্রেস দলে সিমলা বৈঠকে নেতৃত্ব করতে দেওয়া না হত তবে ব্যক্তিগত ভাবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি অবিচার করা ত হতই, উপরন্তু যে সব জাতীয়তাবাদী মুসলমান দীর্ঘকাল নানা রকম স্বার্থত্যাগ করে কংগ্রেসের দলে রয়ে গেছে তাদের ওপরও ঘোরতর অন্যায় করা হত।

মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেন নি দেখে আমি বিস্মিত। মধ্যস্থ হিসাবে তিনি পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের মুখে খুব প্রশংসা করেছেন। বৈঠকে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব করে তিনি ভারতবর্ষের বহু উপকার করেছেন, কারণ তাঁর মারফতে পৃথিবীর লোকে ভারতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সিমলা বৈঠকে যোগ না দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষা করেছেন। সমগ্র ঘটনা থেকে আলাদা থেকে ঠিক উপযুক্ত সময়ে সবার আগে এসে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে নতুন কিছু নয়। তেমনি আগে এসে হয়ত তিনি এই প্রস্তাব বর্জন করবার উপদেশ দেবেন। কিন্তু তাই বলে এই প্রস্তাব গ্রহণের সম্ভাবনা যতদিন আছে ততদিন আমরা সময় নষ্ট করতে পারি না। তাই আমি আশা করি যাঁরা সত্যি সত্যিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করেন, ব্রিটিশের যে

প্রস্তাব স্বাধীনতার পথে বাধা তা বর্জ্জন করবার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করে যাবেন। এই আপদ একবার স্বাধীনতার পথ থেকে উৎখাত হলে ভারতবাসীদের মানসিক স্থৈর্য্য ফিরে আসবে এবং জাতীয় সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে।

জয় হিন্দ!

দ্বিতীয় খণ্ড

সংবাদপত্রের বিবৃতি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন—"অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের জন্যে চক্র-শক্তিবর্গ যুদ্ধ করছেন। তাঁরা দেখতে চান যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। ড্যুচে ও ফ্যুয়েরর ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।"

—বার্লিন বেতার, ১৯শে জুন, ১৯৪২।

*　　　*　　　*

"টোকিয়োর 'নিচি নিচি' নামক পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারের সময়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই মর্ম্মে উক্তি করেন যে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল টোজো সম্প্রতি ভারত সম্পর্কে আশ্বাসময় বিবৃতি দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপান সরকার কোনো প্রকার অভিসন্ধি পোষণ করেন না, তাতে সমগ্র ভারতবাসীই অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে গত ছয় মাসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর মতবাদে যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ এই যে মহাত্মাজী ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন জাপানের এই মিত্রতা-সূচক মনোভাব ভারতবাসীর অন্তরকে কতো গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। শ্রীযুক্ত বসুর মতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধ চালনার উপযুক্ত ক্ষণটি বর্ত্তমানে এসেছে।"

—বার্লিন বেতার, ২০শে জুন, ১৯৪২।

*　　　*　　　*

জাপানী সংবাদপত্র 'নিচি নিচির' বার্লিনস্থ সংবাদদাতার নিকটে ভারতের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন—

"আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসীরা, জানি যে ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো চুক্তি বা আপোষ করবার সময় এটা নয়। আমরা খুব ভালো ভাবেই জানি ও বুঝি যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে একমাত্র বলপ্রয়োগ এবং সেই স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করবার জন্যে যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে আমরা আজ বদ্ধপরিকর হয়েছি। জেনারেল টোজো সম্প্রতি বলেছেন যে ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্যেই, এ কথা জাপান সরকার জানেন, তা আমরা বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করেছি। আর এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব বন্ধুত্ব-মূলক। এর ফলে জাপান সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবে একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন এসেছে। সমস্ত ভারতবাসী স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে সুদূর প্রাচ্যে ইংরেজ কি ভাবে বিতাড়িত হয়েছে এবং কি রকম দুর্দ্দশায় ও বিশৃঙ্খলায় বাঙলায় তাদের তাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা ভারতবাসীর অজানা নয়। এ অবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে কোনো আপোষের কথা চিন্তা করাও মূর্খতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরেজের কোনো কৌশলেই ভারতের নেতৃবর্গ প্রলুব্ধ হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে আর বোঝাপড়ার মধ্যে যেতে পারেন না। এ প্রকারের মীমাংসা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে মারাত্মক। ব্রহ্মদেশ তার হৃত স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই ফিরে পেয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে জাপানীরা সত্য রক্ষা করে এবং এশিয়াস্থিত দেশগুলির উপরে তাদের কোনো সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি নেই। ব্যাংককে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছে তাতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নতুন জীবন ও গতি এসেছে। ব্যাংকক্ সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে চক্র-শক্তির দল ভারতবর্ষের মিত্রতা-কামনারই ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ভারতের গৌরবময় স্বাধীনতালাভের স্বপক্ষে তাঁদের যে সত্যকারের সহানুভূতি আছে তা প্রত্যক্ষরূপেই জানিয়েছেন। আজ ভারতবর্ষ কার-ও ভয়ে সন্ত্রস্ত নয়। এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে চক্র

শক্তির সাহায্যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম লড়াইয়ে আমরা শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই জয়লাভ করব। বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের সম্পূর্ণ ও অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এবং যুদ্ধান্তে ভারতের বিজয়ী স্বাধীনতালাভ—এ উভয় সত্যেই আমাদের দৃঢ় আস্থা আছে।"

—বার্লিন বেতার, ২৭শে জুন, ১৯৪২।

'বার্লিনার জ্যাইটুং'-নামক পত্রিকার বিশিষ্ট সংবাদ-দাতার সাক্ষাতে বর্তমানে বার্লিন শহরে অবস্থিত ভারতের মাননীয় নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আরোপ করে বলেন যে ভারতের জাতীয়তামূলক আন্দোলন এখন আর ব্রিটিশ ভারতেই আবদ্ধ নেই, এখন তা দেশীয় করদ রাজ্যগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী এই বিদ্রোহী আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্যে সক্রিয়ভাবে সেই বিপ্লব চালনা করেছেন। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে স্বাধীনতা-লাভ একমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগেই সম্ভব এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালনায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করাই তাঁর কাম্য উদ্দেশ্য। ভারতের এই খ্যাতনামা নেতাজী আরও বলেন, "অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা সশস্ত্র আন্দোলন চালাতে পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে এই অহিংস বিপ্লবের পথেই চলতে হবে। ইঙ্গ-আমেরিকান্ দল জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ভারতবর্ষকে একটি সুবৃহৎ সমর ঘাঁটিতে পরিণত করতে চাইছে কিন্তু ভারতবাসীরা তাদের এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাহত করছে এবং ভারতে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যম যাতে বিশেষ ভাবে বাধা পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্যে সর্ব্ববিধ প্রয়াসে তারা উন্মুখ। চক্রশক্তির জয়লাভে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং আমি জানি যে এই জয়লাভের ফলে ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত হবে। এখন

ভারত স্বাধীন হবে, তখন বিশ্বের স্বাধীন-জাতির মণ্ডলীর মধ্যে সে তার নিজস্ব আসন অধিকার করে নেবে এবং আমরা ভারতবাসীরা আমাদের সেই বহুযুগ-পুরাতন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে সম্মানিত জীবনযাপন করতে পারব।" শ্রীযুক্ত বসু এই কথা বলে তাঁর মন্তব্য সমাপ্ত করেন যে ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত নূতন বিশ্ব-রাষ্ট্র পরিকল্পনায় ভারতের আগামী অবদান নিশ্চয়ই মূল্যবান্ বলে বিবেচিত হবে।

—বার্লিন বেতার, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩

* * * *

"সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম। যে ইংরেজ রাজত্ব বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধনে কেবল অহিংস সত্যাগ্রহ যথেষ্ট নয়। ইংরেজই প্রথমে তার অস্ত্র বের করেছে আর সেই অস্ত্রেই তার বিনাশ অনিবার্য্য।"

আজ একটি বৃহৎ, সমবেত সাংবাদিকদের বৈঠকে, সম্প্রতি বার্লিন থেকে টোকিয়োতে প্রত্যাগত বিখ্যাত ভারতীয় দেশপ্রেমিক নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উপরোক্ত মর্ম্মে বিবৃতি দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—

"ইংরেজ ভারতবর্ষকে বল প্রয়োগে ক্রীতদাস বানিয়েছে, সুতরাং একমাত্র সেই শক্তির প্রয়োগেই ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব। তাই ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই রকম সশস্ত্র আন্দোলন ব্যাপকভাবে পরিচালনা করাই আমার উদ্দেশ্য। এই বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা অনেকখানি নির্ভর করবে আমরা এ পথে কতোখানি বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'ব, তারই ওপরে। যদি ইংরেজেরা নিষ্ঠুর দমননীতি অবলম্বন করে, তাহলে আমাদের আরও রূঢ় ও নির্ম্মম নীতি অনুসরণ করতে হবে, চাই কি, প্রয়োজন মত বাইরের সাহায্যও গ্রহণ করতে হবে। এমন কি, আমি এতোদূর পর্য্যন্ত বলতে প্রস্তুত যে বাইরের সাহায্য আজ

আমাদের নিতান্তই প্রয়োজন এবং সে সাহায্য যেখানে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, সেখানে তা সাদরে গ্রহণ না করাটাই চরম মূঢ়তার পরিচয়।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত বসু জানান যে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল টোজো ভারতবর্ষের ওপর শুধু ব্যক্তিগত দরদ দেখাচ্ছেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ভারতবর্ষকে যতোখানি সাহায্য করা জাপান সরকারের পক্ষে সম্ভব, তার ব্যবস্থায় এবং আয়োজনে কিছুমাত্র ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখাচ্ছেন না। জেনারেল টোজোর সঙ্গে তাঁর যে মোলাকাৎ হয়েছে তার বিশদ বিবরণ তিনি প্রকাশ্যভাবে জানাতে অক্ষম, এজন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসু বলেন, "আমি এটুকু দৃঢ়, নিশ্চিত বিশ্বাসে বলতে পারি, যে জাপান সরকারের কাছ থেকে আমরা যে পরিমাণ সাহায্য পেতে পারি, তার অতিরিক্ত সহানুভূতি আছে জাপানের প্রধান মন্ত্রীর অন্তঃকরণে। কারণ ইংরেজের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষ অচিরেই মুক্ত হোক্, এ আকাঙ্ক্ষা জেনারেল টোজো পোষণ করেন।

যখন শ্রীযুক্ত বসুকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাবিত সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি কোনো সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছেন কিনা, তখন প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন যে তাঁর দেশবাসীগণের নির্দ্দেশকল্পে সেই কর্ম্মপদ্ধতির আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। তিনি পুনরায় জানান যে অতি সত্বর ভারতে স্বাধীনতা লাভের আদর্শে তাঁর আস্থা অটুট, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও অটল। ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই আন্তরিক ভাবেই কামনা করেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে চক্রশক্তি জয়লাভ করুক, কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধস্বীকারে তাঁরা তিলাংশ গ্রহণ করতেও রাজি নন্। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে শত্রুই প্রথমে তার অস্ত্র নিযুক্ত করেছে, অতএব তার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করাই সঙ্গত। অতএব তাঁর অভিমত এই যে বর্ত্তমানে আইন অমান্য আন্দোলনকে সশস্ত্র দ্বন্দ্বে পরিণত করা নিতান্তই আবশ্যক। ভারতবাসীরা যখন অগ্নিস্নানে শুদ্ধ হবে, একমাত্র তখনই তারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের অধিকারী হবে।

চক্রশক্তি যে এ যুদ্ধে জয়ী হবে, তা সে যত দীর্ঘকাল-ব্যাপী হোক্ না কেন, সে বিষয়ে তাঁর অণুমাত্র সংশয় নেই।

শ্রীযুক্ত বসু এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "ভারতীয় নেতৃবর্গ বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে সমুচিত শিক্ষা পান। তখন বিনা সর্ত্তে, নির্ব্বিশেষ সাহায্য-দানের বিনিময়ে তাঁরা পেয়েছিলেন লাঠির প্রহার, কারাদণ্ড এবং গুলীর আঘাত। ভারতবাসী বুঝেছে যে ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বুলি মাত্র, তার কোনই মূল্য সেই। লোক ঠকাবার জন্যেই এ সব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এর ফলে ভারতবাসীরা বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, কোনো রকম আপোষের কথা চিন্তা না করে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছে।

ভারতের লোকেরা জানে যে এমন সুযোগ-সুবিধা আগামী এক শ' বছরের মধ্যেও আর আসবে না। ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের সংস্কৃতি সঙ্কটাপন্ন, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য আর রাজনৈতিক দাসত্ব। তাই আজ ভারতের অধিবাসী ইংরেজ শাসন খতম করে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চল্লিশ কোটি মানুষকে অবদমিত করে সর্ব্বনাশের পথে এনেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস-কামী চক্রশক্তির স্বপক্ষেই ভারতের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি। আজ জাপান ও জার্ম্মাণী আমাদের সেই পরম, অদ্বিতীয় শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। কাজেই আমাদের সহানুভূতি যে এ দুই রাষ্ট্রশক্তির অনুকূল হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা ভারতবাসীরা মনে করি যে এশিয়া ভূখণ্ডের পুনরুজ্জীবনের জন্যে শক্তিশালী জাপানের অভ্যুদয় একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং এটা আমার দৃঢ় ধারণা, ভারতবর্ষ জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টি-গত সহযোগিতা সাদরে আহ্বান করবে।"

শ্রীযুক্ত বসু এই বলে তাঁর মন্তব্য শেষ করেন যে চক্রশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত এবং সেই জয়লাভের ফলে আসবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ,

এশিয়ার ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভুত্বের বিলোপ আর ইংরেজ সরকারের কবল থেকে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সম্পূর্ণ মুক্তি।

—টোকিয়ো বেতার, ১৯শে জুন, ১৯৪৩।

'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল, তারি একটা বিবরণ এখন দিচ্ছেন আরউইন উইকার্ট, জার্মাণ বেতারের শ্রোতৃবর্গকে :—

"ভারতবর্ষ যে জাতি, উপজাতি, দল ও সম্প্রদায়ে, ধর্ম্মে ও রাজনৈতিক কর্ম্মে বহু ভাগে বিভক্ত দেশ এবং সেই জন্যেই আপনার শাসনকার্য্য নিজ হাতে চালাতে অক্ষম, এই মিথ্যা কাহিনীটি ব্রিটিশ প্রচারবিভাগের স্বকপোল-কল্পিত। ১৯৩৯ সালে যখন জার্মাণী সোভিয়েট য়্যুনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন থেকেই কম্যুনিজম ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের খাতিরে কর্ম্ম-তৎপর হয়েছে। কার্য্যতঃ ভারতবাসীরা সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছে যে তারা স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে ত্রয়ী-শক্তির জয়লাভ যেমনি সুনিশ্চিত, তেমনি এই যুদ্ধের ফলে, ভারতের স্বাধীনতাও অবিসংবাদিত সত্য।"

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জার্মাণ বেতারের শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে যে সব কথা বলেছিলেন, নীচে তারি একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হল। শ্রীযুক্ত বসুকে জার্মাণ ভাষায় যে সব প্রশ্ন করা হয়, তিনি স্থির ও সুচিন্তিত ভাবে তার জবাব দেন। অবশ্য, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে যে আলোচনা হয়, তার মূল ভিত্তি হ'ল যে শ্রীযুক্ত বসু স্বাধীন ভারতের জন্যে বহির্আন্দোলনের প্রধান অঙ্গরূপে বেতারে প্রচারকার্য্যকে গ্রহণ করেন। আমরা, যারা প্রাচ্য এশিয়ায় বাস করি, খুব স্পষ্ট ভাবেই স্মরণ করতে পারছি, কিরূপে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কারাগার থেকে পলায়ন করে জার্মাণীতে যাওয়ার পূর্ব্বেই স্বাধীন ভারত-বেতারে বক্তৃতা করেন, অথচ তার কিছু আগে ইংরেজ সরকার প্রকাশ্যে প্রচার করেন যে, শ্রীযুক্ত বসু জীবিত নেই।

যখন শ্রীযুক্ত বসুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সমগ্র ভারতের কোন্ কোন্ অংশ তাঁর আন্দোলনে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তার জবাবে তিনি বলেন ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের মতই তাঁর আন্দোলন সমস্ত দেশ জুড়ে। এর পরে তাঁকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি যথাযথ উত্তর দিতে থাকেন

প্রঃ—দশ দিন আগে যখন টোকিয়ো-তে আপনার শুভাগমন ঘোষণা করা হয়, তখন স্বাধীন পূর্ব্ব এশিয়াস্থিত ভারতবাসী মাত্রেই এ সংবাদকে পরম আনন্দে গ্রহণ করে। চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, থাইল্যাণ্ড এবং মালয় প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত বৃহৎ ভারতীয় সম্প্রদায় বাস করেন, তাঁরা আপনাকে তার করে আনন্দসূচক সম্বর্দ্ধনা জানান। তা হলে এ সত্য ঘটনাকে কেমন করে খাপ্ খাওয়ানো যায় ইংরেজ সরকারের দাবির সঙ্গে যে ইংরেজ প্রচার করে যে ভারতবর্ষ একটি জাতিই নয়, ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য নেই, তারা ধর্ম্ম ও জাতিভেদে পরস্পর শুধু বিবাদ করে থাকে ?

উঃ—ব্রিটিশ সরকারের মিথ্যাশ্রয়ী প্রচার-কার্য্যের এ হ'ল একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। আমার পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে ধর্ম্মের প্রশ্নই ওঠে না। আমার অনুচরবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভারতীয় আছেন, বিশেষ করে, অনেক মুসলমান অনুগামী রয়েছেন—যাঁরা, ইংরেজের মতে, স্বতন্ত্র লক্ষ্যে আস্থা রাখেন।

প্রঃ—ভারতের রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানে অনেকগুলি বড় আয়তনের দেশীয় মিত্ররাজ্য রয়েছে যেগুলি ইংরেজ সরকারের খাস অধীন দেশ ভাগ থেকে পৃথক। আপনার রাজনীতির মধ্যে ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্থান কি ও কোথায় ?

উঃ—এই রাজন্যবর্গ আমাদের আন্দোলন এবং তার সুনিশ্চিত সাফল্যকে কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবেন না। এঁরা হয় স্বেচ্ছায় ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন, নয়ত বৃটিশ সরকারের চাপে

পীড়িত। গত মহাযুদ্ধে যা ঘটেছিল তারই বিপরীতটা এখন দেখা যাচ্ছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এঁরা কোন রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ করছেন না। বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে, দেশীয় মিত্র রাজাদের চোখের সামনেই ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু হ'য়েছে এবং সে আন্দোলন সেই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। আজকের দিনে জনগণই একমাত্র বিবেচনার যোগ্য। এইসব দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আমার পরিচালিত আন্দোলনের বহু অনুগামী পাওয়া গেছে।

প্রঃ—এ ছাড়া আর কি অন্য কোন ভারতীয় দল বা উপদল আছে যারা অংশত ভারতীয় ঐক্যের বিরোধ সাধন করছে? যেমন ধরুন কম্যুনিস্ট্‌রা, যাদের, বোধহয় মস্কোর চাপেই বৃটিশ সরকার গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে আরও খানিকটা স্বাধীনতা দিয়েছে?

উঃ—১৯৩৯ সালে এই মহাযুদ্ধের আরম্ভ থেকেই থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) ভারতে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সময় থেকেই ভারতবাসীদের কাছে তাদের সাফল্যের আশাও কমেছে। কাজেই এ দলের রাজনৈতিক গুরুত্বও কমে এসেছে। ইংরেজের সঙ্গে এদের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আমরা ভয় পাব না। আমাদের আন্দোলনের একমাত্র সত্যিকারের বিপদ হ'ল ব্রিটেনের সঙ্গে কোন চুক্তিবদ্ধ হবার ইচ্ছা। এই আপোষে আসবার ইচ্ছা কোন কোন ভারতীয় দল এখনও প্রকাশ্যে পোষণ করছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাঁরা অবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারছেন না।

প্রঃ—বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখার দাবী করেন তার মূলে আছে, ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম। নয় কি?

প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত বসু মৃদু হাস্য করেন এবং বলেন যে ইংরেজের এই সনাতন যুক্তিতে তিনি কোন গুরুত্বই আরোপ করেন না। তিনি আরও বলেন "যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসে তার পূর্ব্বে বহু

ধরে আমরা আমাদের শাসনপদ্ধতি কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে এসেছি। আমাদের যে বহুযুগব্যাপী ঐতিহ্য তা ইংরেজদের ইতিহাসের চেয়ে অনেক অনেক পুরাণো। এ ছাড়া, সম্প্রতি আটটি প্রদেশে ভারতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ভালোভাবেই কাজ চালিয়ে এসেছে। যদিও আমরা স্বাধীন নই এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে আমরা আমাদের দেশ-বাসিগণের জন্যে যেটুকু কাজ করতে পেরেছি বৃটিশ সরকার তার দীর্ঘকাল-স্থায়ী শাসনকালেও তা করতে পারেনি। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম ভারতের সামাজিক সমস্যাকে ঠিকমত ধরা হ'য়েছে। ভারতীয়গণ এর ফলে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। আমরা জানি যে আমরা ইংরেজ মনিবদের চেয়েও আমাদের দেশকে আরো ভালো ভাবেই শাসন করতে পারি। ১৯৩৯ সালে যখন জার্মাণির সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধল, বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের সমস্ত দায়িত্ব কেড়ে নিল কেননা তাদের বিবেচনায়, স্বরাষ্ট্র—শাসনে আরও বেশী অগ্রগতিটা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, বিপজ্জনকও বটে।"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তারপরে জোর দিয়ে বলেন যে জার্মাণী ও ভারতের ভাগ্যলিপিতে একটা আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য আছে তিনি দেখিযে দেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেন 'ভারসাম্য—নীতির' অজুহাতে য়ুরোপে এবং জার্মাণীতে পূর্ব্বে যে অনৈক্য ও বিসংবাদ বর্ত্তমান ছিল তাকেই বার বার আপনার কাজে লাগিয়েছিল। ব্রিটেন প্রায় একশত বছর ধরে ঠিক এই বিভেদনীতিই প্রয়োগ করে এসেছে এবং যেমন য়ুরোপে পূর্ব্বে ঘটেছিল এখানেও ব্রিটেন একটি দলের বিরুদ্ধে আর একটি দলকে দাঁড় করিয়েছে যদিও দুই দলের মধ্যে এই বিরোধের দিকটা খুব বড় নয় তবুও ইংরেজ এই অনৈক্যের কথাটাই অতিরঞ্জিত করে সমগ্র জগতকে বলে বেড়ায় যে ভারতবর্ষ আপনার শাসনকার্য্যে একেবারেই অক্ষম। বহু সদাশয় ব্যক্তি এখনো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তার জন্য দায়ী একমাত্র ইংরেজ। শ্রীযুক্ত বসু এই প্রসঙ্গে

বলেন, "আমি জানি যে বৃটিশ কূটনীতির অভিজ্ঞতা অনেকখানি ব্যক্তিগত বলেই জার্মাণ জাতি ভারতবর্ষকে এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রামকে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে বেশী ভাল করে বুঝতে পারে। তাই আমার এই স্থির বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে আমাদের এই সংগ্রাম জার্মাণী প্রভৃতি ত্রিশক্তিবর্গের ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আমরা যদি একাকী হই তাহলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই সত্যই কঠিন হবে।

শ্রীযুক্ত বসু এই কথা বলে শেষ করেন, "ত্রিশক্তিবর্গ" যে বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়ী হবেন ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের ফলে স্বাধীনতা লাভ করবে, এই উভয় সত্যই আমি গভীর আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি।"

—বার্লিন বেতার, আটাশে জুন, ১৯৪৩।

* * *

থায়ী সাংবাদিক এবং কয়েকজন বিদেশী সংবাদদাতাদের সম্মুখে বর্তমানে থাইল্যাণ্ডের অতিথি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটেনের পরাজয়-উদ্দেশ্যে তাঁর অকৃপণ চেষ্টা-সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি দেন "ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এক অভাবনীয় অবস্থায় এসে পৌছেছে। আমরা ভারতের জাতীয়দল, অস্ত্র-শক্তিতে বলীয়ান্ হ'য়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করবার জন্যে এখন অগ্রসর হ'য়ে চলেছি। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যখন এই সুসজ্জিত জাতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করবে, তখন ইংরেজের অধীনস্থ সমস্ত ভারতবাসীই আমাদের সানন্দে সম্বর্দ্ধনা জানাবে এবং সহস্র বাধা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করবে। এইরূপে সমগ্র ভারত-জাতিই স্বদেশ থেকে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করবার জন্যে অসম সাহসে যুদ্ধ চালাবে। অস্থায়ী ভারতসরকারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুর

মিথ্যা প্রচার-চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং সমগ্র ভারতীয় দল আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা-দানে কুন্ঠিত হবে না। যখন এই জাতীয় সেনাবাহিনী ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করে নূতন দিল্লীতে প্রবেশ করবে, তখন সারা ভারতের অধিবাসী স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠাকল্পে এক পরম ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে।

—ব্যাংকক্ বেতার, ৩০শে জুলাই ১৯৪৩।

* * *

জাপানী সংবাদদাতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিবৃতি দেন প্রাচ্য এশিয়ার ভারতবাসীগণ ধীরে ধীরে তাদের নূতন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠছে। তারা স্বজাতীয় ভাইদের স্বাধীনতা-অর্জ্জনে প্রাণপণ সাহায্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন যে ব্রহ্মদেশ সম্প্রতি যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তাতে প্রত্যেক ভারতবাসী উৎসাহিত এবং উল্লসিত বোধ করছে এবং ব্রিটিশশক্তিকে উন্মূলিত করতে তাদের সংকল্প আরও দৃঢ় হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে ভারতের জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য হ'ল এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে চালিয়ে যাওয়া এবং যখনি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তখনি তার পরিবর্ত্তে আসবে জনগণ-নির্ব্বাচিত এমন একটি শাসনপদ্ধতি যা দেশের সত্যিকারের প্রতিনিধি। শ্রীযুক্ত বসু এই বলে তাঁর মন্তব্য শেষ করলে যে "রক্তপাত করেও স্বাধীনতা লাভ করতে ভারতবাসীরা প্রস্তুত এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সঙ্গে যারা ব্রিটেনকে ভারতের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সাহায্য করছে, সেই সব আমেরিকান এবং চুংকিং সৈন্যদলকে বিতাড়িত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

—সিঙ্গাপুর বেতার, ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৩।

* * *

সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনের কার্য্য পরিদর্শন সমাধা করে ভারতীয় স্বাধীনতা-সম্মেলনের সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

বসু বর্ত্তমান পরিস্থিতি এক সাংবাদিক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দিন দিন সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাতের পর এক বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশ সামরিক শক্তি নির্ম্মমভাবে অবদমিত করেছে। আজো সে আন্দোলনের বহ্নি অনির্ব্বাণ। কিন্তু তার কার্য্যকরী শক্তি অনেকখানি অপহৃত। আমাদের দুটী পন্থা আছে, প্রথম পন্থা হচ্ছে; যে সব স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসীর মনোবলকে উৎসাহিত করবার জন্যে যথাসম্ভব কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের পবিত্র, মানসিক শক্তি-সাহায্য দান। যদি স্বাধীন ভারতে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে স্বদেশে ভারতবাসীদের সাহস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। আর দ্বিতীয় পন্থা হ'ল কার্যকরী সামরিক সাহায্য দান। এটা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে স্বদেশে ভারতীয় সৈন্যদল বাইরের ভারতবাসীদের প্রতি সহযোগিতাসূচক মনোভাব দেখাচ্ছে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশস্থিত আন্দোলনের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও সমর-কৌশলের ফলপ্রদ ঠিক সময় এখন এসেছে। স্বাধীনতা লীগের কর্ম্মপদ্ধতি সামরিক দিকের উপরেই বেশী জোর দেয়। সাম্প্রতিক সফরে আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করবার জন্যে এই বিদেশে সমস্ত ভারতবাসিরাই অত্যন্ত আগ্রহবান্ হ'য়ে রয়েছেন। আমি নিজে থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বিপুলসংগ্রাম এবং ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রনায়ক ডাঃ বা ম'র সঙ্গে নিজে দেখা করেছি। তাঁরা উভয়েই আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনে তাঁরা আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করবেন। আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রতিটি আয়োজন এখন সম্পূর্ণ ও প্রস্তুত! স্বাধীনতালাভের পরম আদর্শে আস্থাবান্ হয়ে আমরা আমাদের সহকর্ম্মীদের নাম নিয়ে এই চরম প্রতিশ্রুতি নিলাম যে আমরা বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করে আমরা লক্ষ্যের দিকে অকুণ্ঠ সাহসে অগ্রসর হবো।

—সিঙ্গাপুর বেতার, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একজন সংবাদদাতাকে একান্তে বলেন যে ভারতের স্বাধীনতার মাহেন্দ্র-যোগ এসেছে। তিনি বলেন যে এইবার জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতে অবস্থিত ইঙ্গ-আমেরিকান সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে। ভারতের জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে একাকী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তা নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সম্মিলিত শক্তি এইবার তাদের পিছনে রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে সব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাই থেকে শ্রীযুক্ত বসুর দৃঢ় প্রতীতি হয় যে ভারতে বর্তমানে এক গভীর রাজনৈতিক বিক্ষোভ চলেছে। শ্রীযুক্ত বসু আরও বলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠনের কথা শুনে সমগ্র ভারতবাসী উল্লসিত এবং তারা আগামী মুক্তিক্ষণের প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করেন যে থাই এবং ব্রহ্ম সরকার ইংরেজ প্রতিরোধী আন্দোলনে ভারতবাসিগণকে সম্পূর্ণ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী যুদ্ধে, ভারতের স্বাধীনতার শেষ পর্য্যায়ে ব্রহ্মদেশই শীঘ্র সমরকেন্দ্রে পরিণত হবে। শ্রীযুক্ত বসু এই মন্তব্য করে শেষ করেন যে ব্রহ্মদেশ সম্প্রতি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে বলেই ব্রহ্মদেশের জনগণ ভারতকে স্বাধীন দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

—রেঙ্গুন বেতার, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

এক বিশিষ্ট সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার যে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে তাতে ভারতবর্ষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ইঙ্গ-আমেরিকান দলই তার প্রধান শত্রু। তিনি আশা করেন সেদিনের আর বেশী দেরী নেই যেদিন ইঙ্গ-আমেরিকান ভালো করেই বুঝবে যে

এই সংগ্রাম ঘোষণা শূন্যগর্ভ তর্জ্জনমাত্র নয়। ভারতের অস্থায়ী সরকার এবং তার সেনাবাহিনীকে জাপান যে মেনে নিয়েছে তাতে ভারতবাসীদের শক্তি এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ভারতের জনগণের দুটি গভীর আকাঙ্খা পূর্ণ হ'য়েছে। এখন তৃতীয়টির উদ্দেশ্যে তাদের কাজ চালানো উচিত। সেই তৃতীয় উদ্দেশ্য হ'ল সে দেশমাতার মুক্তিকল্পে সাফল্যকামী সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করা। ভারতের মুক্তিলগ্ন যে আসন্ন এই বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের সীমা পানে এগিয়ে চলেছে। ক্ষুদ্র আয়তনের হ'লেও, এ বাহিনী অতি নিপুণকর্ম্মা এবং তার সফলতায় তাঁর গভীর আস্থা আছে।

শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে চুংকিং সরকারকে তিনি এই আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তাঁরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন—ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়সরকার কর্ত্তৃক সংগ্রাম ঘোষণার অর্থ কি। চুংকিংএর প্রতি বিশেষ কোন আবেদন এখনও তিনি জানান নি বটে। তবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কর্ত্তৃক বঙ্গ ও আসাম দেশ অধিকৃত হ'লেই ভারতীয়গণের প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করতে চুংকিংএর বিলম্ব হবে না। পরিশেষে শ্রীযুক্ত বসু ইঙ্গিত করেন যে ভারতের জাতীয় বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্রহ্মদেশের নির্ব্বাচন সত্যিই অর্থপূর্ণ।

—আজাদ হিন্দ্ বেতার, (সিঙ্গাপুর), ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৩।

* * *

একটি সাংবাদিক বৈঠকে, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়েছেন যে তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে যাবার আদেশের জন্য এবং ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সমুচিত অংশ গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহে অধীর হয়ে রয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে দলগুলি

ইতিমধ্যে শোনান্ পরিত্যাগ করে উত্তরাঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হ'য়েছে তারা সবাই আনন্দিত। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রাচ্য এশিয়ার সমগ্র ভারতীয় দলের এবং বলিষ্ঠ জাতীয় বাহিনীর বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সাহায্য অর্জ্জন করেছে। স্বদেশে যে জাতীয় আন্দোলন চলেছে তার সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে এবং ভারতবাসী মাত্রেই এই সরকারকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাই শত্রু পক্ষও ভারতের অস্থায়ী সরকারের গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছে।

টোকিওতে বিশেষ উদ্দেশ্যে আগমন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে তিনি জাপানে এসেছেন জাপানী সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে, যেহেতু ভারতের অস্থায়ী সরকারকে জাপানী সরকার স্বীকার করেছেন এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামে তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্ত্তমানে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের অস্থায়ী সরকারের এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে টোকিওর রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন। শেষ সাক্ষাৎকালের সময় জাপানী সরকারের সঙ্গে তাঁর যে হৃদ্যতা স্থাপিত হ'য়েছে, তাকে দৃঢ়তর করতে পারবেন বলে শ্রীযুক্ত বসু আশা করেন। এই ব্যক্তিগত সংযোগের মধ্যে আর একটা বড় ইঙ্গিত আছে যে জাপান এবং ভারতের অস্থায়ী সরকারের মধ্যে কি পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক বর্ত্তমান। তিনি বলেন যে জাপান সরকার ভারতের অস্থায়ী সরকারকে যে মেনে নিয়েছেন এতে ক'রে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব সম্পর্কে ব্রিটিশরা যে মিথ্যা প্রচার কার্য্য চালিয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অস্থায়ী সরকারকে আমাদের কয়েক-জন মিত্রশক্তি যে মেনে নিয়েছেন তাতে সকল ভারতবাসীই কি স্বদেশে, কি বিদেশে, প্রাণে নূতন বলসঞ্চার অনুভব করেছেন। ১৮৫৭ সালে

শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এই সর্ব্বপ্রথম নিজে হ'তে, স্বরাষ্ট্রিক পন্থায় ভারতবাসীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। অন্যান্য কয়েকটি জাতি নিজ নিজ স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাবার জন্যে যেভাবে চলেছে, ভারতের অস্থায়ী সরকার সেই পথেই আত্মশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও নিয়োজিত করেছে। দেশবরেণ্য খ্যাতনামা নেতাদের কারারুদ্ধ এবং ভারতবাসীগণকে অস্ত্রহীন করার ফলেই ভারতের অস্থায়ী সরকারের সংগঠন জরুরী হ'য়ে পড়ল। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকারের চরম লক্ষ্য হল ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং ভারতের জনগণ-নির্ব্বাচিত একটি স্থায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতি শাস্তি এবং সুশৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি আরও বলেন যে তাঁর অস্থায়ী সরকারের চরিত্র হ'ল সামরিক, কাজেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিণতির জন্য শেষ সংগ্রামে বিজয়লাভের জন্যই মাত্র সেই প্রয়োজনীয় বিভাগগুলিই খোলা হ'য়েছে। যে শুভ মুহূর্ত্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বদেশে প্রবেশ করবে সেই সময় অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলি গঠিত হবে।

১৯৪১ সালে স্বদেশ ত্যাগের পর থেকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু একথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে, যেসব বহুবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারত ত্যাগ করেন সে সমস্তই ঈশ্বরের কৃপায় আজ সফল হয়েছে। বাকী আছে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম এবং জয়লাভের চরম কল্পনা। বিদেশে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে এবং ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন তার কারণ এই যে সেগুলি ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। শ্রীযুক্ত বসু বলেন আগামী দিনের সূর্য্যোদয়ের মতই ভারতের আসন্ন মুক্তি সুনিশ্চিত।

মিত্রশক্তি এবং জাপানের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে ইঙ্গ-আমেরিকান দল একদিকে তারা নিজেদের

উচ্চ আদর্শ, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের কথা ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় আর অ্যাটলাণ্টিক চার্টারের গুণগান করে এবং অপরদিকে তারা ইরাণ ও ইরাকের মত ছোট ছোট জাতিদের দাসত্ববন্ধনে বেঁধে নির্ম্মম অত্যাচার করে। কিন্তু জাপানীরা তা করে না, বরঞ্চ এশিয়ার এতদিনের নির্য্যাতিত জাতিদের স্বাধীনতা দেবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা করছে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এবং অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে তাঁর কি পরিকল্পনা একথা প্রশ্ন করাতে শ্রীযুক্ত বসু জবাব দেন যে এই বাহিনী এত সুসজ্জিত, এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত, এত সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান যে কোন শত্রুই তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এই বাহিনীতে মহিলা সৈনিকদেরও নেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা পুরুষ সৈনিকদের চেয়ে দক্ষতায় কিছু কম নন। এর পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর চলে।

প্রঃ—ভারতে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং অস্থায়ী সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন?

উঃ—প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশ, এবং পরে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে অনশন-পীড়িত নরনারীর জন্যে ১০০০০০ টন চাল দেবার প্রস্তাব করেছিল এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলা হয়েছিল যেন এই চাল খালাস করে নেবার বন্দোবস্ত তারা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাবের কোন প্রত্যুত্তর দেয়নি। কিন্তু জাতীয় বাহিনী ভারতে যে রকম করেই হোক খাদ্যদ্রব্য পাঠাবার জন্যে স্থির সঙ্কল্প করেছে। একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে হবে।

প্রঃ—আন্তর্জ্জাতিক রেড্ ক্রস সোসাইটীর সঙ্গে ব্রহ্মদেশ চাল পাঠানোর ব্যাপারে কেন বন্দোবস্ত করেনি?

উঃ—যখন ব্রিটিশ সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতেই প্রস্তুত নয়, তখন রেড্‌ক্রস কি করতে পারে?

প্রঃ—ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করলে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সম্পূর্ণ

কৃতকার্য্য হবে এবিষয়ে কি আপনার পূর্ণ বিশ্বাস আছে? ভারতে যদি কোন বিদ্রোহ হয় সে সম্বন্ধে জাতীয় বাহিনী কি কোন ব্যবস্থা করেছে?

উঃ—ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত বারো হাজারেরও উপর ভারতীয় সৈন্য আমাদের নিশ্চিত আশ্বাস জানিয়েছে যে জাতীয় বাহিনী ভারতে প্রবেশ করবামাত্র তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের হাতে এই ভারতীয় সৈন্যরা লাঞ্ছিত এবং নির্য্যাতিত, তাই তারা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। ভারতের রাষ্ট্রবিধি এখন কিভাবে কাজ করছে, সে সম্বন্ধে আমি নিয়মিত সংবাদ পাচ্ছি। ভারতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের বিশ্বস্ত ভাবেই খবর জানিয়ে চলেছে। তেমনি আবার ভারতবর্ষেও আমাদের দলের এমন দায়িত্বপূর্ণ লোক আছেন যাঁরা বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সচেতন। অতএব দেশে এবং দেশের বাইরে ভারতবাসীদের মধ্যে একটা খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনার এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কি ভারতের জাতীয়-বাহিনীর কার্য্যকলাপ বেশ ভাল ভাবে তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করতে পারবে? এই বাহিনীর কি এমন রসদ ও অস্ত্রসজ্জা আছে যে বেশ কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালানো সম্ভব হবে?

উঃ—আমার বিবেচনায় এ অস্থায়ী সরকার অত্যন্ত কার্য্যক্ষম এবং আমাদের বাহিনী সুচারুরূপে সজ্জিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে দু'টি প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে—প্রথম, একটি জাতীয় বাহিনীর, দ্বিতীয়—এক জাতীয় সরকার। ভারতবর্ষে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানই আছে। তা ছাড়া শক্তিশালী জাপান ও জার্মাণীর স্বীকৃতি এবং পুরোপুরি সাহায্য ভারতবর্ষেরই দিকে।

প্রঃ—অনুমান করা হচ্ছে যে অস্থায়ী সরকারের কেন্দ্র শোনান্ থেকে

ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করা হবে। স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার এবং ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এখন কি ধরণের সম্বন্ধ ?

উঃ—অবস্থা অনুসারে সামরিক ঘাঁটি স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয়ত জবাব এই যে ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক এবং সৌহার্দ্যময়। একই পিতামাতার আমরা যেন দুই সন্তান। ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্থায়ী ভারত সরকারের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা জাপান অঙ্গীকার করে নিয়েছে। আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠান মিলে জাপানের একক অভিভাবকতায় একটি সুখী পরিবারের মতই বাস করছি।

প্রঃ—ভারতে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

উঃ—সে অবস্থা সাংঘাতিক। চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট যে ভারতবাসীদের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি তাতেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রিটিশ সরকার এবং তার মিত্রশক্তি আমেরিকা ভারতের দৈন্য-দুর্দ্দশায় সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্ব্বিকার। ব্রিটিশ সরকার এখনো পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। এমন কি ভারতবর্ষে খাদ্য আমদানী করবার জন্যে জাহাজ সরবরাহ করতেও ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছুক।

প্রঃ—অনুমান করছি যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আপনি কাজে পরিণত করেছেন,—একটি ভারতের জাতীয় বাহিনী সংগঠন, একটি ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, এবং জাপানের নিকট থেকে সম্পূর্ণ সাহায্যলাভ। এ ছাড়া, সুদূর ভবিষ্যতে আপনার আর কি কোন লক্ষ্যবস্তু আছে ?

উঃ—হ্যাঁ, আর একটি মাত্র, এবং সেইটিই আমার সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা। ভারতে জাতীয় বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া, স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা, আমাদের জন্মভূমি থেকে ইঙ্গ-আমেরিকানদের বিতাড়িত করা, ভারতে প্রবেশ করে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং আমার স্বদেশের লক্ষ লক্ষ নির্য্যাতিত, অবমানিত নরনারীর জন্যে,

শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধির বিধান করা। এইটাই কেবল অবশিষ্ট কাজ।

—টোকিও বেতার (হিন্দুস্থানী ভাষায়), ৩রা নভেম্বর, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

টোকিওতে, বৈদেশিক সংবাদদাতা একটি বিশিষ্ট বৈঠকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে ব্রহ্মদেশে অগ্রসর হওয়া ইংরেজের পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে কিন্তু আসাম অঞ্চলে অভিযানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী অসমর্থ হবে না। যখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আসামে প্রবেশ করবে তখন আসাম থেকে সরবরাহের রাস্তাটি খোলবার যে আশা চুংকিং সরকার পোষণ করে তা অচিরেই ধূলিসাৎ হবে। নেতাজী আরও বলেন যে ইঙ্গ-আমেরিকান এবং তাদের মিত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযানে আজাদ হিন্দ্ সেনাবাহিনী আপনার কার্য্যকলাপের কৃতিত্বপূর্ণ পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। নেতাজীর ধারণা এইরূপ যে ব্রিটিশের অধীনস্থ ভারতীয় সেনাদলের কয়েকটি দল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অস্বীকার করবে উল্‌টে স্বাধীনতার সেনাবাহিনীর স্বপক্ষেই যোগদান করবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজরা ভারতীয় সৈন্যেরা পাছে আরো ব্রিটিশের দল ত্যাগ করে চলে যায় সেইজন্যে সম্মুখ রণাঙ্গন থেকে তাদের সরিয়ে নিচ্ছে। এই দলচ্যুতি আরও বাড়তে থাকবে। নেতাজী বলেন, "যখন ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃত যুদ্ধ সুরু হবে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা ভারতে একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহের সুরু হবে।" চুংকিং সরকারের প্রতি ভারতীয় জনগণের উদাসীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করে নেতাজী বলেন যে ভারতবাসীদের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে এসেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালের চুংকিংএর প্রতি বহু-ভারতবাসীরই অনেকখানি সহানুভূতি ছিল। কিন্তু আজ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার কারণ যে চুংকিং সরকার

ভারত এবং ব্রহ্মদেশে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্রিটিশকে সাহায্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মদেশে চুংকিং বাহিনীর অগ্রগতি উল্লেখ করে নেতাজী বলেন যে এই সমস্ত কাজের জন্যই চুংকিং চীনের প্রতি ভারতবাসীর সহানুভূতি একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—টোকিও বেতার, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

সাইগন সাংবাদিকদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময়ে নেতাজী বলেন যে প্রাচ্য-এশিয়ার ভারতবাসীদের সহকর্ম্মিতায় এবং অজেয় জাপানের অমিতশক্তি-সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী লক্ষ কোটী নরনারীর উদ্ধারকল্পে শীঘ্রই ভারত অভিমুখে অভিযান স্থরু করবে। নেতাজী আরও বলেন যে সম্প্রতি টোকিওতে প্রাচ্য এশিয়ার নেতৃবর্গের যে সম্মিলনী হ'য়ে গেল তাতে পূর্ব্ব এশিয়ার একশত কোটীও উপর অধিবাসিগণের ভাগ্যলিপিতে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে। এই সম্মিলনের ফলে চুংকিংএর অধীনে বহু চীনার দৈন্য লাঘবের স্থবিধা মিলেছে। ভারতবাসীরা কিন্তু জানে যে প্রাচ্য এশিয়ার যুদ্ধ স্থরু হবার আগেই ইঙ্গ-আমেরিকান দলে যোগদান করে চুংকিং সরকার এই অসহায়, অশিক্ষিত চীনগণকে প্রতারিত করেছে। ইঙ্গ-আমেরিকান দল এশিয়ার অধিবাসীর স্পষ্ট শত্রু। একথা ভালোভাবে জেনেও চুংকিংএর বিশ্বাসঘাতকেরা ভারতে তাদের সৈন্যদল প্রেরণ করেছে। এই প্রসঙ্গে নেতাজী বলেন, ব্রহ্মদেশ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করা তাতে ভারতবাসীদের বেশী সহায় হবে এবিষয়ে স্বাধীনতা লাভে জাপানের শক্তি সবচেয়ে বেশী সহায় হবে এবিষয়ে ভারতের দৃঢ় আস্থা আছে। ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে পৃথিবীর জনমত সম্পর্কে মন্তব্য করে নেতাজী বলেন, "যদিও ইংরেজ ও আমেরিকান সরকার আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করেনি,

তবুও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর উপর এর প্রভাব আশ্চর্য্য রকমের কার্য্যকরী হ'য়েছে।"

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন, তামিল ভাষায়) ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৩।

* * *

ব্রহ্মদেশের কোন এক স্থানে এক সাংবাদিক বৈঠকে আজাদ হিন্দ্ অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেন যে জাপানী সমর-কুশল অভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কথাবার্ত্তার ফলে স্থির হ'য়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অতি শীঘ্রই অভিযান সুরু করবে। তিনি প্রকাশ করেন যে জাপান এবং জার্মাণ সরকারই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে চরম অভিযান প্রাণপণ সুরু করেছে। তাঁর আশা এই যে অন্তিম যুদ্ধে জাপান ও জার্মাণি শীঘ্রই তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

নেতাজী এই আশা পোষণ করেন যে যুদ্ধের এই নূতন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখাবে। তাঁর স্থির বিশ্বাস যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইংরেজ দস্যুদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে কৃতকার্য্য হবে। জাপানীদের বিশিষ্ট আকাশ-আক্রমণ বাহিনীর প্রশংসা করে নেতাজী বলেন যে এই বাহিনীর সৈন্যগণের অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যগণও বীর জাপানী সৈন্যদের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ ক'রে শীঘ্রই অসম সাহসে ও দৃঢ়সঙ্কল্পে যুদ্ধ চালাবে এবং অবশেষে দেশমাতাকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে।

ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের পাল্টা আক্রমণ প্রসঙ্গে নেতাজী বলেন, "ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করবার জন্যে ইংরেজের এটা প্রথম প্রচেষ্টাই নয়। বর্ত্তমান বড়লাট ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করবার জন্যে প্রথম চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা আরাকানে সাংঘাতিক ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। এর পরে মাউণ্টব্যাটেন আর একবার চেষ্টা করেন, সেবারেও অনেকখানি দাম

দিয়ে অতি তুচ্ছ ফল লাভ হয়। দ্বিতীয় আরাকান অভিযানের ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইম্ফল এবং কোহিমা পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে প্রবেশ করে। বর্ত্তমানে মাউণ্টব্যাটেন আর একবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টা অনেকখানি সফল হ'য়েছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে শত্রুপক্ষের এই সামান্য জয়লাভে আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং জাপান বাহিনীর অদম্য শক্তির ও মনোবলের বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না। কারণ তারা ভালো ভাবেই জানে যে যখন ভারত-জাপানের মিলিত সৈন্যদল পাণ্টা আক্রমণ সুরু করবে তখন ব্রিটিশরা পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হবে। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি মোটেই ইংরেজের অনুকূল নয়। কেন না, ব্রিটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যের অধিকাংশ লোকই তাদের হ'য়ে লড়াই চালাতে অনিচ্ছুক। ইংরেজের অধীনে ভারতীয় সৈন্যদল আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। যেহেতু তারা বুঝেছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বদেশের মুক্তির জন্যই যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমার এই দৃঢ় ধারণা যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সংস্পর্শে এসেই তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বপক্ষে যোগদান করবে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কর্ত্তব্যানুরাগ এবং আত্মশক্তি অতি উঁচু দরের। আমাদের সৈন্য এবং উচ্চ কর্ম্মচারীরা স্বদেশ মুক্তির শপথ নিয়েছে। হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যুই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। "রক্ত, রক্ত চাই"—এই হ'ল আমাদের সেনাবাহিনীর রণতূর্য্য। ভারতের এই জাতীয় বাহিনীর সমস্ত লোকই জানে যে ইংরেজের দাসত্ব থেকে আটত্রিশ কোটী দেশবাসীকে মুক্ত করবার পবিত্র পণে তারা আবদ্ধ। যারা বিশ্বাস করে যে ইংরেজরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে, তারা মস্ত ভুল করেছে। যদি তারা শুধু জানত ভারতের জাতীয় বাহিনী এবং মিত্রপক্ষ জাপানী সৈন্যদলের কি অপরাজেয় শক্তি, তাহলে তারা কখনই এই আহম্মকীর স্বর্গে বাস করত না।

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন যে পূর্ব্বেকার অভিযানের ফলে আজাদ

হিন্দ ফৌজ অনেকখানি কর্ম্মতৎপর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং গত বছরের সামরিক ঘটনা থেকে এই-ই প্রমাণ হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ব্রহ্মদেশে জাপানী সৈন্যশক্তি ইঙ্গ-আমেরিকান সামরিক শক্তি থেকে অনেক বেশী বলবান্। যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ চালায় তখন শত্রুপক্ষ হয় পরাস্ত হয়েছিল নয়ত তাকে পিছু হটতেঁ হ'য়েছিল। ইঙ্গ-আমেরিকানদের প্রাণপণে লড়াই চালাতে হ'য়েছিল। এবং রণক্ষেত্রের সকল অংশেই তাঁদের অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হ'য়েছিল। নেতাজী বলেন যে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্ষা স্থরু হবার পরে বিশেষ সামরিক কারণে অপসরণ করেছিল, মাত্র তখনই ইংরেজ সৈন্যদল এগিয়ে আসতে পেরেছিল। শ্রীযুক্ত বসু এই মন্তব্য করে শেষ করেন "ভারতের মুক্তি এখন কেবল সময় সাপেক্ষ। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সামরিক নিয়ম পালনে সুশিক্ষিত, শক্তিশালী আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করবেই এবং ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবেই। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি দেখিনা যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়মণ্ডিত অগ্রগতির পথে বাধা দেবার ক্ষমতা রাখে।"

স্বাধীন ভারত বেতার, (সাইগন) ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৪।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দেন: "একদিকে যেমন জাপানী সৈন্যদলের সহযোগিতায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইঙ্গ-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্য্য চালাচ্ছে, অপর দিকে তেমনি মুক্ত দেশগুলির পুনর্গঠন কার্য্যে প্রভূত চেষ্টা করা হচ্ছে। নূতন শাসনপদ্ধতির মুখ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা যাতে ভারতীয়দের উন্নততর জীবনযাপনে সাহায্য হয়। গত মাসের মধ্যে প্রাচ্য এশিয়াস্থিত ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছে। একজন বড় ব্যবসায়ী সম্প্রতি তাঁর কারখানাগুলি

আমাদের জিম্মায় বিনা সর্ত্তে দান করেছেন, আর একজন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাদের কাজে উৎসর্গ করেছেন। শত্রুপক্ষের ও ভারতবাসিগণের ওপর এই জাতীয় বিদ্রোহের ফলাফল এবং প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ ব্রিটিশ সরকার যে ভাবে চেপে রেখেছেন, তাতে সমগ্র ভারতবাসীই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমেরিকান এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের মারফৎ তারা ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্যের কথা জানতে পেরেছে। তাই, জাতীয় বাহিনীর স্বপক্ষে যোগদানকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

—রেঙ্গুন বেতার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৪।

* * * *

শুক্রবার সংবাদদাতাদের নিকটে শ্রীযুক্ত বসু এই বিবৃতি দিয়েছেন: "অতি সত্বরই ভারতের মুক্তিলাভ হবে, এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অটল আছে।" শ্রীযুক্ত বসুর বক্তব্যের সারাংশ এই: "ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী যে অপরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছে সে কথা বাদ দিয়েও বলা চলে, কোহিমার পতন সারা ভারতের ওপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবেই। কোহিমার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইম্ফল অধিকার অবশ্যম্ভাবী। ভারতবাসীরাও তাদের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম স্বদেশে স্বজাতীয় রাষ্ট্রের অধিকার পাবে। অস্থায়ী সরকারের আগামী কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে সরকারী বিলম্ব যাতে না হয় এবং জনগণ যাতে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। অস্থায়ী সরকারের আদর্শ হ'ল ভারতের জনসাধারণের মুক্তিসাধন। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে ব্রিটিশ সরকার কি ভাবে আমাদের সৈন্যশক্তি ক্ষয় করে' আমাদেরই যুদ্ধোপকরণগুলো আপনার স্বার্থে নিয়োজিত করতে ব্যস্ত। অস্থায়ী সরকার জনসাধারণেরই রাষ্ট্রীয়

প্রতিষ্ঠান এবং যতদিন না স্থায়ী রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হয়, মাত্র ততদিনই তার মেয়াদ।”

—রেঙ্গুন বেতার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৪।

*　　*　　*　　*

জাপানী পত্রিকা 'ইয়োমিয়ুরি হোচি'র সামরিক সংবাদদাতার সাক্ষাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই মতামত দেন—“আমাদের অগ্রগতি রোধ করবার উদ্দেশে ইংরেজরা কি ফন্দী এঁটেছে সে সংবাদ আমার কাছে গৌণ, কারণ তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'বে। ১৯৪১ সালে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে যখন আমি ব্রিটিশ কয়েদ থেকে পালিয়ে আসি, সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাকে ধরবার সমস্ত চেষ্টাই তাদের বিফল হয়েছে। এখন আমাদের ভারত-প্রবেশের পথ বন্ধ করবার জন্যে ব্রিটিশরা ইন্দো-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে এক বিশাল বাহিনী খাড়া করেছে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সামনে আজ ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে কি সাহস ও কৃতিত্বের সহিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ওদের রক্ষণভাগ ছিন্ন করে' ভিতরে প্রবেশ করেছে। অতি শীঘ্রই এ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদ করবে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতির মুখ্য ফলেই মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছুক কিন্তু সেখানেও তাদের আরেকবার পরাজয় হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন কলকাতা শহরে প্রবেশ করবে, মহাত্মাজী সোল্লাসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার পাঠাবেন। ঠিক এই সময়েই ভারতীয়দের সাহায্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হবে। স্বাধীনতা পেতে হলে দুটি জিনিষের দরকার:— প্রথম মহৎ ও উচ্চ আশা, দ্বিতীয়, স্বনির্ব্বাচিত পথ থেকে তিলমাত্র ভ্রষ্ট না হওয়া। যতদিন না ভারত স্বাধীন হয়, আজাদ হিন্দ ফৌজ ততদিন লড়াই চালাবে। এই বাহিনীর কার্য্যকলাপের ফল, ধীরে ধীরে হলেও,

যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ছে তাতে আমি পরম আনন্দিত। যে সব মহাপুরুষ দেশের জন্য আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন সেই পূর্ব্বগামিদের প্রতি আমাদের সৈন্যবর্গের শ্রদ্ধা অসীম। স্বাধীনতার তৃষ্ণা এদের অদম্য। যাঁরা স্বদেশ-স্বাধীনতার জন্য আত্মদান করলেন তাঁরা চিরশান্তি পেলেন কিন্তু তাঁদের আত্মা সুখী হবে একমাত্র তখনই, যখন ভারত স্বাধীন হবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য, এই আদর্শগুলি স্মরণ করে কাজ করে যাওয়া।

—রেঙ্গুন বেতার, ১৮ই মে, ১৯৪৪।

* * * *

জাপানী এক সামরিক সংবাদদাতার সহিত নেতাজী বসুর এই মর্ম্মে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলেন যে ব্রিটিশ কোন মতেই আজাদ্ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না, কারণ এই জাতীয় বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক শেষক্ষণ পর্য্যন্ত লড়াই চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং সহযোগী জাপানী সেনাদলের কার্য্যকারিতায় তাঁর যথেষ্ট আস্থা আছে। এই সূত্রে নেতাজী আরো বলেন যে মহাত্মাজীর কারামুক্তি ইংরেজের ক্রম-বর্দ্ধমান দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। মুক্তিসংগ্রামের সেনাবাহিনীর অগ্রদূত হিসেবে তাঁকে অভিনন্দন দেবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি-গঠনের যে প্রতিশ্রুতি মহাত্মাজী দিয়েছিলেন, এইবার বুঝি তা সফল হবে। এই ফৌজের সমস্ত সৈনিক এবং কর্ম্মচারী শপথ নিয়েছে যে ভারত যতদিন না স্বাধীন হবে ততদিন তারা অস্ত্র ত্যাগ করবে না। নেতাজীর দৃঢ় ধারণা যে অদূর ভবিষ্যতেই ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।

জাপানী সংবাদদাতা বলেন যে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য-দলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ও আড়ম্বরহীন সাধারণ সৈনিকের মত জীবনযাপন করেন। তাঁর অধিকাংশ

সময়ই চলে যায় শিবির-ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে, তাই রাত্রে তিন ঘণ্টা কালও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করেন না।

—রেঙ্গুন বেতার, ২১শে মে, ১৯৪৪।

"স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত আমাদের সামরিক সংবাদদাতার যে সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়, তা' ইন্দো-ব্রহ্ম যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেচে। শ্রীযুক্ত বসু আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, "যদিও কলকাতা থেকে অন্তর্দ্ধানের সময়ে কয়েক সহস্র মুদ্রা আমায় ধরবার জন্যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবুও আজ প্রায় চার বছর হ'ল আমি পালিয়ে এসে রয়েছি। তাব পর থেকেই ইংরেজ সরকার ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তকে একটা সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে যাতে আমি জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে স্বদেশে ফিরে তার বন্ধনদশা ঘোচাতে না পারি। সে যাই হোক্, আমাদের স্বাধীন ভারতীয় সৈনিকদল নিজেদের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে। তারা নিশ্চিত জানে যে ইংরেজ শক্তি যতই দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত হোক্, ভারত স্বাধীন করবার প্রচেষ্টায় আমাকে অথবা আমার সঙ্গীদের কোনো বাধা দেবার ক্ষমতা তার নেই। সময় ও সুবিধা পেলে (এবং সে সুযোগ বর্তমানে এসেছে) আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য।"

ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে মহাত্মাজী একটি গোপন বৈঠকে আমায় ডাকিয়ে বলেছিলেন যে যদি আমি সশস্ত্র প্রতিরোধে কৃতকার্য্য হই, তাহলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাকে তার-যোগে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার স্থির বিশ্বাস, যে দিন আমি কলকাতায় আবার ফিরব, সেদিন গান্ধিজী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন।"

—বার্লিন বেতার, ২২শে মে, ১৯৪৪।

*　　*　　*　　*

অস্থায়ী ভারত সরকারের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু (বর্ত্তমানে জাতীয় বাহিনী-সহ ভারতে অবস্থিত) সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতি দিয়েছেন, "জার্মাণী শত্রুপক্ষের আক্রমণ-চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করবে, যে চেষ্টা মস্কোর চাপেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ব্রিটেনের নিয়তি শেষ দশায় আর পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য-বিস্তারে ইয়াঙ্কিদের অলস স্বপ্ন চূর্ণ হতে আর দেরি নেই। দুই সপ্তাহ ধরে কড়া যুদ্ধের ফলে তাদের কত ক্ষতিই না হয়েছে! শত্রুরা এখন দেখতে পাচ্ছে ফ্রান্সে তাদের অধিকারে আর একটিও বন্দর নেই। এখনও, এই মুহূর্ত্তে, ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধকামী কর্ত্তৃপক্ষেরা আঘাতের পরে আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে এবং আমার মনে হয় এইবার তারা বুঝতে পারছে যে তাদের নিজেদের হঠকারিতায় মূর্খের মত আত্মহত্যার কত কাছে তারা এগিয়ে এসেছে। জার্মাণরা বায়ুগ্রস্ত, বাক্‌সর্ব্বস্ব ইংরেজদের ঠিক বিপরীত। অসম সাহসে, আত্ম-সমাহিত হ'য়ে তারা আপন কর্ত্তব্য করে চলেছে এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তারা জয়ের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

—বার্লিন বেতার (বাঙলা ভাষায়), ২১শে জুন, ১৯৪৪।

*　　*　　*　　*

সিঙ্গাপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, যদিও তিনি গত কিছুকাল ধরে দেশ ছাড়া, তবু স্বদেশকে বোধ হয় যে কোনো তিনি ভালোই চেনেন। নেতাজী বলেন, "আমি জানি যে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের সদস্যদের অধিকাংশই এবং জনসাধারণের বেশির ভাগ লোকই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনো রকম আপোষে মিটমাট করার ঘোর বিপক্ষে। কারণ যাঁরা প্রকৃত ভারতীয় নামের যোগ্য তাঁরাই কায়মনোবাক্যে কামনা করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ অপসারণ।

এই কারণেই ইংরেজ সরকার যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ভারতবর্ষের হয়ে কথা বলার যোগ্যতা আছে, তাঁদের সকলকেই কারারুদ্ধ করে রেখেছে। "ভারত ছাড়" প্রতিজ্ঞাটি আর কিছু নয়, সমগ্র ভারতবাসীর অদম্য ইচ্ছাশক্তির এবং মনোভাবের একটি উপযুক্ত ভাষা মাত্র।" শ্রীযুক্ত বসু বলেন, "বিগত মহাযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির তরফে ছিল বলেই ইঙ্গ-আমেরিকান দল পশ্চিম য়ূরোপে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে তাদের সামরিক প্রয়োগ-ব্যাপারে স্বাধীনতা পেয়েছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন-কারীরা বাইরের থেকে যুদ্ধোপকরণ আমদানি করতে পারেননি, তার কারণ সমুদ্রপথে ছিল জাহাজাদি দ্বারা অবরোধ আর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশ-পথে ছিল কড়া পাহারা। কিন্তু এইবার মুক্তি-সেনারা পূর্ব্ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ভারতে হানা দিতে পেরেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে, শত্রুশক্তি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দ্বিধাবিভক্ত। আর জাপানী নৌশক্তির হাতে মিত্রপক্ষের পরাজয় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নতুন জীবন সঞ্চার করেছে।

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন যে টলমলায়মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এসেছে। আমেরিকানদের সাহায্যে দাঁড়-করানো যে সাম্রাজ্য হংকং থেকে চিন্দউইন নদী পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়েছে, তাকে আর বাঁচানো যায় না। শ্রীযুক্ত বসুর মতে দুটি বড় দরের প্রশ্ন এখন আমাদের মনোযোগ দাবী করে—প্রথমটি এই যে ব্রিটেন যে সব দেশভাগ হারা'ল তা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হ'বে? আর দ্বিতীয়টি হ'ল—আমেরিকানদের শক্তির সাহায্য নিয়ে ইংরেজরা ভারতের ওপর প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হবে কিনা? প্রথম প্রশ্নটি অবিশ্যি কিছুদিন যাবৎ তাঁকে ভাবিয়েছিল, যতদিন না মিঃ রুজভেল্ট প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন যে "আমেরিকানরা এখন য়্যুরোপের পশ্চিম খণ্ডেই তাদের শক্তি ও উদ্যম প্রয়োগ করছে।" শ্রীযুক্ত বসুর অভিমত এই—"যদি আমেরিকাকে য়্যুরোপ ও এশিয়া উভয় রণাঙ্গনেই একসঙ্গে যুদ্ধ চালনা করতে হয়,

তাহলে আমেরিকান জাতির কর্ম্মপ্রীতি ও কর্ত্তব্যানুরাগ বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। এই যুদ্ধে সর্ব্বস্ব-পণ করে বাজি লড়বার মত অবস্থা তার নয়। 'হয় লড়, নয় মর'—এই যে মনোভাব, যেটা যুদ্ধজয়ের অপরিহার্য্য মন্ত্রবিশেষ এবং যেটি জাপানী শক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট, তা আমেরিকার মধ্যে বিলকুল নেই। এই মনোভাবটাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করবে। ইঙ্গ-আমেরিকানরা খুব সজোরে বলে বেড়াচ্ছে যে আগে য়্যুরোপে জার্ম্মাণীকে খতম্ করে তারপর জাপানকে দেখে নেবে। এখন বসে বসে দেখা যাক্ য়্যুরোপে ঘটনা কোন্ পথে চলে।" শ্রীযুক্ত বসু এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে য়্যুরোপের যুদ্ধশেষে মিত্রশক্তি সম্পূর্ণভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কাজেই জাপানকে পরাস্ত করার মত অবস্থা তখন আর থাকবে না। দু-মুখো যুদ্ধ কতদূর আত্মঘাতী হয়, ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেবে।

শ্রীযুক্ত বসু এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—"ব্রিটেন ও আমেরিকা যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে নিজের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যেই তারা লড়াই করছে তা সত্যি নয়। তারা চায় পৃথিবী-জোড়া আধিপত্য, কাজেই বেশী দিন তাঁরা টিকতে পারে না। অফুরন্ত উৎপাদন-শক্তির জোরে কোনো জাতিরই মনোবল সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইঙ্গ-আমেরিকানরা যদি এই যুদ্ধে য়্যুরোপে জয়লাভও করে, তাহলেও তাতে জাপানের বিপদাশঙ্কা নেই, কারণ যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে জাপানও তার উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়েছে। আমেরিকা দ্বারা জাপানের পরাজয় কেমন করে সম্ভব, তা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। অবিশ্যি, আমেরিকা কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দ্বীপ অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, জাপানের সুরক্ষিত ভিতরের গণ্ডিতে প্রবেশ করাটা সহজসাধ্য নয়।"

'ভারত স্বাধীনতা পাবে কি না?' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত বসু বলেন—ভারতের পূর্ব্ব দরজা খুলে যাওয়াতে বর্ত্তমানে অবস্থার বহুল

পরিবর্ত্তন হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়দের অস্থায়ী রাষ্ট্র নয়টি মিত্র পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। প্রাচ্য এশিয়ার এই সব ভারতবাসীদের মধ্যে কোনো অন্তর্বিবাদ নেই, যেটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশের হাতে মস্ত অস্ত্র। এরা শপথ নিয়েছে যে নিজেদের সেনা-বাহিনীর সাহায্যে এরা স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন করবে। একাজে জাপান সরকার এবং অন্যান্য মিত্রপক্ষের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য মিলেছে। আইরিশ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে, শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন, যে মাত্র ৫০০০ আয়র্লণ্ড-বাসী ৫০,০০০ ইংরেজের উচ্ছেদ করেছে। ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে যারা দলত্যাগী, আর যে সব জাতীয় কর্ম্মী গোপনে ভারতে কাজ চালাচ্ছেন—উভয়েরই প্রেরিত সংবাদ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন এবং নিঃসংশয়ে বলতে পারেন যে ভারতের মুক্তিক্ষণ সমাসন্ন। অবশ্য, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন খুব কঠিন ও বিঘ্নসঙ্কুল হবে, কেননা ব্রিটিশদল ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তবে একথা নিশ্চিত, ভারতের জয় ও মুক্তি অনিবার্য্য।

—আজাদ হিন্দ রেডিও (সিঙ্গাপুর), ৯ই জুলাই, ১৯৪৪।

*　　　*　　　*

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় সামরিক কেন্দ্রে এক সাংবাদিক বৈঠকে নেতাজী বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন—"আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনার গতি আমি খুব মনোযোগের সহিত এবং আশান্বিত হৃদয়ে অনুধাবন করছি। গত বৎসর আমাদের কার্য্যকলাপের একটা মোটামুটি নির্দ্ধারণ করলেই আমরা সঠিক ধারণা করতে পারি যে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর করে উঠতে পারবো। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়ই আমার পিছনে রয়েছেন

এবং আমাদের সমস্ত শক্তি ও রসদের প্রয়োগে পূর্ণোদ্যমে সহযোগিতা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। স্বদেশভূমির সীমান্ত রেখা আমরা অতিক্রম করেছি এবং ভারতে কয়েকটি রণক্ষেত্রে শত্রুকেও বিপর্যস্ত করেছি। এমন এক সময় গিয়েছে যখন কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের জাতীয় বাহিনী আবার ব্রিটিশসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে তাদের পরাস্ত করবে! আমরা কৃতিত্বের সহিত সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছি বলে এখন বলতে পারি যে শেষের জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয়েছে এবং ভারতের মাটিতেই সে যুদ্ধ চলেছে। এখন এ লড়াই আমাদেরই, সম্পূর্ণ নিজস্ব।"

"শত্রুপক্ষ দাবী করছে যে গত কয় সপ্তাহ ধরে আমাদের অগ্রগতি আর তেমন সত্বর হচ্ছে না। এটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। একাধিকবার আমি স্বদেশবাসীদের একথা জানিয়েছি যে প্রকৃত লড়াই সুরু হবে তখনই, যখন ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে আমরা স্বদেশে প্রবেশ করব। আমিও এই চরম ক্ষণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। 'দিল্লী চলো' রব যখন উঠেছিল তখন আমাদের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আজও আমাদের সেই আত্মপ্রত্যয় অটুট রয়েছে। আপনারা জেনে রাখুন যে সম্মুখ রণাঙ্গনে সৈন্যদের কাছ থেকে এ যাবৎ আমি একটিমাত্র অভিযোগই পেয়েছি—সেটা হ'ল শেষ সংগ্রাম আরম্ভের বিলম্ব-সম্পর্কে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব সৈন্য এখন হাসপাতালে রয়েছেন, তাঁরা একটি কামনাই জানাচ্ছেন যে সুস্থ হয়ে উঠবামাত্রই তাঁদের যেন আবার যুদ্ধের পুরোভাগে পাঠানো হয়। জয়ের আশা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাসের তিনটি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথম—স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রগঠন, দ্বিতীয়—জাতীয় বাহিনী কর্তৃক ভারতে প্রবেশলাভ এবং পরবর্ত্তী সাফল্য আর তৃতীয়—ইন্দো-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে আমাদের স্বপক্ষে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা। শত্রুপক্ষ যখন দূরত্ব-বিভক্ত বহু ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে যাতে করে' তার যুদ্ধের রসদের বিশেষ অপচয় ঘটেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের উপকূলে, শত্রুপক্ষের অবতরণ ব্যাপারটিও আমাদের আনুকূল্য করেছে।"

সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধের, বিশেষ করে' য়ুরোপ-খণ্ডে যুদ্ধ-পরিস্থিতির আলোচনা করে নেতাজী অভিমত প্রকাশ করেন, "স্বাধীনতা-লাভের সুবর্ণ সুযোগ এখন ভারতের করতলগত। আমাদের শত্রুপক্ষ এখন চতুর্দ্দিকেই জড়িত—বিপর্য্যস্ত। এই হ'ল আমাদের চরম সুযোগ। যদি শত্রুদল আরও কিছুটা সময় পেয়ে যায়, তাহলে ফ্রান্সে অথবা অন্যান্য রণক্ষেত্রে যে সব সৈন্য যুদ্ধকার্য্যে আবদ্ধ, তাদের শীঘ্রই এনে ফেলবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে লড়বার জন্যে। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে ফ্রান্স থেকে ইঙ্গ-আমেরিকান দলকে জার্ম্মাণী নিষ্কণ্টকরূপে শেষ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করবে।"

ভারতবর্ষ এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতাজী মন্তব্য করেন—"ভারত ছেড়ে যাও"—এ দাবীর পুনরুক্তি করেছেন মহাত্মা গান্ধী। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ভারতের জনসাধারণ কোনো সর্ত্ত বা চুক্তি চায় না।" তিনি আরও বলেন, "সম্প্রতি গান্ধী-ওয়াভেলের যে সব চিঠিপত্র-আদান-প্রদান প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে গান্ধীজীকে শীঘ্রই আবার কারারুদ্ধ করা হবে। অবস্থা-বৈগুণ্যে জনসাধারণের স্থির প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে। ইংরেজের আনুগত্য এবং বশ্যতা থেকে মুক্তি পেতে হলে ভারতবাসীদের নিজেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে হবে। অতএব তাঁদের উচিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করা, যাতে জয়লাভের চরম মুহূর্ত্তটি অনিবার্য্য গতিতে এগিয়ে আসতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর ভারতের জাতীয়তা- বাদের মধ্যে কোনো আপোষ হওয়ার আশা-সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নেই।

—টোকিও রেডিও, ৫ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের নিকট জাপানের আশ্চর্য্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে ফরমোজার যুদ্ধ সম্পর্কে আমি এক বিবৃতি দিয়েছিলাম এবং আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম যে শত্রুর হাতে প্রথম পদক্ষেপের অধিকার আর থাকবে না। এ কথা বলেছিলাম যুদ্ধের ফলাফলে অবস্থাবৈগুণ্যে তারতম্য ঘটে বলেই মানুষের মনে কিছু পরিমাণ সংশয় আসা স্বাভাবিক। এখন আমাদের মিত্রপক্ষেরা জয়ী হচ্ছে। য়্যুরোপে যুদ্ধের বর্ত্তমান গতি এবং জার্মাণ সেনাবাহিনীর সাফল্য সুদূর প্রাচ্যের সাধারণ যুদ্ধাবস্থিতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। য়্যুরোপে ঘটনার মোড় যে ভাবে ঘুরেছে তাতে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন আসন্ন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় এবার শেষ হ'ল বলে আর তৃতীয় ও শেষ অধ্যায় চক্রশক্তির অনুকূলেই গ'ড়ে উঠবে। ফিলিপাইন যুদ্ধের গুরুত্বের আরো একটি কারণ রয়েছে—সে হ'ল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকান লোক-বল কমে যাবে এবং জনসাধারণের দৃঢ়চিত্ততা অনেকখানি শিথিল হবে।" পরিশেষে নেতাজী ইঙ্গিত দেন যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে ইঙ্গ-আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদ গভীরতর হবে।

নেতাজী খুব জোর দিয়ে বলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের অবস্থা থেকে প্রকাশ হয় যে আক্রমণের প্রথম অধিকার চক্রশক্তির হাতে চলে এসেছে এবং যুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায় সুরু হবে তাদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি বলেন, যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে শত্রুপক্ষের যে পাল্টা আক্রমণ চলেছিল, তা এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর মতে প্রশান্ত সাগর রণাঙ্গনে জাপানীদের সাফল্য যে ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কৃতিত্বপূর্ণ যুদ্ধ-পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করবে, এটা অবশ্যম্ভাবী।

য়্যুরোপখণ্ডে জার্মাণদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জার্মাণ জাতির অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সাহস ও জাতীয়তাবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলেন যে জার্মাণ জাতিকে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য কাজ, যেহেতু সমগ্র জাতিই তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিতে অস্ত্রধারণ করেছে। ইঙ্গ-আমেরিকান প্রচার বিভাগ যে রটনা করছে যে য়্যুরোপীয় সমরক্ষেত্রে শান্তি স্থাপিত হলেই মিত্রপক্ষের সৈন্যবর্গকে প্রশান্ত সাগরের রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করে' শক্তি-সমাবেশ করা হবে, এ সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রচার। নেতাজী বলেন, "এটা নিতান্তই প্রচার বিভাগের প্রলাপ, যেহেতু জার্মাণী পরাজয় স্বীকার করলেও তাকে চেপে রাখার জন্যে মিত্রপক্ষের পূর্ণ শক্তিরই প্রয়োজন। তা ছাড়া সোভিয়েট য়্যুনিয়ন এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সদ্ভাবসূচক বন্ধনসূত্র নেই; সেই কারণে য়্যুরোপে পূর্ণ সামরিক শক্তি বজায় রাখা দরকার হবেই। তাদের প্রাণে যথেষ্ট ভয় আছে, পাছে বল্‌শেভিকরা সারা য়্যুরোপে তাদের প্রভাব বিস্তার করে বসে।" নেতাজীর বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে নূতন ঘটনা ও অবস্থার উদ্ভবে ইঙ্গ-আমেরিকান দলের পরাজয় সুনিশ্চিত।

শত্রুপক্ষের ইদানীং পাল্‌টা আক্রমণ এবং সহসা চড়াও হয়ে যুদ্ধ চালনার কথা-প্রসঙ্গে নেতাজী মন্তব্য করেন যে ইংরেজ ও আমেরিকানদের সত্যিকারের ভয় রয়েছে যে যুদ্ধ যদি বেশি দিন ধরে বিলম্বিত হয়, তাহলে লোকবলের ঘাঁট্‌তি এবং ক্ষয় হবেই। তাই যত শীঘ্র হোক্ এ যুদ্ধ শেষ করতে তারা অধীর হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে নেতাজী জড়বাদ অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বের তুলনা করে বলেন যে আধ্যাত্মিক শক্তিতেই তিনি বিশ্বাসী, কেননা এই শক্তিই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়। তিনি বলেন আজাদ হিন্দের অস্থায়ী রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রাচ্য এশিয়াস্থিত ভারতীয়গণের আত্মিক এবং প্রাকৃতিক উপাদানের যাবতীয় শক্তির একত্র নিয়ন্ত্রণ এবং আগামী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'বার উদ্দেশ্যে

অতীতের কর্ম্ম-লব্ধ অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক প্রয়োগ। ভারতীয় সৈনিকরা যে যুদ্ধবিরতি কামনা করে না এবং তাদের কর্ত্তব্যানুরাগ যে অতি গভীর সে কথা নেতাজী বার বার বলেন।

ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতাজীর অভিমত এই যে ফিলিপাইন এবং তাইওয়ানের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হওয়াতে ভারতবাসীরা পরম উল্লসিত। শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশরা যে উচ্ছিন্ন হবে সে বিষয়ে তাদের আশা বৃদ্ধি হচ্ছে।

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন) ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

* * *

বর্ম্মায় এক সাংবাদিক বৈঠকে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ফিলিপাইন যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী সৈনিকদের সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "গোড়াতেই শত্রুপক্ষের তথাকথিত জয়লাভ আমরা খতম করে এনেছি। এখন যুদ্ধের মোড় ফিরেছে এবং ফিলিপাইন ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এখন চলেছে, তার ফলাফলের ওপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমাদের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য জয়লাভ হয়েছে এবং শত্রুর ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তি সত্ত্বেও আরো হবে। এখন চারিদিকে এই যুদ্ধের আরেকটি অধ্যায়ের কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু আমি বলি যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায় ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। আমরা এখন শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌছেচি। ফিলিপাইন যুদ্ধের ওপরই ইন্দো-ব্রহ্ম রণক্ষেত্রে আমাদের কাজ-কর্ম্ম নির্ভর করছে। শীঘ্রই আমাদের শেষ জয় লাভ আসন্ন এবং ঈশ্বরের কৃপায়, ভারতও স্বাধীন হবে।"

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন), ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

* * * *

সাংবাদিকদের সাক্ষাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন—

"ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার

যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাতে ভারতের কাছে ইঙ্গ-আমেরিকান দল শত্রু বলেই গণ্য, এ কথা সূচিত হয়। ব্রিটেন ও আমেরিকা অদূর ভবিষ্যতে ভালো করেই বুঝতে পারবে যে এই যুদ্ধ ঘোষণা শুধু ভয়-দেখানো ব্যাপার নয়। আমাদের এই অস্থায়ী সরকারকে জাপান যে স্বীকার করে নিয়েছে, এতে ভারতবাসীরা নূতন শক্তি ও উৎসাহ লাভ করেছে।"

পরিশেষে, শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ভারতবাসীদের দু'টি ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন তৃতীয় লক্ষ্যটিকে কাজে পরিণত করা তাদেরই হাতে। সেটি হ'ল, স্বদেশের মুক্তি-সাধনে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ।

—আজাদ হিন্দ্ রেডিও (সিঙ্গাপুর), ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

* * * *

অস্থায়ী সরকারের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বৈদেশিক সংবাদদাতারা যে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন দেন, সেখানে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে বর্ত্তমানে ভারত-সীমান্তে যে যুদ্ধ চলেছে, তা সমগ্র ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও, আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটি দলকে যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি অংশ থেকে সামরিক কারণে এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের ফলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তবুও শীঘ্রই আবার নতুন আক্রমণ সুরু করা হবে। শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন, ব্রিটিশ সংবাদিক মহল খুব ভালো ভাবেই সচেতন যে ভারতের যুদ্ধটি ভারত-সীমান্তেই অনুষ্ঠিত হবে। এখানে পাহাড় ও জঙ্গলের ঘন অবস্থানে ব্রিটিশদের অনুকূলে এক ম্যাজিনো লাইনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে আক্রমণ থেকে বাঁচানো মোটেই কঠিন কাজ নয়।

বক্তৃতার শেষে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন, "মুক্তিসেনা এখন ভারত-ভূমিতেই অভিযান চালাতে সক্ষম। কিন্তু যতক্ষণ না মুক্ত দেশভাগ-গুলোকে স্বাধিকারে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত হয়, ততদিন এ আক্রমণ স্থগিত আছে।"

—টোকিও বেতার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৪।

*   *   *   *

বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে, আজাদ হিন্দ সরকারের সভাপতি নেতাজী বসু এই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়েছেন, "ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতীয়গণ পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করবে এবং শত্রুকে পরাস্ত করবার উদ্দেশে আপনাদের সমস্ত শক্তি ও উপকরণ নিয়োজিত করবে। টোকিওতে আমি এসেছি জেনারেল কোইসো এবং অন্যান্য জাপানী মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কারণ, সামরিক ব্যাপারে জাপানের পূর্ণ সহযোগিতা এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা আমি চাই। গত বৎসর ২৩শে অক্টোবর তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার অব্যবহিত পরেই আমরা বর্ম্মায় ও আরাকানে অভিযান স্বরু করেছি। আমরা এই যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌছেছি। পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতবাসীরা গত ষোল মাস ধরে' প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। পাছে সামরিক আয়োজনে আমরা অন্যান্য জাতির চেয়ে পিছিয়ে পড়ি, সেই কারণে আজাদ হিন্দ ফৌজের নতুন সৈন্য-সংগ্রহের কার্য্য তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য আমরা এক 'সমর-সমিতি' গঠন করেছি।"

ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতাজী বলেন, "স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। আমাদের কয়েকটি দল ইতিমধ্যে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছে এবং অবশিষ্ট দল বর্ম্মাতে রয়েছে। ভারতে প্রবেশ করে অগ্রসর হ'তে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'বে না। যতদিন না ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হয়, ততদিন আমরা নিশ্চেষ্ট থাকব না।"

—টোকিও বেতার, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৪।

*   *   *   *

বর্ম্মার কোনও এক স্থানে এক সাংবাদিক বৈঠকে 'আজাদ হিন্দ' অস্থায়ী রাষ্ট্রের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, রণনীতিজ্ঞ

জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কথাবার্ত্তার ফলে স্থির হ'য়েছে যে ভারতের জাতীয় বাহিনী অতি শীঘ্রই আক্রমণ আরম্ভ করবে। জাপান ও জার্মাণী উভয় শক্তিই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাণপণে আক্রমণ স্থরু করেছে, একথা তিনি প্রকাশ্যে বলেন এবং আশা করেন যে জাপান ও জার্মাণী এই শেষের যুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করে' অতি শীঘ্রই তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হবে।

নেতাজী জোরের সঙ্গে বলেন যে যুদ্ধের নতুন পর্য্যায়ে ভারতবর্ষ এক দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। ইংরেজ দস্যুদের কবল থেকে ভারতের মুক্তিসাধন এই জাতীয় বাহিনীর দ্বারাই সম্ভব হবে, এ আশা তিনি পোষণ করেন। জাপানীদের "বিশিষ্ট আকাশ-আক্রমণ-বাহিনীর" প্রশংসা করে করে নেতাজী বলেন যে এই সৈন্যদের বীরত্বমণ্ডিত, কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত ক'রেছে। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বীর জোয়ান্ জাপানী সৈন্যদের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করবে আর স্বদেশমাতার মুক্তিসাধনে অসীম সাহস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যুদ্ধ চালাবে।

—রেঙ্গুন বেতার, ২রা জানুয়ারী, ১৯৪৫।

*　　*　　*　　*

পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রেঙ্গুণে পৌঁছে সাংবাদিকদের নিকটে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে একবার যদি ভারতে প্রবেশ করা যায় তাহলে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অসংখ্য অনুচরবৃন্দ ভারতের জাতীয় বাহিনীকে তাদের সম্পূর্ণ নৈতিক এবং ব্যবহারিক সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হবে না। শ্রীযুক্ত বসু বলেন,—"মহাত্মা গান্ধী যে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে অহিংসা ধর্ম্মে তিনি আজীবন বিশ্বাসী আমাদের এই সশস্ত্র যুদ্ধকে সমর্থন করা তাঁর আদর্শবিরোধী হ'লেও তিনি আমাদের

যতদূর সম্ভব সাহায্য নিশ্চয়ই করবেন। এই বাহিনী তাঁর পূর্ণ আশীর্ব্বাদ পাবে এবং তাঁর অনুচরদলের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আমাদের সমর্থন করবে, যদিও প্রাচীন কর্ম্মীদের ওপর আমি তেমন ভরসা রাখি না। তাঁর অনুরক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন তাঁরা ক্রমশই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করছেন।

—বার্লিন বেতার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

*　　*　　*　　*

ইতালিয়ান পত্রিকা "গিরোন ত্ব ইতালিয়া"র টোকিও-স্থিত সংবাদ-দাতার সাক্ষাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে ১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন তার উদ্দেশ্য ছিল চক্র-শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে বিদেশী ভারতবাসীগণকে সচেতন ও প্রস্তুত করা।

তাঁর জাপানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে শ্রীযুক্ত বসু তার জবাবে বলেন যে চক্রশক্তির তিনজন সদস্যেরই সঙ্গে মিলিত পরামর্শে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করতে চান। তিনি আরো বলেন, "আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালাতে হ'লে জাপান থেকেই সে কাজ আরো ভালোভাবেই করা যাবে, কারণ অন্যান্য চক্রশক্তির চেয়ে জাপানই ভারত-বর্ষের আরো নিকটে।" পরিশেষে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন, "বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াও ভারতবর্ষকে আপনার শক্তির দ্বারাই বাঞ্ছিত আদর্শ উপলব্ধি করতে হবে। যখন আমাদের শেষ শক্তি ও উপকরণ ফুরিয়ে যাবে অথচ আমাদের উদ্দেশ্য থেকে যাবে, মাত্র তখনই আমরা বৈদেশিক সাহায্য প্রার্থনা করব।"

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন), ৩রা জুলাই, ১৯৪৩।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দুর্দ্ধর্ষ মিত্রশক্তি ইম্পিরিয়াল জাপানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়, ভারতের মুক্তি সেনাদলের বিখ্যাত অভিযান সম্পর্কে এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। নেতাজী বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অতি সত্বর আপনার লক্ষ্যস্থল অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং স্বাধীন ভারতীয় সেনা-বাহিনীর চরম জয়লাভে তাঁর গভীর বিশ্বাস আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মসূচীর আলোচনা অবান্তর। বর্ত্তমান অবস্থায় ঘটনাপুঞ্জই তার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেবে। নেতাজী মন্তব্য করেন, "পরিকল্পনা মতই আমাদের কাজ অগ্রসর হচ্ছে এবং ভারতমাতাকে বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে আমরা যে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি অচিরেই আমরা পূর্ণ করতে পারব। আত্মশক্তিতে আমাদের প্রচুর আস্থা আছে। মিত্রশক্তির বলবত্তায় আর জাতীয় বিজয়লাভে ও আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। ভারতের প্রধান শহরের ওপর যতদিন না আমাদের পতাকা ওড়ে, ততদিন আমাদের পরিশ্রম ও উদ্যমের শেষ হবে না। ব্রিটিশ প্রচার-বিভাগ যে দাবী করে, আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্বই অমূলক, আমাদের জাতীয় বাহিনীর কীর্ত্তিকলাপ সে মিথ্যা রটনার অসত্যকে সপ্রমাণ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন আমাদের প্রচার-কার্য্যের কল্পনা, কেরামতি নয়। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এখন দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর। কাজেই, যিনি শেষে হাসেন, তাঁকেই হাসি মানায়।"

এই প্রসঙ্গে নেতাজী আরো বলেন, "ভারতের জাতীয় বাহিনী ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-ভারতীয় সীমান্তের দিকে অভিযান করেছে। অতএব

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যে অগ্রসর হ'বে, তা স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যেই অস্থায়ী সরকারের কর্ম্মকেন্দ্রকে ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের এ যুদ্ধ সফল হবেই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসের তিনটি প্রধান কারণ আছে —প্রথম, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে ভারতের বিপ্লবীগণের সর্ব্বক্ষণ যোগাযোগ চলছে এবং কবে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত আক্রমণ করবে, সেই চরম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় তারা উৎসুক হ'য়ে রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদলের সিপাহী এবং উচ্চ কর্ম্মচারীরা আর, বে-সামরিক ভারতবাসী, উভয়ই, যখন ঠিক সময় আসবে আর ভারতের জাতীয় বাহিনী ভারতবর্ষে প্রবেশ করবে, তখন তার সঙ্গে যোগদান করতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়,—যদি ভারতে অবস্থিত ইঙ্গ-আমেরিকান এবং চীনা সৈন্যদল ভারত-প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, তাহ'লে আজাদ হিন্দ ফৌজ সে প্রতিরোধকে দমন করবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করেছে। এবং তৃতীয়ত ;—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই বিপ্লবী আন্দোলনে জাপান এবং তার পূর্ব্ব-এশিয়াস্থিত মিত্রদল যথাশক্তি সাহায্য দান করতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত।"

পরিশেষে নেতাজী বলেন যে ১৮৫৭ সাল থেকে ভারতের মুক্তির জন্য যে বিপ্লবী আন্দোলন সুরু হ'য়েছে, এইবার তার উদ্‌যাপন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বাইরে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ এবং ভিতর থেকে বিক্ষোভময় বিপ্লবের শক্তিবৃদ্ধি—এই দুইয়ে মিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করে' ভারতের মুক্তি আনবে।

—রেঙ্গুন বেতার, ৮ই জানুয়ারী ১৯৪৪।

দৈনিক বিশেষ ফতোয়া এবং হুকুমনামা

সুভাষচন্দ্র বসু, প্রধান সেনাধ্যক্ষ, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, বর্ম্মা।

তাং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪।

"সারা পৃথিবীর প্রতীক্ষমান দৃষ্টি আজ আরাকান সীমান্তের উপর নিবদ্ধ,—যেখানে বর্ত্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যার ফলাফল বহুদূর প্রসারী। অসম সাহসী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কয়েকটি দলের সহিত ইম্পিরিয়েল জাপানী সেনাবাহিনীর যে যোগাযোগ হ'য়েছে এবং তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে অপরূপ কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ হ'য়েছে, তাতে এই অঞ্চলে ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যদলের পাল্টা আক্রমণ চালাবার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং সাধারণ সৈনিক দল বর্ত্তমানে যেখানে থাকুন না কেন, আরাকান সীমান্ত-স্থিত আমাদের বীর সহচরগণের দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপে তাঁরা প্রেরণা লাভ করবেন। বহুদিন-প্রতীক্ষিত "দিল্লী চলো" এই যুদ্ধবাণী আজ সুরু হ'ল। অসীম সাহস নিয়ে আমরা এই অভিযানের সূত্রপাত করলুম এবং যতদিন না আরাকান পর্ব্বতের উপর উড্ডীয়মান স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা বড়লাটের প্রাসাদ-চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয় আর দিল্লীতে ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় সামরিক বিজয় প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়, ততদিন আমাদের এই অভিযানের অগ্রগতি বন্ধ হবে না।"

"বিশ্বস্ত সঙ্গীগণ, ভারতীয় মুক্তিসেনার কর্ম্মচারী ও সৈনিকদল আপনাদের হৃদয়ে একটি মাত্র চরম প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়ে উঠুক্ হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।' দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। সেই পথ দিয়েই আমরা অগ্রসর হ'ব। আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।"

"ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!"

*　　*　　*　　*

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দিনের এক বিশেষ হুকুমনামায় ঘোষণা করেন; "আমরা জাতীয় বাহিনীর

সৈনিকদল, স্বদেশমাতার পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে তারই মুক্তি কামনায় যুদ্ধ চালাচ্ছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। ভারতের ওপর তার বজ্রমুষ্টি যাতে শিথিল না হয়, সেজন্য ব্রিটিশরা ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে তাদের লোকবল এবং যুদ্ধোপকরণগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবে অপচয় করছে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের কঠিনতম পর্য্যায়ে আমরা পৌঁছেছি। আমাদের আশ্চর্য্য সাফল্য আর মিত্রদলের ধারাবাহিক পরাজয় স্পষ্টই প্রমাণ করেছে, শেষ পর্য্যন্ত আমরা জয়লাভ করবই। ঈশ্বরের নামে, ভারতবাসীর নামে, আমাদের সৈনিকদল যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করতে দ্বিধা বোধ করছে না।

—রেঙ্গুন বেতার, ২১শে মে, ১৯৪৪।

* * * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যুদ্ধব্যাপৃত সেনাবাহিনীকে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেছেন:—"ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর শেষ জয়লাভে আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে। ফেব্রুয়ারী সম্মিলনীতে যে সব পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এখন সেগুলো ফলপ্রদ হ'চ্ছে। পবিত্র ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে এখন আপনারা বীরের মত কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ-কাজ চালাচ্ছেন। আপনাদের জয়লাভে শত্রুপক্ষ রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়াই চালাচ্ছে এবং আপনাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি থামানোর জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হবে না। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফলের জন্য যে মূল্যই দিতে হোক্ না কেন জয় আমাদেরই—এ কথা সুনিশ্চিত।"

পূর্ব্ব-এশিয়ার "ঝাঁসি রাণীর রেজিমেণ্ট"-এর স্বেচ্ছাবাহিনীকেও নেতাজী এই মর্ম্মে এক বাণী পাঠিয়েছেন—"ভগ্নিগণ, আজ আপনারা স্বদেশের সেবায় ও মুক্তিসাধনে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছেন এবং 'ঝাঁসির

রাণী', এই বাহিনীর সুনাম রক্ষায় আপনারা বদ্ধপরিকর। আপনাদের উপর আমি এমন অনেক গুরুভার কর্ত্তব্য চাপিয়েছি যাতে প্রচুর স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে এই বিখ্যাত সেনাবাহিনী জগতের সমস্ত নারীর সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করবে। আমি দেখতে চাই যে আরো শত শত বাহিনী এইভাবেই আমাদের স্বদেশ মাতার মুক্তিসাধনার মত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যুদ্ধ করুক। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক-ভ্রাতাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আপনাদের যুদ্ধ করতে হবে এবং আপনাদের প্রচেষ্টাকে গৌরবমণ্ডিত করবার অজস্র সুযোগও আপনারা পাবেন। ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে এই বাহিনীর কার্য্যকলাপে আমি পরম সন্তোষলাভ করেছি এবং একথা আমি জানি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগে আপনারা পশ্চাৎপদ হবেন না। এই বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের জন্যই আমি আপনাদের বাহিনীটি গঠিত করেছি। আশা করি, আপনাদের প্রত্যেকেই সুনাম রক্ষা করে শেষ জয়লাভ যাতে শীঘ্র হয়, সে চেষ্টা করে আপন যোগ্যতার পরিচয় দেবেন।"

—রেঙ্গুন বেতার, ১৮ই মে, ১৯৪৪।

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভ্রাতৃগণ!

"এই বছর মার্চ মাসের মাঝামাঝি আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ক'টি অগ্রগামী দল নির্ভীক মিত্রশক্তি, ইম্পিরিয়াল জাপানী সেনাবাহিনীর পাশাপাশি যুদ্ধ চালিয়ে ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করেছিল তারই ফলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতের মাটিতেই সূত্রপাত হ'য়েছিল।"

"প্রায় এক শতাব্দীরও উপর ভারতবর্ষকে নির্ম্মমভাবে আপনার স্বার্থে ব্যবহার করে এবং নিজেদের যুদ্ধ চালাবার জন্য বিদেশের সৈন্য-সামন্ত এনে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বাহিনী খাড়া

করতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের বাহিনী নিজেদের উচ্চ আদর্শের পবিত্রতায় বলসঞ্চয় ক'রে ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে এবং শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ, অধিকতর সুসজ্জিত কিন্তু পরস্পর বিসদৃশ এবং বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে প্রতিটি যুদ্ধে পরাস্ত করে। আমাদের সৈন্যদল সুশিক্ষায় ও সুশৃঙ্খলায় এমন দৃঢ় শক্তি নিয়ে মরণ পণ করে' স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, যে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হয় এবং প্রত্যেক পরাজয়ের সঙ্গে শত্রুর মনোবল ভাঙ্গতে থাকে। কঠিন অবস্থায় পড়েও আমাদের সৈনিক এবং অফিসারগণ এমন সাহস ও বীরত্ব দেখায় যে সকলে তাদের প্রশংসা করে। রক্তপাতে ও আত্মত্যাগে এই সব বীর সৈনিক স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সৈন্যদের জন্য উচ্চ আদর্শ স্থাপিত করেছে। ইম্ফল-আক্রমণ এবং অধিকারের জন্য সমস্ত পরিকল্পনা এবং আয়োজনই সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এই সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে কৌশলে ইম্ফল অধিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃতির দুর্যোগে আমাদের হাত-পা বাঁধা, তাই কিছুদিনের জন্য আমরা আক্রমণের কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হই। কাজ বন্ধ রাখার পরে দেখা গেল যে তখনকার লাইন রক্ষা করা রীতিমত অসুবিধার ব্যাপার, তাই আমাদের সৈন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত অংশে তাদের রাখা হয়। এই সময়টা চুপচাপ বসে না কাটিয়ে আমরা আবার আকাশের অবস্থা পরিষ্কার হলে যাতে নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালাতে পারি সেজন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখব। যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েকটি অংশে শত্রুকে আমরা একবার পরাজিত করেছি। তাই এই ইঙ্গ-আমেরিকান দলকে সমূলে বিনষ্ট করবার দৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বাস আরো দশগুণ বেড়েছে। যে মুহূর্তে আমাদের সাজ-সজ্জা এবং আয়োজন তৈরি হবে, তখনই আবার প্রচণ্ড শক্তিতে আমরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করব। আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকের মনোবল, রণকৌশল, সহিষ্ণুতা, সাহস ও

কর্ত্তব্যানুরাগ অনেক বেশি এবং এদেরই সাহায্যে জয়লাভ আমাদের অনিবার্য্য।

যে সব বীর সৈনিক এই অভিযানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তাঁদের পরলোকগত আত্মা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের আগামী শুভদিনে আমাদের দৃঢ়তর সাহস ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত করবে।"

'জয় হিন্দ!'

(স্বাঃ) সুভাষচন্দ্র বসু, প্রধান সেনাপতি, আজাদ হিন্দ ফৌজ, বর্ম্মা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজ ঘাঁটির বেতার কেন্দ্র থেকে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমানে ভারতীয় বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে, বিশেষ করে দিল্লী বেতার থেকে যে ভারত-বিদ্বেষী কুটিল প্রচার-কার্য্য চালানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে নেতাজী তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন যে এই প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতবাসীদের ক্রম-সচেতন জাতীয়তাবাদকে দমিত করা এবং তাঁদের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান বন্ধ করা। তাঁর অভিমত এই, "মিত্রপক্ষের প্রচার-কর্ম্মীদের কৌশল এবং কার্য্যকলাপ আমি খুব ভালোভাবেই নজর করছি। তারা আমার এই জাতীয় বাহিনীকে শক্তিহীন, পর-নির্দ্দেশচালিত সৈন্যদল নামে অভিহিত করা ছাড়া আর বেশি কিছু করে উঠতে পারেনি। মানুষ গালাগালি দেয় কখন? যখন সে আপন দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করতে পারে। ব্রিটিশদের প্রচারকার্য্য এই অতিরঞ্জিত উক্তি, সত্যের অপলাপ এবং নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এইভাবে কাজ চালায়, তাতে আমাদের অশেষ সাহায্য হবে এবং শেষ জয়ের দিন এগিয়ে আসবে। গত এক বৎসর ধরে মিত্রপক্ষের প্রচার বিভাগ অনেক চেষ্টা ও কৌশল করেছে যাতে ভারতবাসীদের ভুল বোঝানো যায় এবং জাপান ও ভারতের জাতীয়

বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের মন টলিয়ে দেওয়া যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন যখন প্রথম ঘোষণা করা হ'ল, তখন তারা খুব সতর্কভাবেই নীরব হ'য়েছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল এ সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছে তখন তারা বলতে লাগল যে এটা একটা নামমাত্র সেনাবাহিনী, যুদ্ধের বন্দীদের নিয়ে গঠিত, যারা জাপানের নির্দ্দেশমত নিজেদের লোকেদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। অতএব এ সৈন্যদল বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারবে না। ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় বাহিনী যখন আরাকানে যুদ্ধ চালায়, তখন ব্রিটিশরা বলতে লাগল এই জাতীয় বাহিনী এখনও ভারতের বাহিরে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে এরা পারবে না। কিন্তু এদের আশা ও দম্ভ চূর্ণ করে এই বাহিনী মার্চ মাসে সে সব কাজ করল। মণিপুরে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন বলা হ'ল যে মণিপুর বহুদূরে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ এর চেয়ে বেশী ভিতরে ঢুকতে পারবে না। তারপর তারা বলতে সুরু করল যে এই সৈন্যদল একটি সাক্ষীগোপাল। আর রসদে এবং অস্ত্রসজ্জায় ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাদলের চেয়ে এরা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু আমি ঠিক জানি যে আমাদের এই পুরাণো আমলের রাইফেল এবং অকিঞ্চিৎকর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা যা করতে পেরেছি, তাতে সেই অস্ত্রসজ্জা নিয়েই আমরা আমাদের স্বদেশভূমিকে স্বাধীন করতে পারব। ব্রিটিশদের হয়ত আরো উৎকৃষ্ট এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক-ভাবে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু অস্ত্রই একমাত্র যুদ্ধ জয় করতে পারে না। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সৈন্যদল যে আত্মসমর্পণ করল তার কারণ কি এই যে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল না? সৈন্যদলের অস্ত্রসজ্জা নিকৃষ্ট ছিল বলেই কি ফ্রান্সের পতন হ'ল? আসল কথা এই, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করতেও প্রস্তুত তাদের জয়ই সুনিশ্চিত। ১৯৪০ সালে ইংরেজরা তাদের পরাজয় এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে যে ইংলণ্ডকে আক্রমণ করবার মত শক্তি জার্মাণীর নেই। ঠিক সেইভাবে, প্রাচ্যে

তাদের পরাজয় ঢাকবার জন্যে ইংরেজরা বলছে যে আমরা ভারত আক্রমণ করতে পারি না। কিন্তু যারা যাই বলুক আর করুক, তারা এই সত্যটাকে ঢাকতে পারে না যে ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করবার সমস্ত জল্পনা কল্পনা তাদের ভেস্তে দিয়েছে পূর্ব্ব ভারতে আমাদের এই জাতীয় বাহিনীর আশ্চর্য্য কৃতিত্ব এবং সাফল্য। আমরা কিন্তু জানি যে খালি মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে ভারতবাসীদের সহানুভূতি ও সাহায্য তারা পেতে পারে না।"

পরিশেষে নেতাজী বলেন, 'এ সমস্ত প্রচার-কার্য্য আমাদের সঙ্কল্পকে কিছুমাত্র টলাতে পারবে না। যতক্ষণ দিল্লীর লাল কেল্লায় আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্রতিষ্ঠিত না করছি, ততক্ষণ আমাদের বিশ্রাম নেই। জয় হিন্দ্!'

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন), ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

* * *

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় বাহিনীর সমস্ত সৈনিক এবং কর্ম্মচারীগণকে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেছেন, "প্রচণ্ড মিত্রশক্তি জাপানের সাহচর্য্যে ভারতের মুক্তিসেনা স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাচ্ছে। সমস্ত সৈনিক এবং কর্ম্মচারী স্বদেশমাতার নিকটে এক আশ্চর্য্য আত্মোৎসর্গ এবং দেশসেবায় কাহিনী উপস্থিত করেছে। জলহাওয়ার দোষে তারা আক্রমণ চেষ্টা কমিয়ে দিয়ে তাদের অধিকৃত ঘাঁটিগুলির দখল নিয়েই বসেছে। পরিষ্কার আকাশের প্রতীক্ষায় আমরা উৎসুক হ'য়ে আছি। আমরা জানি বীরের গলেই বিজয়মাল্য পড়ে। আমাদের বিশ্বাস এ যুদ্ধে জয় আমাদের অনিবার্য্য।"

—বার্লিন বেতার, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৪।

* * *

"ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর শোনান্ বেতার কেন্দ্র থেকে কথা বলছি। এখন আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিশেষ ঘোষণাপত্র আপনাদের জানাচ্ছি।"

"আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর ভাইগণ, আজ বৎসরের প্রথম শুভদিনে আমি প্রথমে আপনাদের বলছি যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হবার পর থেকে আপনাদের কার্য্যকলাপ এবং অগ্রগতির দিকে একবার পিছন ফিরে তাকান। তাহলেই বুঝবেন যে অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আপনাদের কৃতিত্ব এবং সফলতা যে অনিবার্য্য রকমের, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা সম্ভব হ'য়েছে মাত্র এই কারণে যে আজ ভারতবাসীদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অদম্যভাবে শক্তিসঞ্চার করছে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের স্বদেশবাসিরা আমাদের বহুবিধ সাহায্য দান করেছে। আমাদের মিত্রশক্তি নানাভাবে আমাদের উপকার করেছে আর সবচেয়ে বড় কথা আপনারা কঠিন পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ করেছেন। ১৯৪৩ সালের কিছু আগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কয়েকটি দল ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্ম্মায় আরাকান প্রদেশে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সুরু করা হয়। ২১শে মার্চ তারিখে আমরা সমস্ত পৃথিবীকে জানাতে সমর্থ হই যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে ভারতের পবিত্র ভূমিতেই যুদ্ধ চালাচ্ছে। সেই থেকেই যুদ্ধ কাজ চলেছে এবং সেই অভিযানের মধ্যে থেকে আমাদের সঙ্গীদের অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিক ও কর্ম্মচারীগণ যে অসমসাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা ভবিষ্যতে ভারতের মহামূল্য ঐতিহ্যে পরিণত হবে। আর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাছেও এই আত্মোৎসর্গ ও বীরত্ব একটি জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ চিরদিন প্রেরণা যোগাবে। বন্ধুগণ! আজ এই শুভদিনে আমার ইচ্ছা যে আমরা সবাই সেই অমর বীরদের উদ্দেশ্যে আমাদের নীরব শ্রদ্ধা জানাই এবং আপনারাও সেই পবিত্র অঙ্গীকার নতুন করে গ্রহণ করুন যে যতদিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হয় ততদিন এ যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাবেন। ভারতভূমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে আর আপনাদের বীর সঙ্গীগণের

মৃত আত্মা আরো এক দুঃসাহসিক কার্য্যে আপনাদের উৎসাহিত করছে। তাই আগামী দিনের কঠিনতর যুদ্ধের জন্য আপনারা নবোদ্যমে প্রস্তুত হন। ভারতের রাজধানীর উপর যতদিন না আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোন বিশ্রাম, কোন অবসর্ থাকতে পারে না। ভাই সব! ভারতের স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছেন নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের এই বীর সৈনিকদল। তাঁদের জন্য আমরা গৌরব বোধ করি। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।"

—সিঙ্গাপুর থেকে বেতারযোগে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২রা জানুয়ারী, ১৯৪৫।

*　　*　　*

বন্ধুগণ! আপনারা সবাই জানেন যে গত বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও অফিসারগণ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এক স্বদেশ-প্রেম, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের সাহায্যে শত্রুপক্ষের উপর যে বিজয়লাভ করেছেন তার কিছুটা গৌরব ম্লান হ'য়েছে কয়েকজন সৈনিক ও কর্ম্মচারীর কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায়। আমরা আশা করছিলাম যে নববর্ষের আরম্ভে ভীরুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষ হ'য়ে যাবে আর এই বৎসরের যুদ্ধ ব্যাপারে আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহস ও আত্মত্যাগে অমিলন দৃষ্টান্ত দেখতে সমর্থ হবে। কিন্তু তা হ'ল না। দ্বিতীয় ডিভিসনের প্রধান ঘাঁটিতে পাঁচজন উচ্চ কর্ম্মচারী সম্প্রতি যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন তাতে আমাদের দৃষ্টি খুলে গেছে।

মনে হচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে কোথাও যেন গণ্ডগোল আছে, সব যেন ঠিকমত চলছে না। তাই, এই কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার বীজ এখন লুপ্ত করে দিতে হবে। যদি এখন আমরা এই বীজ সমূলে উৎপাটিত করতে পারি চিরকালের জন্যে তাহলে ঈশ্বরের কৃপায় এই পরম লজ্জাকর এবং ঘৃণিত আমাদের সেনাবাহিনীকে বিশুদ্ধ

করবার অভিপ্রায়ে যা যা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব ও প্রয়োজন, তা করতে আমি স্থির সঙ্কল্প। আমি বিশ্বাস করি যে এ বিষয়ে আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্য আমি পাব। বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার বিষ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করতে হ'লে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক :—

(১) আজাদ হিন্দ ফৌজ দলের প্রত্যেক সভ্য, অফিসার এন্, সি, ও কিংবা সিপাহী ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্য যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে পারবে, তার পদবী যাই হোক না কেন, যদি সে কাপুরুষের মত ব্যবহার করে। কিংবা যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলবার অধিকারও থাকবে।

(২) আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সদস্যকে আমি এই সুবিধা দিচ্ছি যে যারা ভবিষ্যতে যথাযথ ভাবে কর্ত্তব্য কাজ করতে কিংবা সাহসীর মত লড়তে অনিচ্ছুক তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ দল ত্যাগ করতে পারে। এ সংবাদ জানানোর পর থেকে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আমার এ প্রস্তাব কার্য্যকরী থাকবে।

(৩) যে সমস্ত লোক নারাজ তাদের স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজ দল ত্যাগ করবার সুবিধা দান ছাড়া আমি আমাদের এই সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত ময়লা আছে তা সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে ফেলতে চাই। এই ক্ষালনক্রিয়ার সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ আছে যে সঙ্কট মুহূর্ত্তে তারা আমাদের বিপদে ফেলতে পারে কিংবা প্রবঞ্চনা করতে পারে সে সমস্ত লোককে সরিয়ে দেওয়া হবে। এ কাজ ভালোভাবে করবার জন্যে আমি আপনাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি। তাই আমার বিশেষ ইচ্ছা যে আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে যদি এমন কোন কাপুরুষ বা বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির সন্ধান আপনারা পান তাহলে সে সংবাদ আপনারা যেন আমাকে এবং আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে দিতে কুণ্ঠিত না হন।

(৪) শুধু এখন সেনাবাহিনীকে পরিষ্কার করে ফেললেই যথেষ্ট

হবে না। ভবিষ্যতেও এই সতর্কতা থাকা দরকার এবং কড়া নজরের প্রয়োজন থাকবে। সেইজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক কর্ম্মীরই কর্ত্তব্য হবে তাঁর চোখ কান খুলে রাখা যাতে ঠিক সময়ে ভীরুতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার কোন রকম সন্দেহজনক প্রমাণ তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলা যায়। ভবিষ্যতে যদি কোন কর্ম্মী এই রকম কিছু সন্দেহজনক লক্ষ্য করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তিনি যেন হয় মুখে নয় লিখে আমাকে কিংবা কাছাকাছি কোন কর্ম্মচারীদের সে কথা জানিয়ে দেন। আবার এখন থেকে বরাবর সব সময়ের জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মী মনে রাখবেন যে তিনি এই জাতীয় বাহিনীর এবং ভারত জাতির সম্মান এবং সুনামের রক্ষক বিশেষ।

(৫) এই ক্ষালনক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'লে অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা আমাদের বাহিনী স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে যাবার পরও যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কিংবা কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহলে তার শাস্তি মৃত্যু।

(৬) আমাদের জাতীয় বাহিনীর মধ্যে একটি নৈতিক দুর্গ তৈরী করার প্রয়োজনে সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার এবং কাপুরুষতার বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। সৈন্যদলের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এটা গভীরভাবে সৃষ্টি করা চাই যে বিদ্রোহী সৈনিকের পক্ষে কাপুরুষতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আর জঘন্য ঘৃণিত মনোভাব এবং গর্হিত পাপাচরণ কিছু নেই। কি করে আমরা এই গভীর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারি সে সম্বন্ধে পৃথকভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে কোন কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক থাকতে না পারে।

(৭) অপছন্দ লোকদের সরানো হ'বার পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক কর্ম্মীকে পুনরায় এই শপথ গ্রহণ করতে হবে যে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রিয় ভারতভূমির স্বাধীনতা না মেলে, ততদিন একনিষ্ঠ মনে দৃঢ় ও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ চালনার বিরতি হবে না। এই শপথের ভাষা ও ভঙ্গী সম্বন্ধে পৃথক নির্দ্দেশ দেওয়া হবে।

(৮) যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষতার চিহ্ন দেখলেই সন্ধান দেবেন অথবা কোন নিদর্শন পেলেই ঐ ধরণের লোকদের গ্রেপ্তার করবেন অথবা নিহত করবেন, তাঁদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।"

(স্বাঃ) **সুভাষচন্দ্র বসু**

সর্ব্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ, আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৫।

* * * *

"ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অবস্থিত ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সৈনিক ও কর্ম্মচারিগণ! জয় হিন্দ! ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর শোনান বেতার-কেন্দ্র থেকে বন্দীকৃত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি আপনারা এখন শুনতে পারেন"—

"বর্ম্মা থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর যে সব সৈনিক কর্ম্মচারীদের ইঙ্গ-আমেরিকানরা যুদ্ধে বন্দী করেছে তাদের প্রতি, বিশেষ করে ব্রিটিশরা প্রতিহিংসাপরায়ণ পাশবিক ব্যবহার দেখাচ্ছে। এঁরা এতদিন ধরে জার্মাণী আর জাপানকে গালিগালাজ করতে অভ্যস্ত যেহেতু তারা নাকি ইঙ্গ-আমেরিকানদের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করেনি। এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বর্ম্মায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত সৈনিক ইঙ্গ-আমেরিকানদের কবলে এসে পড়েছে তাদের প্রতি তাঁরা কি ব্যবহারটা করছে? ব্রহ্মদেশে যদিও যুদ্ধরত মিত্রশক্তিদের মধ্যে অনেক জাতিরই লোক আছে, তা হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র ব্রিটিশদের উপরই অর্শায়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষেরা এমন কি এই অজুহাতও দেখাতে পারে না যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের জোর করে ভর্ত্তি করানো হয়েছে, কয়েকজন মাত্র স্বেচ্ছাসেবক ছিল এবং যাদের জোর করে এ-কাজে

ঢোকানো হ'য়েছে, মাত্র তাদের প্রতিই সদয় ব্যবহার দেখানো হবে। একথাও তারা বলতে পারে না যে মিত্রশক্তি দলের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আমরা দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়েছি তারই পাল্টা জবাব তারা দিচ্ছে। কারণ আমাদের হাতে মিত্রপক্ষের কেবল সেই সৈনিকরাই বন্দী হ'য়েছে যারা স্বেচ্ছায় এসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছে। এমন কি, এই কিছুদিন আগেও নয়াদিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বীকার করা হ'য়েছে যে যারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছে তারা সবাই ভালো ব্যবহার পেয়ে থাকে। হয়ত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষেরা ভাবছে যে প্রতিহিংসা নেবার মত শক্তি আমাদের নেই এবং সেই জন্যই আমাদের সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের নিয়ে তারা যা খুসী তাই করতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি নয়। যদি নিতান্তই আমাদের পাল্টা জবাব দিতে হয় তাহ'লে প্রতিশোধ নেবার উপায় এবং ব্যবস্থা অবলম্বন আমরা করব যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের উপর নির্য্যাতন ও দুর্ব্ব্যবহার তারা করতে থাকে। কিন্তু প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবার আগে আমাদের সামনে একটি পথ খোলা আছে যেটি শুধু ফলপ্রদ নয় সহজও বটে। যদি ভারতে আমার স্বদেশবাসীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে এক তুমুল আন্দোলন চালান তাহ'লে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের জ্ঞান ফিরবে এবং তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে। ভারতের জনমত হয়ত ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানে ব্রিটিশকে বাধ্য করাবার মত শক্তিশালী না হ'তে পারে। কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে বন্দী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদলের উপর যে নির্ম্মম ব্যবহার এবং অত্যাচার চালানো হ'চ্ছে তা বন্ধ করাবার মত শক্তি তার আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যগণ একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বিপ্লবী। তারা স্বদেশমাতার মুক্তির জন্যই লড়াই চালায়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারা নির্ভীক মনে দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করেছিল একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারা তো পরিষ্কার মনে, নিষ্পাপ-চিত্তে, অকলুষ হস্তে যুদ্ধ করেছে! অতএব আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধনীতি

অনুসারে তারা বন্দী অবস্থায় ভদ্র ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার পাবার অধিকারী তাই আমি আমার স্বদেশবাসীদের এই আবেদন জানাচ্ছি যেন তাঁরা নিজেদের যুদ্ধবন্দীদের হিতার্থে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে তাঁরা যোগদান করেছে বলে বর্ত্তমানে ব্রিটিশের হাতে তাঁরা যে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পাশবিক ব্যবহার পাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যেন প্রবল আন্দোলন চালান। আমি তাঁদের সকলের কাছে এই নিবেদন জানাচ্ছি যে এই সব যুদ্ধবন্দীদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রকাশে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে যেন তাঁরা বাধ্য করেন, যাতে করে সমস্ত পৃথিবীময় লোক বিচার করতে পারে যে মৌখিক স্বীকার সত্ত্বেও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজে কতটুকু যুদ্ধনীতির দায়িত্ব মেনে চলে।"

—সিঙ্গাপুর থেকে বেতার বক্তৃতা, ১৭ই জুন, ১৯৪৫।

*   *   *   *

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে নেতাজী বসু এক বেতার বক্তৃতায় বলেন,—

"ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রিয় সঙ্গীগণ! গত বৎসর ২১শে অক্টোবর তারিখে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয়। সে আজ প্রায় এক বছর হ'ল। এই এক বছরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। দাসত্ব বন্ধনে শৃঙ্খলিত হ'বার পর এই সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের একটি রাষ্ট্র গঠিত হ'য়েছে। এই স্বাধীন ভারতের যা কিছু সম্মান ও গুরুত্ব, তা একটি শক্তিশালী সেনা-বাহিনীর দৌলতেই। অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের মত ভারতের একটি মুক্তিকামী এক শক্তিশালী সেনাদল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'য়েছে এর চেয়ে আর কি শুভ-সংবাদ থাকতে পারে? আর যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে এই সেনাবাহিনীর কর্ম্মঠ সৈনিক বলে পরিচিত হ'বার সৌভাগ্যের চেয়ে আর কি আনন্দের ব্যাপার হ'তে পারে? আমি সত্যি বলছি যে আমার স্বদেশবাসীরা ঈশ্বরের কল্যাণে আমাকে প্রচুর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু

আমার মনে হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিক, সিপাহীই হ'ন, কিংবা উচ্চ কর্ম্মচারীই হন, আমার সমান সম্মান পেয়ে থাকেন, আমার জীবনে অধিকতর সম্মান আমি কখনও পাইনি। আজ হোক অথবা কাল হোক—সকলের কাছেই মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু আমরা এই পবিত্র শপথ নিয়েছি যে স্বাধীনতার যুদ্ধে মুখে হাসি নিয়ে আমরা মৃত্যু বরণ করব। আমরা একথাও জানি যে যাঁরা স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তাঁদের নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আপনাদের হয়ত স্মরণ আছে যে গত বৎসর শোনানে এক সামরিক কুচকাওয়াজে আমি ভারতের জাতীয় বাহিনীকে একটি বুলি শিখিয়েছিলাম। সেটা হ'ল, 'দিল্লী চল!' এখন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবার সময় আমাদের স্বদেশপ্রেমিক সৈনিকদের মুখে এই বুলিটাই যুদ্ধ-ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে। যখন তারা আবার স্বদেশে প্রবেশ করবে এবং দেশমাতাকে অপমানকর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে অগ্রসর হবে, তখন এই বুলিই থাকবে তাদের ওষ্ঠাগ্রে।"

"সঙ্গীগণ! আপনারা মনে রাখবেন যে গতবৎসর যখন আমাদের সৈন্যদল শোনান থেকে অগ্রসর হয় তখন আমি তাদের এই পরিষ্কার সতর্ক-বাণী দিয়েছিলাম যে আমাদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধপথ দুর্গম। এ পথে প্রচুর স্বার্থত্যাগ, অবর্ণনীয় কষ্টস্বীকার, অগণিত দুঃখ ও নৈরাশ্য বরণ। ভারত অভিমুখে অভিযানের পথে, এবং পরেও, আমাদের সেনাদল অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে। এখনও যুদ্ধ শেষ হ'তে বাকী। কিন্তু তাই বলে এই যুদ্ধে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও শক্তি নিয়োগ করতে আমরা পশ্চাৎপদ হ'বো না। রণক্ষেত্রের পুরোভাগে আমাদের সৈনিকদল পরিদর্শন করে আমি এইমাত্র রেঙ্গুনে এসে পৌছেছি। আমি বলতে পারি যে তাদের দৃঢ়চিত্ততা একটুও কমেনি এবং শত্রুদলের উপর আক্রমণ চালাবার সামরিক আজ্ঞার অপেক্ষায় তারা অধীর হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে। আমাদের শত্রুদের কাছে আর সারা পৃথিবীর কাছে আজ একথা জলের মত পরিষ্কার যে ভারতের

জাতীয় বাহিনী প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই বাহিনী, যারা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যে কোন উপায়ে জয়লাভ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতের মুক্তি, এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সেনাদল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আমরা অনেক ঠেকে শিখেছি এবং জানি এর পর কি রণকৌশল অবলম্বন করা উচিত। অতএব আগামী দিনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'বার কাজে আমরা এই অভিজ্ঞতা ভালোভাবেই কাজে লাগাব।"

"আমার বীর সঙ্গীরা! আকিয়াব থেকে কোহিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রণক্ষেত্রে আমরা যে শেষ লড়াই চালিয়েছি তাতে শত্রুপক্ষ একটি বারও জয়লাভ করে নি। হয় শত্রুকে পিছু হঠতে হ'য়েছে, নয়ত তার অগ্রগতি প্রতিপদেই ব্যাহত হ'য়েছে। সারা দুনিয়ার লোক একথা জেনেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে এর একটি মাত্রই কারণ থাকা সম্ভব :—

শত্রুদের মনোবলের চেয়ে আমাদের সৈনিকদের চিত্তবল আরও উঁচুদরের। আমরা লড়েছি অজস্র বাধার বিরুদ্ধে, সংখ্যায় এবং অস্ত্রসজ্জায় আরও উৎকৃষ্ট সৈন্যসমাবেশের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রথম আক্রমণের ফলে ইম্ফল অধিকৃত হবে এই আশা নিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এ চেষ্টা বিফল হ'ল। কিন্তু এ কথা বলতে আমি গৌরব বোধ করছি যে আজ পর্য্যন্ত আমরা এগিয়ে চলেছি এবং শত্রুপক্ষকে দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়েছি। বৃষ্টিপাত সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্য-সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই আমরা যুদ্ধকার্য্য স্থগিত রাখতে বাধ্য হ'লাম। রণনীতির প্রয়োজনে আমরা স্থির করলাম যে এই অনিচ্ছাকৃত অবসর ও বিশ্রামকে আমরা কাজে লাগাব আগামী যুদ্ধকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হ'তে; এটা ঠিক যে এতে আমাদের চেষ্টা সফল হবেই। আমাদের পরিকল্পিত রণকৌশল অনুসারে অপসরণের ফলে শত্রুপক্ষ যেটুকু এগুতে পেরেছে সেইটাই নাকি তাদের 'গৌরবমণ্ডিত জয়লাভ' এবং 'দ্রুত অগ্রগতি'। আমরা, যাদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, কেবল আমরাই জানি প্রকৃত অবস্থাটা কি। এখন আমরা

জেনেছি যে আমাদের শত্রুদের চেয়ে আমাদের শক্তি অনেক বেশী, আর আমাদের জাতীয় বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক পরম বিজয় লাভে গভীর বিশ্বাস এবং নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত। যতদিন না জয়লাভ হয় আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।"

—'ভয়েস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' রেডিও (রেঙ্গুন), ১৮ই জুন, ১৯৪৫।

বিবিধ বিবৃতি

"শ্রীযুক্ত বসু মুখমণ্ডলে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ওঠেন এবং ঘন ঘন উৎসাহিত করতালির মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষায় এক উপাদেয় তেজস্বী বক্তৃতা দেন। ভারতে ব্রিটিশ রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ব্রিটিশরা এতদিন ধরে যে বিদ্বেষের বীজ বপন করেছে সেই বীজ এখন প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হ'য়ে ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করবে। যে স্বাধীনতার কামনায় আজ আমরা ব্যগ্র, তা কখনোই আমাদের করতলগত হ'তে পারে না যতক্ষণ আমরা নিজেদের রক্তদান করতে প্রস্তুত না হই। যদি দুঃখ, নির্য্যাতন সহ্য করতে আমরা অনিচ্ছুক থাকি তাহ'লে স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্য নয়। স্বাধীনতার জন্য কোন আত্মত্যাগই প্রচুর নয় এবং রক্তপাতও ভয়াবহ নয়।

শ্রীযুক্ত বসু বলতে থাকেন, পরিশেষে আমি ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি। ঐদিন বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ করেন যে ব্রিটিশদের সমর্থনকারী আয়োজন অনুষ্ঠিত হোক। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আপনারা ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারত দিবস পালন করুন, ; যাতে সমস্ত সরকারী আয়োজনগুলি পণ্ড হয় এবং বাধা পায়। আপনারাও

ব্রিটিশদল এখুনি ভারত ত্যাগ করুন এই দাবী জানিয়ে পাণ্টা অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। এক কথায় ঐদিন 'ভারত ছাড়ো' এই বাণীটি আপনারা শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, সমস্ত দেশীয় রাজ্যেও ছড়িয়ে দিন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সভাসমিতি এবং বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হোক। 'জন বুল্' ফিরে যাও! এই চীৎকারে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হোক। দেওয়ালে, ট্রামগাড়ীতে, গাছে, এমনকি জন্তু জানোয়ারের পিঠে, এখানে ওখানে সর্ব্বত্র এই কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লেখা হোক। আর সর্ব্বশেষে সমস্ত দেশ, 'ভারত ছাড়ো' এই কথায় পূর্ণ হ'য়ে উঠুক। যেদিকেই ব্রিটিশরা চোখ ফিরাবে, তারা দেখবে চোখের সামনে ঐ লেখা। অতএব ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদের কর্ত্তব্য হ'ল সমস্ত ভারতময় এক বিদ্রোহী মনোভাব সৃষ্টি করা, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

—বার্লিন বেতার, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

*　　　*　　　*

'উইল এ্যাণ্ড পাওয়ার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসু লিখেছেন "ভারতবর্ষে যে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বেড়ে ওঠেছে, তার জন্য দায়ী ব্রিটিশ সরকার। ইংরেজরা চায় ভারতবর্ষকে চিরকাল ক্রীতদাস করে রাখতে। তার প্রাকৃতিক সম্পদ্‌কে তারা চিরকালই আত্মসাৎ করে এসেছে। তাই বিদেশী মনিবদের তাড়াবার জন্য ভারতবাসীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখতে চায়। ভারত স্বাধীন হ'লেই তবে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। নিজেদের দেশের সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র ভারতবাসীদেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। আপনার শাসনপদ্ধতি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই।"

—বার্লিন বেতার, ৬ই অক্টোবর, ১৯৪২।

সোমবার এক বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমানে বার্লিন থেকে ভারতের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা পেতে হ'লে পৃথিবীর সর্ব্বদেশস্থ ভারতবাসীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো উচিত এবং তার উপযুক্ত সময় এখনই এসেছে। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ গোপন করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সংবাদ নিয়ত সরবরাহ হ'চ্ছে। তারই ফলে মিত্রপক্ষীয় দেশে এবং এমন কি ব্রিটেনেও চার্চিল, আমেরি এবং ক্রীপ্‌স্‌-এর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত কঠিন হ'য়ে উঠেছে। যতদিন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ততদিন ভারতবাসীরা তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকবে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর এই সাম্প্রতিক বক্তৃতা পৃথিবীর সকল অধিবাসীর মনেই গভীর রেখাপাত করেছে। সর্ব্বত্রই তাঁর বিবৃতিকে সাধারণে প্রকাশ ও প্রচার করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হ'চ্ছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব-বিষয়ে শ্রীযুক্ত বসু সজোরে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং যে সমস্ত নিরস্ত্র ভারতবাসীর দল নিরুপদ্রবভাবে স্বাধীনতা-লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাদের উপর ব্রিটিশরা যে অমানুষিক নির্য্যাতন করছে, তারই এক বিশদ্‌ বিবরণ দেন। দেশমাতার মুক্তির জন্য, উচ্চ আদর্শের জন্য, স্বদেশানুরাগী বীর সঙ্গিগণ যে অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তাঁদের অতুল সাহসের প্রশংসা করে তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে ভারতের করদ রাজ্যের প্রজাবর্গও যে ভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে তাতে আনন্দ হয়। খাঁন্‌ বাহাদুর আল্লাবক্‌স্‌ তাঁর খেতাব পরিত্যাগ করাতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে মুস্‌লিম লীগ ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই কংগ্রেসে যোগদান করেছে এবং স্বদেশের মুক্তিকামনায় হিন্দুভ্রাতৃগণের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ চালাচ্ছে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে অবজ্ঞা করে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শক্তিবৃদ্ধির খাতিরে কর্ম্মরত হিন্দুমহাসভা এবং আকালী শিখ্ নেতাগণের তিনি নিন্দাবাদ করেন। মিঃ জিন্নার প্রতি তাঁর বক্তব্য এই—যতদিন ভারতে ব্রিটিশরা থাকবে ততদিন তাঁর পাকিস্তান পরিকল্পনা কখনই সফল হবে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে জাতীয় সরকারের অধীনেই পাকিস্তানের সৃষ্টি সম্ভব। মুস্‌লিম লীগ কংগ্রেসের সহিত যোগদান করুক এবং ভারতকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাক্, এই মর্ম্মে তিনি মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ জানান। এর পরে তিনি ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি অভিভাষণে বলেন যেন তারা ইংরেজকে সাহায্য দান না করে, বরঞ্চ বিদেশী মনিবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যায়। বড়লাট বাহাদুরের শাসন পরিষদের সদস্যবর্গের প্রতি তিনি এই নিবেদন জানান যেন তাঁরা জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিকদের সাহায্য করেন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। সিংহলে যে সব ভারতবাসী আছে তাদের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত বসু বলেন তারা যেন ভারতের স্বদেশীগণের সহিত সহযোগিতা করে এবং দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করবার চেষ্টা করে। য়্যুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় যে সব ভারতবাসী আছে, তাদের প্রতি তাঁর নিবেদন এই :—ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তারা যথাযথ কর্ত্তব্য করুক এবং প্রয়োজন হ'লে, স্বদেশের মুক্তিসাধনায় তারা আত্মদান করতে কুণ্ঠিত না হয়। অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করবে এ আশা তাঁর আছে।

—বার্লিন বেতার, ৭ই অক্টোবর, ১৯৪২।

ব্রিটিশ সাংবাদিক ভারনন বার্টলেট্ সম্প্রতি যে উক্তি করেছেন যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জার্মাণ প্রচার বিভাগের অস্ত্রবিশেষ, তারই

প্রত্যুত্তরে নেতাজী বলেন,—তিনি যে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন, তার মূল উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা। জার্মাণ রাষ্ট্র তাঁকে যে বেতার যন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এটা পরম পরিতোষের বিষয়। তিনি বলেন, "বেতার যন্ত্রের ব্যবহারে মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকার কখনই অনুমতি দেয় নি, অথচ সেই বেতার যন্ত্রকেই মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার কার্য্যে তারা নিযুক্ত করেছে।"

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন যে একমাত্র ব্রিটেনেই একথা অবিদিত যে ভারতের সমগ্র অধিবাসী, যেটা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ, অবিলম্বিত স্বাধীনতার দাবীতে সম্পূর্ণ একমত। ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে সবচেয়ে ধীর ও স্থির পুরুষ, মহাত্মা গান্ধীও তিন বৎসরকাল প্রতীক্ষার পরে ব্রিটেনের উপর আস্থা হারিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ব্রিটিশরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছে যেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্যাপারটি এই দুই সম্প্রদায়ের অভেদ-মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছিল। ইংরেজরা এযাবৎকাল বিভেদনীতিই অনুসরণ করে এসেছে। এমনকি বর্ত্তমানেও, মিত্রশক্তির সাহায্যে, ব্রিটেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখতে। এই কারণেই চক্রশক্তির দল যে সাহায্য দানে অগ্রসর হয়েছে, সেইজন্য ভারতবর্ষ কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, "আজ ভারতের সামনে একটি মাত্রই পথ—স্বাধীনতা, নয়ত মৃত্যু। চিরদিনের দাসত্ব, নয়ত প্রাণপণ যুদ্ধ এরই মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।"

শ্রীযুক্ত বসু জানান যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে লক্ষাধিক ভারতবাসী প্রাণদান করে এসেছে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাহ'লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনের জন্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ভারতবর্ষ তার লক্ষ সন্তানের প্রাণ স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করবে না কি? এখনই সময় এসেছে কাজ করবার। ভারতীয় পুলিশ কর্ম্মচারী, সৈনিকদল এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে যে সব ভারতীয় নেতারা

এখনও অধিষ্ঠিত আছেন তাঁদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে ফেলবার জন্য শ্রীযুক্ত বসু বিশেষভাবে আবেদন জানান। যদি সমস্ত ভারতবাসী যথাশক্তি কর্ত্তব্য করে যায়, নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালায়, এবং দরকার হ'লে জীবন দানেও কুণ্ঠিত না হয়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা মিলবে, আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যেই।

—বার্লিন বেতার, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২।

*   *   *

ব্যাংককের ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়েছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ যুদ্ধ আরো দীর্ঘকাল চলবে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হবার আগেই স্বাধীনতা লাভ করবে। এশিয়া থেকে ইঙ্গ-আমেরিকানদের বিতাড়িত করাই জাপানের রণনীতি। এরই ফলে আসবে ভারতের মুক্তি। যখন ভারত স্বাধীন হবে, নির্য্যাতিত ভারতীয় জনগণের মুক্তি সেদিন আপনিই আসবে।"

—আজাদ হিন্দ রেডিও, (সিঙ্গাপুর) ১৬ই জুন, ১৯৪৩।

*   *   *

টোকিও থেকে জার্ম্মাণী ও ইটালির উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বেতার যোগে এই অভিভাষণ দিয়েছেন। জার্ম্মাণীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, "ত্রি-শক্তিবর্গ শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হবে, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়। হের্ হিটলার এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে অনবরত সংযোগের ফলে আমি জেনেছি যে তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে ভারতের মুক্তি সাধনার প্রতি। ইঙ্গ-আমেরিকানদের কবল থেকে ভারত মুক্ত হোক এটা তাঁরা আন্তরিকভাবেই কামনা করেন।"

ইটালির উদ্দেশে তাঁর বিবৃতি এই—"বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ দু'টি আদর্শের সংঘাত মাত্র। একটি হ'ল, অবিচার ও নির্য্যাতনের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাণো জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা। অপরটি হ'ল, সেই

নিয়মতান্ত্রিকতা ধ্বংস করে একটি নূতন ন্যায়সঙ্গত বিধির প্রবর্ত্তন। চক্রশক্তিদল সেই শেষোক্ত আদর্শের জন্যই যুদ্ধ করছে। অতএব ভারত-বাসীদের কর্ত্তব্য তাদের সঙ্গে যোগদান করে ইঙ্গ-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো।"

—স্বাধীন ভারত বেতার (তামিল ভাষায়), ২৯শে জুন, ১৯৪৩।

* * *

জাপানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়েছেন নিম্নোক্ত বিবৃতি তারই লিপিবদ্ধ রূপ :—

"চল্লিশ বছর আগে, যখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন রাশিয়ার উপর জাপান মস্ত এক বিজয়লাভ করে। সেই সময় থেকে জাপানকে আমি চিনতে শিখি এবং শ্রদ্ধা দিই জাপানে এসে পৌছবার পর থেকে জাপানী সরকার এবং অধিবাসীদের কাছ থেকে আমি পরম আতিথেয়তা পেয়ে এসেছি। আমি রাজাও নই কিংবা রাজদরবারের অতিথিও নই। বৌদ্ধদেশ থেকে এসেছি এবং স্বদেশ-মাতার স্বাধীনতাকল্পে গত বিশবছর বিদ্রোহ চালিয়েছি, এইটিই আমার একমাত্র পরিচয়। আমাদের শত্রু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ করেছে এবং তাকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 'ভারত যে ভারতবাসীদের জন্য'ই এই আদর্শটি কার্য্যে পরিণত করবার দৈব-প্রেরিত সুযোগ বর্ত্তমানে ভারতবাসীদের কাছে এসেছে। আমরা যদি এই স্বর্ণ সুযোগ হারাই তাহলে আর কখনও এ শুভলগ্ন আসবে না। আমরা যুদ্ধ করবই, কারণ জয় তো আমাদেরই, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।"

—টোকিও বেতার (জাপানী ভাষায়), ২৮শে জুন ১৯৪৩।

* * *

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়েছেন, "লর্ড ওয়াভেল-এর ভারতের বড়লাটপদে নিযুক্ত হ'বার অর্থই হ'ল, ভারতের ওপর

প্রভুত্ব রক্ষা করবার ব্রিটেনের শেষ চেষ্টা। ওয়াভেলকে রাজপ্রতিনিধি করে, ব্রিটেন চায় ভারতের ওপর ব্রিটেনের অধিকার বৃদ্ধি করতে। ইংরেজ সরকারকে আমি এই সতর্কবাণী জানাচ্ছি যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের যে বিরোধী মনোভাবের আগুন জ্বলছে, বর্ত্তমান কার্য্য তাতে ইন্ধন যোগাবে মাত্র। ভারতবাসীরা দৃঢ়চিত্তে সশস্ত্র আন্দোলন চালাতে তেমন ইচ্ছুক নয়। কিন্তু যদি সশস্ত্র যুদ্ধই ঘোষণা করা হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত জানি যে আমার স্বদেশবাসীরা এরকম যুদ্ধ চালাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে।"

মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে যখন চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন এই চুংকিং রাষ্ট্রনেতাকে ভারতবাসীরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়েছে। কিন্তু যখনই দেখা গেল যে এশিয়ার জাতিগণের স্বার্থনাশ করে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কূটচালে নেমেছেন, তখনই তাঁর জনপ্রিয়তার হানি হ'তে থাকে। সোভিয়েট য়্যুনিয়ন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ভারতবর্ষে সোভিয়েট কম্যুনিস্টগণের অনেক অনুচর কমে গিয়েছে। কারণ বর্ত্তমান সোভিয়েট-জার্মাণ যুদ্ধ সুরু হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি অত্যাচারী ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার কাজ চালাতে মনস্থ করেছে।

বার্লিন বেতার, ২৮শে জুন, ১৯৪৩

*　　　*　　　*

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্ম্মকেন্দ্র প্রথম পরিদর্শনকালে নেতাজী একজন কর্ম্মীকে বলেন :—
"আপনারা কি মনে করেন যে প্রতারণাটুকুও ধরবার মত আমার বুদ্ধিশক্তি নেই? তা হলে আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি নিশ্চিত জানি যে জাপানীরা আমাদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করে আমাদের মতলব ব্যর্থ করতে পারবে না। তারা আমাদের তখনই প্রবঞ্চনা করতে পারে

যখন আমরা ভালভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারব না কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভারতবাসীদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠিত করতে পারব না। আমাদের পরম শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই শুধু নয় অথবা সাম্রাজ্যবাদ-মনোভাববিশিষ্ট জাপানী দলপতিদের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, আমাদের দলভুক্ত ভারতবাসীদের বিরুদ্ধেও আমাদের সমস্ত ক্ষণ সতর্ক ও সুচেতন হ'তে হ'বে। শৃঙ্খলা ও নিয়মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্বার্থত্যাগের জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। সকলেই কাজের জন্য প্রস্তুত হোক্। আপনাদের জন্য অনেক কাজ আমি এনেছি। 'কাজ, কাজ'—এই হল আপনাদের এবং আমার গুরুভার কর্ত্তব্য।"

"শুধু আইন আমান্য আন্দোলন নিয়েই আমরা তৃপ্ত নই। সময় ও সুযোগ এলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আমাদের অস্ত্র তুলে নিতে হবে।" আজ শোনানে এক বৃহৎ ভারতীয় জনতা সমাবেশের সম্মুখে নেতাজী এই অর্থে মন্তব্য করেন। "বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতেও ভারতবাসীরা প্রস্তুত আছে। যখন সময় উপস্থিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠচিত্তে সশস্ত্র আন্দোলন চালনার উদ্দেশ্যে ভারতের মধ্যেকার অথবা বাইরের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির এখন আমাদের অধিনায়কত্বে সুশৃঙ্খল যুদ্ধনিপুণ সঙ্ঘবাহিনীতে পরিণত হতে হবে।"

—টোকিও বেতার—ইংরেজী ভাষায়—৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩।

* * *

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সদস্যবর্গের প্রতি অভিভাষণে নূতন সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন; "সত্বর স্বাধীনতা লাভ করতে হলে দু'টি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম :—অনুকূল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি আর দ্বিতীয় স্বাধীনতা-লাভ না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালনার স্থির সঙ্কল্প। আমার দৃঢ় ধারণা যে ত্রি-শক্তি-বর্গ আমাদের দিকে এবং ব্রিটেনের সহিত

যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। আমি জানি যে সকল চক্র-শক্তি, বিশেষ করে জাপান আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আমাদের সাহায্য দান করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাই বলছি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল এবং শত্রুকে মারবার সুযোগ আমাদের হাতে। আশা করি, আপনাদের স্মরণ করাতে হবে না যে চক্র-শক্তির জয়লাভের সঙ্গে ভারতের মুক্তি বিশেষভাবেই জড়িত।"

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন, তামিল ভাষায়) ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩।

* * *

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্ম্মকেন্দ্র থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে যে সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিগণ শোনানে মিলিত হয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আজ সভাপতির পদে বরণ করেছেন।

নূতন সভাপতি সদস্যদের অভিভাষণ জানিয়ে বলেন, "সঙ্ঘের সভাপতির যা কর্ত্তব্য, তা করার আগে আমি শপথ নিচ্ছি যে স্বদেশ-মাতার সেবায় এবং দেশবাসীগণের স্বাধীনতাকল্পে আমি আত্মনিয়োগ করছি। সমস্ত ভারতীয়কে আমি আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা আমার অনুসরণ করে একনিষ্ঠভাবে স্বদেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করবার পবিত্র অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। সত্বর স্বাধীনতালাভের জন্য দু'টি জিনিষের প্রয়োজন। একটি হ'ল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির আনুকূল্য। আরেকটি হ'ল, স্বাধীনতালাভ না করা পর্য্যন্ত অবিরত, আন্তরিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ত্রয়ী শক্তি আমাদের অনুকূল এবং ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধে তারা নিশ্চিত জয়লাভ করবে। আমি জানি চক্র-শক্তিব্যূহের প্রত্যেক সদস্যই, বিশেষ করে, জাপান আমাদের উদ্দেশ্য পোষণে অনুকূল এবং আমাদের সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্যদানে উৎসুক। তাই আপনাদের বলি যে বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থায় শত্রুকে আঘাত করবার যথোপযুক্ত সুযোগ এসেছে।"

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন, "মাত্র আইন-অমান্য আন্দোলনেই আমরা সন্তুষ্ট নই। সময় সুবিধা এলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ আমাদের করতেই হবে। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে ভারতীয়গণ প্রস্তুত। আমাদের সমস্ত রসদ ও যুদ্ধের উপকরণ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য আমার ইচ্ছা, যে ভারতীয় বিদ্রোহ যাতে সম্পূর্ণ সফল হয় তার জন্য একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ভারতের মধ্যেই হোক্ আর বাইরেই হোক্, যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন আমাদের অধিনায়কত্বে সুনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'তে হ'বে। যাতে সময় ঘনিয়ে এলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সফল হয়। এই উদ্দেশ্যে, অস্থায়ী সরকার ভারতের মধ্যের অথবা বাইরের সমস্ত লোককেই শিক্ষিত ও প্রস্তুত করবে, যাতে ১৮৫৭ সাল থেকে আবহমান জাতীয় আন্দোলন ও বিদ্রোহী চেষ্টা সফল হ'তে পারে। বিদ্রোহ যখন সার্থক হ'বে, ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর দল বিতাড়িত হ'বে, তখনই অস্থায়ী রাষ্ট্রের কাজ শেষ হবে। তখন ভারতের জনগণেরই অভিমত একটি চিরস্থায়ী ভারতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হ'বে। এই শেষ যুদ্ধের জন্য আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লে, আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ত্রি-শক্তি চালিত দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিলিত হবে আমাদের সশস্ত্র আন্দোলন। এই যৌথ যুদ্ধের অংশ গ্রহণেই আমরা আগামী স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার অধিকারী হতে পারব।"

শ্রীযুক্ত বসু এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন :—"ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে আমাদেরই নিজের চেষ্টার উপর, আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করবার আগ্রহের উপর। সাহস ও সঙ্কল্পের অভাব না থাকলেও আমরা এ যাবৎ আন্দোলনে যে বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েছি, এ কথা বলতে পারি না। সহস্র বলপ্রয়োগই একমাত্র স্বাধীনতা আনতে সক্ষম। অতএব, আজ থেকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র নিয়েই লড়তে হবে। আমাদের যুদ্ধোপকরণ সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সাময়িক

কাজ চালানোর উদ্দেশে একটী অস্থায়ী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান আমার অভিপ্রেত। ভারতবাসীদের ও বাইরের ভারতীয়গণের যুদ্ধ প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ভার থাকবে এই অস্থায়ী সরকারের উপর। ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা যাতে কৃতকার্য্য হই, সে সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা এই সরকারেরই কর্ত্তব্য। বিদ্রোহ সার্থক হলে আমরা স্বাধীন হ'ব এবং ভারতীয় জনমতের নির্দ্দেশানুযায়ী একটি চিরস্থায়ী জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই সাময়িক জাতীয় সরকার আগামী শেষ যুদ্ধের জন্য সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করবার কাজে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে চক্র-শক্তির সহযোগিতায় যুদ্ধ চালনায় আমাদের আনুকূল্য করবে। অক্ষ-শক্তির বিজয়লাভের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, আশা করি এ কথা আপনারা ভালোভাবেই জানেন।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩।

* * *

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রথম উদ্বোধনে নেতাজী বসু এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত অভিভাষণ দেন—

"বন্ধুগণ! যে সব ভারতবাসী স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁদের বলতে চাই যে কাজ সুরু করার সময় এসেছে। যুদ্ধ-সঙ্কটে সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যেটি সবচেয়ে দরকারী, সেটি হ'ল সামরিক সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা, আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা। সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের আজ আমি এই জানাচ্ছি যে আগামী যুদ্ধের কঠোর পরীক্ষার জন্য তাঁরা একতা-বদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কর্ত্তব্যে তাঁদের অবহেলা বা ত্রুটি হবে না।"

"বহুবার প্রকাশ্যে আমি এ কথা বলেছি যে যখন ১৯৪১ সালে আমি স্বদেশ ছেড়ে চলে আসি একটি উচ্চ আদর্শের আশায়, তখন আমার

স্বদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির শুভেচ্ছা আমার স্বপক্ষে ছিল। সেই দিন পুলিশ ও গুপ্তচরের শত চেষ্টা ও বাধা প্রদান সত্ত্বেও দেশবাসিগণের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক আমি রক্ষা করে এসেছি।"

"ভারতে যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্বদেশী আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁদেরই অছি-হিসাবে ভারতের বাইরে স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় দল আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের সকলকেই এ কথা জানাচ্ছি যে আজ পর্য্যন্ত যা করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে করা হবে, তার পিছনে আছে ভারতের মুক্তি কামনা। এমন কাজ আমরা করব না ও করতে পারি না যা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ-বিরোধী অথবা আমাদের স্বদেশবাসীর মত-বিরুদ্ধ।"

"যাতে সুশৃঙ্খলায় যুদ্ধকার্য্য চালানো যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠিত করতে চাই। আমাদের স্বার্থত্যাগে, আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করব এবং নৈতিক শক্তি সঞ্চয়ে চিরদিন ধরে সেই স্বাধীনতাকে পরহস্তের লোলুপ স্পর্শ থেকে রক্ষা করব। তবে আপনাদের প্রতি আমার এই সতর্কবাণী—যে যদিও শেষ ফলাফল, যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে আমরা এক প্রকার সুনিশ্চিত, তবুও শত্রুপক্ষের কল-কৌশল-বিচারে আমরা যেন তাদের নিকৃষ্ট বিবেচনা না করি। এমন কি, সাময়িক ভাবে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হ'বে। আমাদের সাম্‌নে কঠিন পরীক্ষা আসন্ন। কারণ আমাদের শত্রুপক্ষের ছল-বল-কৌশলের অভাব নেই। স্বাধীনতার এই শেষ অভিযানে আপনাদের অনেক স্থলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশেষ কষ্ট সহ্য করতে হবে—সঙ্কট মুহূর্ত্তে অতি দ্রুত প্রয়াণ, এমন কি—মরণের সম্মুখেও দাঁড়াতে হবে। কিন্তু একবার যখন আপনারা এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তখনই স্বাধীনতা আপনাদের করতলগত হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস —এ কাজ আপনারা পারবেন এবং আপনাদেরই উদ্যমে স্বদেশকে দৈন্য, দুর্দ্দশা ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৫ই জুলাই, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*　　　*

"১৯৪০ সালে মিষ্টার জিন্নার সঙ্গে একটা আপোষে মীমাংসার জন্যে আমি অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমায় নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। মুশ্‌লিম লীগ একটি ব্রিটিশদের স্বপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান, 'যো হুকুম' এবং খয়ের-খাঁ লোকের দ্বারা ভর্ত্তি। সেই জন্যে বড়লাট গুরু প্রয়োজনে মিষ্টার জিন্নাকে হামেশাই ডেকে থাকেন। ব্রিটিশরাই মুস্‌লিম লীগের সৃষ্টি করেছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের পিছনে আছে লক্ষপতিজাতীয় এবং অভিজাত জমিদারবর্গ। ১৯৪০ সালে, যখন ফ্রান্সের প কাজে আর ব্রিটিশদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌ল, তখন যদি কংগ্রেসের সঙ্গ মুস্‌লিম লীগের মিলন হ'ত তাহলে এতদিনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে যেত। কিন্তু জিন্না সাহেব তখন বৃহত্তর স্বার্থবিরোধী, ভারতের স্বাধীনতা ও অগ্রগতির পরিপন্থী পাকিস্তান পরিকল্পনার ওপর জোর দিতে লাগলেন। অনেক দিন ধরেই ব্রিটিশরা ভারতে বিভেদনীতি অনুসরণ করে' রাজত্ব চালিয়ে এসেছে। আমাদের শক্তি আরও হ্রাস করবার উদ্দেশ্যেই, তারা মুশ্‌লিম লীগের মতন একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে ভারতের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা কায়েমি করতে চায়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাটা যে ব্রিটিশদেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত এ বিষয় কারুর অণুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর গঠন থেকে—যেখানে বেশির ভাগই মুসলমান সৈনিক, অথচ হিন্দু সহকর্ম্মীদের সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ সদ্ভাব।"

বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন—"স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র শীঘ্রই পরিকল্পিত রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে এবং যতদিন না ব্রিটিশরা ভারত থেকে বিতাড়িত হয়, ততদিন সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে এই রাষ্ট্র আপনার কাজ করে যাবে। তারপর যেদিন ভারত স্বাধীন হবে, সেদিন এই অস্থায়ী সরকারের পরিবর্ত্তে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে ভারতের জনমত-অনুযায়ী। আমার বিশ্বাস যে জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের স্বপক্ষে ওকালতী করে স্বদেশের জাতীয়তাবাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছেন।

সরল মুসলমানদের মনোমুগ্ধকর ভাষায় বশীভূত করে তিনি তাদের ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছেন, উপরন্তু তাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ সঙ্কীর্ণতায় যথেষ্ট প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং তাতে অযথা ইন্ধনও যোগাচ্ছেন। আমরা সবাই জানি, যদি পাকিস্তান কার্য্যতঃ পরিণত হয়, তাহলে ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। মুসলমানরা এ কথা বুঝতেছেন না যে ইংরেজরা মুসলমানের এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের শত্রু আর এযাবৎ তাদের সমস্ত নীতি ও আজ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তারা প্রয়োগ করে এসেছে। ব্রিটিশরা ভারতের সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এবং ভারতবর্ষকে দাসত্বে নিয়ে আসে। ব্রিটিশরা কি কোনো দিন ভারতকে মুক্তিদান করবে? আমরা মনে করি, তারা কখনই আমাদের স্বাধীনতা দেবেনা! বরঞ্চ আমাদের ওপর প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে আমাদের আরো দৃঢ় করে বাঁধবে। আমার আরেকটি ধারণা এই—যে জিন্না সাহেবের কোনো আগ্রহ নেই ভারতের স্বাধীনতা-সম্পর্কে। যদি মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি আন্তরিক ও সততা-পরায়ণ হতেন, তাহলে এতদিন অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তিনিও কারাবাস করতেন। ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ও সঙ্কটে জিন্নাসাহেব তো কিছুই করছেন না। উপরন্ত, কয়েকটি বাক্‌সর্ব্বস্ব আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে আপনারই আত্মপ্রসাদ বাড়াচ্ছেন। জিন্না সাহেবের যাঁরা পার্শ্বচর, তাঁরা হলেন ব্রিটিশ সরকারের ছায়াশ্রিত ধনিক-শ্রেণীর এবং অভিজাত মুসলমান জমিদারবর্গ। সে যাই হোক্—এ সব ব্যক্তির কার্য্যকলাপের জন্য, ব্রিটিশদের সাহায্য দানের জন্য, আমরা এঁদের ঘোর নিন্দা করি। স্বাধীনতা-লাভের জন্যই আমরা উৎসুক। স্বদেশের স্বাধীনতা-কল্পে একটি স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছে এবং ভারতীয় সৈনিকদল যদি তাঁদের দেশ থেকে ব্রিটিশদের প্রভাব সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন, তাহলে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁরা অশেষ উপকার সাধন করবেন।"

—ব্যাংকক্ বেতার, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৩।

*   *   *   *

সিঙ্গাপুর টাউন হলের পুরোভাগে এক বিশিষ্ট সামরিক প্রদর্শনীতে, ভারতের জাতীয় বাহিনীর সৈনিকদলকে সম্ভাষণ জানিয়ে নেতাজী বসু এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দিয়েছেন :—

"ভারতের মুক্তি সেনার বীর যোদ্ধৃগণ!

আজ আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের দিন। আজ ঈশ্বরে কৃপায় সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মহা গৌরবে ঘোষণা করবার দিন উত্তর দল যে ভারতের মুক্তি সেনার অস্তিত্ব বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যে ন হ'ল একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এত বড় ঘাঁটি ছিল, সেই সিঙ্গাপুরে রণক্ষেত্রেই এই বাহিনী আজ সামরিক কৌশলে প্রস্তুত এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ইংরেজের জোয়াল থেকে ভারতকে মুক্ত করবে এই স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী। প্রত্যেক ভারতবাসী শুনে গর্ব্ববোধ করবে যে এই সেনাবাহিনী ভারতীয় নেতৃত্বে পরিচালিত এবং যখন সেই চরম ক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন ভারতবাসীর অধিনায়কত্বেই এই বীর বাহিনী অগ্রসর হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধি স্থলে দাঁড়িয়ে একটি শিশুও জোরের সঙ্গে বলতে পারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন অতীতের বস্তু।"

"সঙ্গিগণ! হে আমার সৈনিক দল! আপনাদের মুখে এই যুদ্ধবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠুক্ 'দিল্লী চলো! দিল্লী চলো!' আমাদের মধ্যে ক'জন এই স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ রক্ষা করতে পারবে, তা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা আমি জানি ও সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আমরা শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করবই। আমাদের কাজ কখনই শেষ হবে না, যতক্ষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর এক শ্মশানভূমি প্রাচীন দিল্লীর লাল কিল্লার অঙ্গনে আমরা সামরিক কুচকাওয়াজ বিজয় গৌরবে অনুষ্ঠিত করতে না পারি।"

"আমার রাষ্ট্র জীবনে এ সত্য আমি বার বার অনুভব করেছি যে ভারত প্রত্যেক বিষয়ে, প্রতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবার জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত। কেবল একটি উপকরণের অভাব—জাতীয় মুক্তি সেনা

ভারতের নেই। জর্জ্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁর অধীনে ছিল সৈন্যদল। গ্যারিবল্‌ডি ইটালির মুক্তি সাধনা সম্ভব করেছিলেন, তার কারণ তাঁর পিছনে ছিল সুসজ্জিত, সশস্ত্র স্বেচ্ছা-বাহিনী। আপনারাই যে প্রথম এগিয়ে এসে ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করলেন, এ আপনাদেরই আশাতীত সৌভাগ্য ও সম্মান। যে সব সৈনিক স্বদেশের একনিষ্ঠ ভক্ত, কৌশল স্থাতেই যাদের দেশানুরক্তি অটল, যারা স্বদেশ সেবায় আত্মদানে মোগল দ হয় না, তারা অপরাজেয়। আপনাদের হৃদয়ে এই তিনটি গভীর ব্রিটিশজ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকুক।"

ব "বন্ধুগণ! আপনাদের হাতেই আজ ভারতের জাতীয় সম্মান, ভারতের আশা ভরসা ন্যস্ত রয়েছে। অতএব আপনারা এমন ভাবে কাজ করুন যাতে স্বদেশবাসীদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ আপনার ওপর বর্ষিত হয়, ভবিষ্যৎ পুরুষের বংশধরগণ আপনাদের নিয়ে গর্ব্ব বোধ করতে পারে। আপনাদের আমি এ আশ্বাস দিতে পারি যে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জয়ে অথবা পরাজয়ে আমি আপনাদের পাশেই আছি ও থাকব। তবে বর্ত্তমানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট, পরিশ্রমে আর দ্রুত অপসরণ এমন কি মৃত্যু এ ছাড়া অন্য কিছু নিবেদন আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে আমি অসমর্থ। আমাদের মধ্যে কারা শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভারত দেখার অধিকার পাবে—সে কথাটা নিতান্তই গৌণ। ভারত স্বাধীন হবে এই আদর্শটাই মুখ্য এবং যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করবই। ঈশ্বর আপনাদের বাহিনীকে কৃপাশীর্ব্বাদ দিন। আগামী যুদ্ধে আমরা জয়যুক্ত হই, এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা!"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৫ই জুলাই, ১৯৪৩।

* * *

এক বৃহৎ জন সমাবেশের সম্মুখে নেতাজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন :—

"কি কারণে আমি গৃহ ও স্বদেশ ত্যাগ করে নানা বিঘ্নসঙ্কুল পথে

অগ্রসর হই, তা আমি আপনাদের খোলাখুলি ভাবে বলতে চাই। ইংরেজের কারাবাসে আমি নিরাপদ ভাবেই আটক ছিলাম ; এমন সময়ে একদিন আমি নিজের মনে মনে স্থির করলাম যে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় আমাকে সমস্ত বিপদই বরণ করে নিতে হবে। এগারো বার যখন কারারুদ্ধ হয়েছি, তখন কারাগারে আবদ্ধ থাকাই আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম ভারতের স্বাধীনতা-সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবেই তাতে যত [illegible] ;— হোক না কেন।"

"দীর্ঘ তিন মাস কাল প্রার্থনায় এবং আত্মসমাহিত অবস্থায় কারামুক্তির পরে আমার কর্ত্তব্য-পালনে মৃত্যুকেও বরণ করে নেবার মত শক্তি অর্জ্জন করলাম। ভারতবর্ষ থেকে কৌশলে সরে পড়ার আগে কিন্তু কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে দরকার হ'ল এবং সেইজন্যে মুক্তি দাবী করে আমি অনশন ব্রত সুরু করলাম। আমি জানি যে ইতিপূর্ব্বে কি ভারতে, কি আয়র্লণ্ডে কোথাও কোথাও কোনো রাজবন্দী ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিয়ে কারামুক্ত করাতে বাধ্য করতে পারেন নি। আমি এও জানতাম টেরেন্স্ ম্যাক্‌সুইনি এবং যতীন দাস সরকারকে বাধ্য করবার চেষ্টায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে আমাকে এই দৈবাদিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করতেই হ'বে। তাই আমি মনস্থির করে ঝাঁপ দিলাম। সাতদিন অনশন ব্রত চালাবার পরে সরকার হঠাৎ কেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিল। মতলব ছিল, যে মাসখানেক কি মাস দুই পরে আমাকে আবার কারারুদ্ধ করা হবে। কিন্তু আমাকে ফের ধরতে পারার পূর্ব্বেই মুক্ত হ'লাম।"

"বন্ধুগণ! আপনারা জানেন যে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পর থেকেই আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগদান করেছি এবং কার্য্যভার গ্রহণ করে এসেছি। গত বিশ বছরের মধ্যে যত কিছু অসহ-

যোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছে তার মধ্য দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি। এ ছাড়া বহুবার বিনা বিচারে, কি অহিংস, কি সশস্ত্র-গোপন বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত আছি এই সন্দেহে আমাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ভারতের ভিতর থেকে আমরা যত আন্দোলনই করি না কেন, দেশ থেকে ইংরাজকে বিতাড়িত করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।"

"সংক্ষেপে বলতে হ'লে আমার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে আমি সাহায্য করব। অপর পক্ষে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে যে বৈদেশিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন, সেটা প্রকৃতপক্ষে অতি অল্পই। আমার স্বদেশবাসীর জন্য যে বাহ্য সাহায্যের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে সেটা নৈতিক এবং বাস্তব ও কার্য্যকরী। তা হ'লে প্রথমে তাদের মনে এই ধারণা জন্মাতে হ'বে যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, বাইরে থেকে তাদের সামরিক সাহায্য দিতে হবে।"

"এখন সেই সময় এসেছে। এখন আমি প্রকাশ্যে, সমস্ত পৃথিবীর সামনে আমাদের শত্রু-পক্ষকেও জানাতে পারি কি করে স্বদেশের এই মুক্তি-লাভের উপায় আমরা স্থির করেছি। ভারতের বাইরে যে সব ভারতবাসী আছেন, বিশেষ করে পূর্ব্ব-এশিয়ায়, তাঁরা একটি সেনা বাহিনী গঠন করেছেন যা ভারতে ব্রিটিশবাহিনী আক্রমণ করার মত শক্তিশালী হবে। যখন আমরা সে কাজ করব, সারা দেশে তখন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে এমন কি ব্রিটিশ পতাকার নীচে যে ভারতীয় সেনাদল যুদ্ধ করে থাকে, তাদের মধ্যেও। এইরূপে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের ভিতরে এবং বাইরে উভয়দিক হ'তে আক্রমণ করলে তার পতন অনিবার্য্য। ভারতবাসী তখনই স্বাধীনতা ফিরে পাবে। আমার বক্তব্য হ'ল এই যে এ অবস্থায় ভারতের প্রতি চক্রশক্তির মনোভাব কি রকম তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যদি ভারতের অধিবাসী আর ভারতের বাইরে প্রবাসীর

দল তাঁদের কর্ত্তব্য করে যান, তাহলে ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা এবং আটত্রিশ কোটিরও উপর স্বদেশবাসীদের মুক্ত করা মোটেই অসম্ভব হবে না। বন্ধুগণ! পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের মুখে এই বাণী ধ্বনিত হোক্ 'প্রাণপণ লড়াইয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও আয়োজন।' এই সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা ও আয়োজন থেকে প্রত্যাশা করছি অন্ততঃ তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিনকোটী ডলার। এই সঙ্গে আমি এ ও চাই যে ভারতীয় বীর রমণীরা একটি মরণবরণ বাহিনীদল গঠিত করুন, যাঁরা ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সেই প্রথম যুদ্ধে পরম তেজস্বিনী ঝাঁসির রাণী যে তরবারি চালিয়ে ছিলেন সেই তরবারি আবার চালাতে সমর্থ হবেন।"

"বর্ত্তমানে আমার স্বদেশবাসীরা অত্যন্ত বিপন্ন এবং তাঁরা দাবী করছেন দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা হোক। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধের সম্পূর্ণ রসদ ও আয়োজন আমাকে দিন; আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি দ্বিতীয় রণক্ষেত্র শীঘ্রই খোলা হবে—ভারতে আসন্ন স্বাধীনতার জন্য সত্যকারের সমরাঙ্গন।"

—(সিঙ্গাপুর বেতার, ৯ই জুলাই, ১৯৪৩)

১৯৪৩ সালে ১২ই জুলাই তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের মহিলা বিভাগ কর্ত্তৃক আহূত ভারতীয় মহিলাদের এক বিরাট সভায় নেতাজী এক বক্তৃতা দেন :—

"ভগ্নিগণ! ১৯২১ সাল থেকে গত বাইশ বছর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় কংগ্রেস নবজীবন লাভ করেছে। এই স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমাদের স্বদেশবাসীরা কিভাবে অংশ গ্রহণ করছেন, সে কথা আপনাদের এবং আমারও অবিদিত নেই। শুধু কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনেই নয়, গোপন ও বিপ্লবী কর্ম্মেও আমাদের দেশ-ভগ্নীরা অনেক কাজ করেছেন। বস্তুতঃ যদি বলা

যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এমন কোন বিভাগ নেই যার সঙ্গে ভারতীয় মহিলাদের নিরন্তু, আন্তরিক প্রচেষ্টা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় এবং আমাদের পুরুষ-কর্ম্মীদের সঙ্গে তাঁরা সমস্ত জাতীয় কাজের গুরুভার সানন্দে ও বলিষ্ঠ চিত্তে তুলে নিয়েছেন, তা' হলে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না। ক্ষুধায় খাদ্য ও তৃষ্ণার জল না পেয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ, সভায় সভায় বক্তৃতা দান, ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার, নির্ব্বাচনের আনুসঙ্গিক প্রচারকার্য্য, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে অকথ্য লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ, উপরিওয়ালাদের হুমকির বিরুদ্ধে নগরে নগরে মিছিল ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা, সরকারের নির্ম্মম অপমান ও লাঠিচালনা তুচ্ছ করে হাসি মুখে নির্ভীক মনে নির্য্যাতন ও কারাবরণ—এ সমস্ত কাজেই আমাদের নারী-কর্ম্মীরা কখনই পশ্চাৎপদ হননি। বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রেও আমাদের তেজস্বিনী ভগ্নীগণ অগ্রণীস্বরূপ। দরকার হ'লে পুরুষদের মত তাঁরাও যে অস্ত্র-ব্যবহারে, বন্দুকচালনায় স্থিরলক্ষ্য, সে কথা তাঁরা প্রমাণ করেছেন। আজ আপনাদের ওপর আমি গভীর আশা, আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করছি এই কারণে যে আমি ভালো করেই জানি আমার ভগ্নীরা কতখানি সহিষ্ণু ও কর্ম্মপটু।

ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে প্রত্যেক সাম্রাজ্যের যেমন উত্থান হয়, তেমনি পতনও হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও পৃথিবী থেকে একদা নিশ্চিহ্ন হবে, এখন সেই সময় এসেছে। আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এই ভূভাগ থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য কেমন ভাবে মুছে গিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর আরেক স্থান, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আজ যদি এখানে কিংবা অন্যত্র প্রথম কোনো মহিলা থাকেন যিনি কাঁধে বন্দুক তুলে নেওয়া কাজটাকে অশোভন বিবেচনা করেন, তাহলে তাঁকে বলছি ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা একবার খুলে দেখতে। আমাদের

দেশের বীর মহিলারা পূর্ব্বে কি করেছেন? ১৮৫৭ সালে, ভারতে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁন্সির বীর রাণী কি করেছিলেন? অশ্বপৃষ্ঠে, মুক্ত অসি হস্তে এই রাণীই যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদের পরিচালনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পরাস্ত হন, এবং ভারতের দুর্দ্দিন আবার নেমে আসে। কিন্তু ১৮৫৭ সালে এই মহীয়সী মহিলা যে কর্ম্মের সূত্রপাত করে গেছেন, সেই কাজ এখন আবার আপনাদের চালাতে হবে ও শেষ করতে হবে। তাই, স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের পেতে হ'বে ঝাঁন্সির রাণীর মত একটি মহিলা নয়,—অনেক, অনেক নারী কর্ম্মী। ক'টা বন্দুক আপনাদের আছে, ক'বার গুলি আপনারা ছুঁড়লেন, সেইটেই কি বড় কথা? আপনাদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আদর্শ ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্তই এখানে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ১৩ই জুলাই, ১৯৪৩।

* * * * *

সিঙ্গাপুরে এক বিপুল সভায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দেন :—

"ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের অপসারণের দাবী জানানোর ফলে মহাত্মাজী প্রায় এক বছর হ'ল কারারুদ্ধ হয়েছেন। তার পর থেকে আইন অমান্য আন্দোলন এবং নানাবিধ ক্ষতি ও পণ্ড-প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতা আজো আমাদের নাগালের বাইরে। এ স্বাধীনতা আমরা কখনোই পাব না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে দ্বিতীয় রণাঙ্গন প্রস্তুত না হয় এবং ব্রিটিশ ও তাদের মিত্র শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসী ও ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী অস্ত্রধারণের আহ্বান স্বীকার না করে।

"আজ এই সভায় আমার এতগুলি মুসলমান ভাইদের সমবেত হ'তে দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা আমার যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন

এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের হিতার্থে আমার হাতে যে টাকার থলি দিয়েছেন, তার জন্যে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমস্ত পৃথিবীর লোক এবং আমাদের শত্রুপক্ষ জানুক যে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় আজ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একত্র মিলিত এবং একই দেশজননীর মুক্তি সাধনায় যুদ্ধোদ্যমে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

আজ আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ কালে এই মর্ম্মে নেতাজী এক ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন :—

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্যাণ ইচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় আজ থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব আমি গ্রহণ করলাম। এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য ও গৌরব। ভারতীয় মুক্তিসেনার অধিনায়ক পদপ্রাপ্তির চেয়ে ভারতবাসীর কাছে আর কি উচ্চতর সম্মান থাকতে পারে? আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর আজ্ঞাবহ অনুচর বলেই আমি নিজেকে মনে করি। আমার স্থির সঙ্কল্প এই যে আমার কর্ত্তব্য এমন ভাবে সম্পন্ন করে যাবো, যাতে ঐ আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থ এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয় আর একজন স্বদেশবাসীও আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে অনুতাপ না করেন। অবিমিশ্র স্বদেশ প্রেম, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার এবং অপক্ষপাতের ভিত্তির উপরেই ভারতের মুক্তিসেনা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।

"আমাদের দেশমাতার আগামী মুক্তি সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ত্তব্যই সব চেয়ে গুরুভার। সে কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে করতে হলে চাই একটি স্থির লক্ষ্য—ভারতের স্বাধীনতা। হয় মুক্তি নয় মৃত্যু—এটাই হ'বে সেনাবাহিনীর একমাত্র আদর্শ। আমরা যখন সবাই মাথা তুলে দাঁড়াবো, আজাদ হিন্দ ফৌজকে পাথরের প্রাচীরের মত কঠিন ও দুর্ভেদ্য হতে হ'বে।

আমরা যখন অভিযান সুরু করবো, এই বাহিনীকে তখন অগ্রগামী ষ্টীম-রোলারের মত কাজ করতে হবে।"

"আমাদের কাজ সহজ সাধ্য নয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী ও কঠোর হবে বলেই আমার ধারণা। কিন্তু আমাদের জয়লাভে আমার অখণ্ড বিশ্বাস আছে। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ এই আটত্রিশ কোটি নিখিল ভারতের সন্তান দল। তাদের স্বাধীনতার দাবী অপ্রতি-রোধ্য। সেই স্বাধীনতা যে কোনো মূল্যেই অর্জ্জন করতে তারা আজ প্রস্তুত। অতএব পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

"সঙ্গিগণ! আমাদের কাজ আরম্ভ হয়েছে। "দিল্লী চলো!" এই রব তুলে, আসুন আমরা এগিয়ে চলি। যতদিন পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদ চূড়ায় জাতীয় পতাকা শোভিত না হয় আর ভারতের পুরাতন লাল কেল্লায় সামরিক বিজয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হয়, ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেই, যুদ্ধবিরতি নেই।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক লক্ষ টন চাল সরবরাহ করার যে প্রস্তাব তিনি পাঠিয়েছিলেন, তারি উল্লেখ করে নেতাজী বলেন যে যদি ভারত সরকার সে প্রস্তাব সত্যিই গ্রহণ করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ তার জবাব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ কাল গত হয়েছে, আজো সে প্রস্তাবের উত্তর মেলেনি। নেতাজী বলেন, "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ যে চাল দেবার প্রস্তাব জানিয়েছেন, সে সংবাদ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ভারতবাসীরা এতদিনে বুঝে নিয়েছে যে ভারত সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন্। ভারত সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ও অযথা বিলম্ব করছে। তার কারণ এই যে আমাদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেই সরকারকে স্বীকার করতে হয় তারা বর্ত্তমান অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে

অপারগ আর সারা দুনিয়ার কাছে ব্রিটিশরা ভারতের খাদ্য সঙ্কটের যে ভয়াবহ অবস্থা গোপন করার জন্যে চেষ্টা করছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের প্রচার বিভাগ কিছুকাল ধরে ভারতে দুর্ভিক্ষ নেমেছে এ তথ্যটি অস্বীকার করে আসছে। কাজেই এখন যদি আমাদের স্বাধীনতা সঙ্ঘের তরফ থেকে যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, সেটি তারা স্বীকার করে নেয়, তা হলে তারা এতদিন ধরে যে সব রটনা ও বিবৃতি প্রকাশ করেছে সেগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়। অতএব, ভারত সরকার যে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হবে, এটা আশা করা বৃথা।"

-রেঙ্গুন বেতার, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়েছেন যে ভারতের অনশনক্লিষ্ট জনগণের দুঃখমোচনের উদ্দেশে এক লক্ষ টন চাল পাঠানোর ব্যবস্থার কথা তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। নেতাজী বলেন; "এখন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে জন সমক্ষে প্রমাণ করুণ যে ভারতের প্রতি তাঁদের তথাকথিত সহানুভূতি অকৃত্রিম। এ কথা বলা বাহুল্য যে ভারতবাসীদের যথোপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করার মত তাঁদের অবস্থা নয়।• খাদ্য-হ্রাস সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে যে সব কনফারেন্স সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাতে ফল কিছুই পাওয়া যায়নি, একমাত্র মোটা মোটা তদন্ত সংবাদ প্রকাশ ছাড়া ভারত সরকার বর্ত্তমান সঙ্কটে একমাত্র যে কাজ করতে পেরেছেন সেটা হ'ল ভারত-বাসীদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে কতক গুলো অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতিদান আর বাক্‌সর্ব্বস্ব, দীর্ঘ সাংবাদিক বিবৃতি প্রকাশ। ভারতবর্ষ যে শস্য উৎপাদন করে তাতে সমস্ত ভারতের প্রয়োজনই কুলিয়ে যায়, এটা সত্য হলেও ভারতবাসীরা আজ কেন অনশনে মারা যাচ্ছে, তার সোজা

কারণ হচ্ছে যে ব্রিটিশরা ভারতের বাইরে সৈন্যদের রসদ যোগাবার জন্যে ভারত উৎপন্ন সমস্ত শস্য সম্পদ্ জাহাজে রপ্তানি করে দিয়েছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে যে চাল রপ্তানি হত, তার প্রচুর ভাণ্ডার এখনও এদেশে রয়েচে। তাই ভারতে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নরনারীর জন্যে ভারতে চাল পাঠাবার ভার আমি গ্রহণ করেচি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ব্রিটিশরা কি এই সরবরাহী চাল ভারতে পৌছুতে দেবে, না ভারতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে তাঁরা জোর ক'রেই অনাহারে রাখবে? জাপান সরকার আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ভারতযাত্রী শস্যবাহী জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার তাঁদের। যদি নিষ্ঠুর ও উদাসীন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ চান যে ভারত ত্যাগের আগে ভারতবাসীরা অনশনে লোপাট হয়ে যাক্, তাহলে আমার এ প্রস্তাব গ্রহণে তাঁরা অসম্মতি জানাবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে, লক্ষ লক্ষ ভারতের নর-নারী-শিশুদের করুণ আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের কর্ণগোচর হ'লে, এ কথা তারা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখুক, যে এই সাংঘাতিক পাপকর্ম্মের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের দিন অদূর ভবিষ্যতেই আসবে এবং সমুচিত শাস্তি তারা এড়াতে পারবে না।"

—রেঙ্গুন বেতার, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

২৭শে জুলাই তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের তেজস্বী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ব্যাংকক্-অধিবাসীদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে প্রবাসী ভারতীয়গণের এক বিরাট্ সভায় এক জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি থাইল্যাণ্ডের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে চক্রশক্তির সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই যে ভারতের স্বপক্ষে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সভাপতি বসু অতীতে ভারতের

মুক্তি সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, "তখন ভারতবাসীরা অন্ধকারে পথ খুঁজে পেতনা বিনা অস্ত্রেই তাদের আন্দোলন চালাতে হ'ত। কিন্তু ভারতের বিপুল জনসমাবেশ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি শিক্ষিত, কি মূর্খ, সকলেই অদম্য স্বাধীনতা-প্রেরণায় আজ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আজ শেষ যুদ্ধের জন্যে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সেনাবাহিনীর সংগঠন ভারতবাসীদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" সেই অভাব পূরণের জন্যই, প্রাচ্য-এশিয়ার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়েরই কর্ত্তব্য হচ্ছে, বাইরে থেকে এমনই একটি বাহিনী গড়ে তোলা। "এ কাজ অবিশ্যি বর্ত্তমানে আরম্ভ হয়েছে এবং সদ্যোগঠিত জাতীয় সেনাবাহিনীর কার্য্যকলাপ বেশ ভাল ভাবেই চলছে। ভারতের জাতীয় বাহিনীর কাছে এসে প্রধান মন্ত্রী টোজো যে ভাবে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন, এজন্য আমরা সবাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছি। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর উপস্থিতি আমাদের অটল নিষ্ঠায় যুদ্ধ চালনার কাজে যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেছে।"

শ্রীযুক্ত বসুর বিশ্বাস আছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উচ্ছিন্ন করবার শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করবার দক্ষতা ভারতবাসীদের আছে। "এ কাজ করতে হলে চাই প্রাচ্য-এশিয়ায় ভারতীয় গণের সমস্ত রসদ, লোকবল এবং যুদ্ধোপকরণের যথাযথ আয়োজন এবং নিয়ন্ত্রণ। অতএব সমর্থদেহ ব্যক্তি মাত্রেই, বয়েসের হিসেব না করে এগিয়ে এসে যুদ্ধে নাম লেখান। শুধু পুরুষ নয়, মহিলারাও এ যুদ্ধে অবশ্যই যোগ দেবেন। যাঁরা বৃদ্ধ ও অশক্ত, তাঁরাও তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব দান করুন। অল্প ও কুণ্ঠিত দানের দিন আজ নয়। স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাকল্পে মুখোমুখি লড়াইয়ের দিন এখন আসন্ন। অতএব আমাদের সমগ্র শক্তি ও উপকরণকে টেনে নিয়ে কাজে লাগানো নিতান্তই প্রয়োজন। ভারতবাসীদের নানা বাধা ও অসুবিধা স্পষ্টই প্রতীয়মান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যুদ্ধের শেষ অবস্থায় তায় পুরোপুরি অংশই গ্রহণ করবে। ভারতের সীমান্তে জাতীয় বাহিনীর

আবির্ভাবের আশায় তারা উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করছে। সীমান্তদেশে আমাদের বাহিনী যখন উপস্থিত হবে, তখন ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেবার প্রকৃত বিপ্লবী প্রচেষ্টা সুরু হবে। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর সম্মানার্থে শোনানে সামরিক অনুষ্ঠানে যে সব ভারতীয় সৈনিক যোগদান করেছিলেন, তাঁরা জানেন যে এটা মাত্র তাঁদের কর্তব্যের প্রথম ধাপ। দিল্লীর লাল কেল্লায় যে বিজয়ী কুচকাওয়াজ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, সেইটিই এর স্বাভাবিক পরিণতি।

শ্রীযুক্ত বসু এই মর্মে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন :—

"এই ঐতিহাসিক যুগের বাসিন্দা বলে আমরা নিজেদের জন্য রীতিমত গৌরব অনুভব করছি। দেশরক্ষার জন্য এই পরম সুযোগ এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালনার এই মহা সুবিধা আমরা আজ পেয়েছি বলে ঈশ্বরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এবং সেই স্বাধীনতাকে অমলিন ভাবে রক্ষা করার জন্য আত্মরক্তদানেও আমরা কুণ্ঠিত নই।"

—ব্যাংকক বেতার, ২৮শে জুলাই, ১৯৪৩।

ব্যাংককে দু'হাজার ভারতীয় অধিবাসীর এক বিশিষ্ট সভায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন :—

"মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে মাত্র সশস্ত্র আন্দোলনের সাহায্যেই ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সম্ভব। ব্রিটেনের সহিত কোনো রকম আপোষে আমাদের কল্যাণ হবে না। বরঞ্চ ভারতের ওপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব আরো দৃঢ় হবে এবং আমাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী হবে। আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে জাপানের সাম্প্রতিক জয়লাভের ফলে ব্রিটেনকে আঘাত করবার সুযোগ আমাদের এসেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস থেকে

ভারতবাসীদের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত যে শক্তির ব্যবহারেই শক্তিকে রোধ করা যায়। অতএব বুঝতে হবে, দেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়াতে হ'লে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হ'লে একটি শক্তিশালী কর্ম্মঠ এবং সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতীয় ভাইদের এমন অবস্থা নয় যে নিজেরা এমন একটি সৈন্যদল গঠন করতে পারে। অতএব, পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য এঁদের সাহায্যদানে অগ্রসর হওয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্য নির্ভর করে তার প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপর, তা পুরুষই হোক্ আর নারীই হোক্। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে যখন এই জাতীয় বাহিনী ভারতের দ্বারদেশে এসে দাঁড়াবে, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদলের সিপাহী ও ভারতীয় কর্ম্মচারীর দল আপনিই আমাদের দলে যোগদান করবে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালাবে। এ ছাড়া, দেশে জন-বিক্ষোভ শীঘ্রই বেড়ে যাবে এবং তখন যে ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সুযোগ পেয়ে স্বকার্য্য সাধন করবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

পরিশেষে তিনি বলেন, "পরম কৃপাময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বদেশোদ্ধারের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। প্রত্যেক ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং সে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য আত্মদানে যে পরাঙ্মুখ হবে না, সে বিশ্বাস আমার অটুট।"

এই প্রসঙ্গে নেতাজী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন যে যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে নিশ্চিত হতে হলে প্রত্যেক ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রয়োজন। তিনি বলেন—

আমার বিশ্বাস যে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের নিয়ে একটি বাহিনী গঠিত করা যায় এবং এদের সাহায্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা যেতে পারে—যেটি ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ নিয়তই প্রত্যাশা করছেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম রণক্ষেত্র অবশ্য ভারতবর্ষেই—

যেখানে আমার স্বজাতীয় ভাইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সত্যাগ্রহ অন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁরা চান এ দ্বন্দ্বের সম্মানসূচক অবসান হোক্। ভারতের মধ্য থেকে এমন এক সেনাবাহিনী গঠন অবশ্য সম্ভব নয়। তাই সমুদ্রের এপারে আমরা যে সব ভারতবাসী আছি তাঁদের উচিত এই বাহিনী গঠন করা এবং বাইরে থেকে আমাদের স্বদেশপ্রেমিক ভাইদের সাহায্য করা। পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধরত জাতির মত, আমাদেরও দেশমাতার মুক্তি সাধনে অজস্র আত্মত্যাগ করতে হবে।" পরিশেষে তিনি অভিমত প্রদান করেন যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ভারত স্বাধীন হবে।

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন) ৩১শে জুলাই, ১৯৪৩।

* * * *

স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :—

"ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক কর্ম্মঠ ভারতীয় নর-নারীর সাহায্যের প্রয়োজন আছে। আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে পূর্ব্ব-এশিয়াস্থিত ভারতীয়গণ সর্ব্ব উপায়ে স্বজাতীয়গণের সাহায্য করবেন। ভারতের বন্ধুগণ নিরুপায়। ব্রিটিশদের বিপক্ষে বিরোধ চালাবার মত তাদের অস্ত্র নেই, তাদের হয়ে লড়াই চালাবার মত উপযুক্ত সেনাদলেরও অভাব। এই সমস্ত অভাব পূরণ করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত হলেও তাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে যদি জয়ের সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হতে চাই। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করুন আর আপনাদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধক্রিয়ায় অশক্ত, তাঁরাও

আমাদের এই বাহিনীর খরচ বাবদ চাঁদা তুলে সাহায্য করতে পারেন।”

ব্যাংকক বেতার, ৩১শে জুলাই, ১৯৪৩।

* * *

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ৫ই আগষ্ট তারিখে ব্যাংককে ভারতীয়গণের এক বিরাট সভায় প্রায় দু'ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন এবং ব্রহ্মের স্বাধীনতালাভ ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলন-সম্পর্কে এই মর্ম্মে অভিভাষণ দেন :—

“ভাই ও ভগ্নীগণ! আপনাদের কাছে আজ এক পরম আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি যদিও ইতিমধ্যে হয় তো আপনারা সে কথা শুনেছেন। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতালাভ পূর্ব্ব-এশিয়ার দেশগুলির কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আমাদেরও বিবেচনায়, এ ঘটনা সত্যিই অর্থপূর্ণ। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা সূচিত করে, কারণ এই থেকে প্রাচ্য ভূখণ্ডে মুক্তি-আন্দোলন ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হবে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনও ব্রহ্মের স্বাধীনতালাভে অনেকখানি উৎসাহিত হবে এবং ভবিষ্যতে শক্তিসঞ্চয় করবে।”

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন :—

“অনেক কষ্ট ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বহু চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করতে হয়। যে স্বাধীনতা বাহ্য শক্তির সাহায্যে কেনা যায়, তা কখনও বেশিদিন টেঁকে না। আজ আমাদের মুক্তি-সেনা গঠিত হয়েছে। এই আমাদের আশা ও সম্বল এবং যতদিন দেশমাতা স্বাধীন না হন, ততদিন এইখানেই আমাদের মিলন-ক্ষেত্র। আমার আশা ও বিশ্বাস যে সেদিনের আর দেরি নেই যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের দ্বারে উপস্থিত হবে এবং দিল্লী অভিমুখে দ্রুত অভিযান সুরু করবে। শোনানে জেনারেল টোজোর সম্মানার্থে তার সামনে যে সামরিক অনুষ্ঠানে আমাদের সৈনিকদল

কুচকাওয়াজ দেখিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন যে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সেটা আরম্ভ মাত্র। এইবার তারা দিল্লীর লাল কেল্লার সামনে সামরিক কায়দায় পদক্ষেপ করবে।"

"যে সব ভারতবাসী এখনও যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতন ও ধ্বংসে বিশ্বাস করতে পারেন না, তাঁদের চোখ খুলবে এশিয়ায় ও য়ুরোপে বর্ত্তমান কয়েকটি ঘটনায়। এ সব আশাবাদী ব্যক্তির উচিত ঐ সমস্ত দেশে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা যে একদা ব্রিটিশ প্রভুত্বাধীন দেশগুলি এখন কেমন মুক্ত হয়েছে। তা হ'লেই তাঁরা বুঝতে পারবেন ইংরেজ রাজত্বের মরণ ঘনিয়ে এসেছে।"

তারপর, শ্রীযুক্ত বসু ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের অটল কর্ম্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে বহুদিন ধরে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালিয়েছেন আর ইংরেজরাও এই জাতীয় আন্দোলনকে অবদমিত করবার জন্য নির্য্যাতনের নানা উপায় অবলম্বন করেছে। ভারতের দেশপ্রেমিকদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে গুলী চালানো হয়েছে এবং কারারুদ্ধ করা হয়েছে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে। কিন্তু আজ অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন হয়েছে। "ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার জন্য ভারতের জাতীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। ভারতীয়গণ এ কাজে সঙ্গিহীন নয়, কারণ তারা যতদূর সাধ্য বৈদেশিক সাহায্য পাবে। ভারতে অচিরেই এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ আসছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠ্‌বার দেরী নেই। আমরা যদি বর্ত্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল কোনোদিনই ঘুচবে না। হয় এখুনি, নয়তো জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত্ত আর কখনো আসবে না।"

—ব্যাংকক বেতার, ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আশা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত ক'রে বলেন, একবার যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রস্তাবিত স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র নিয়ে ভারতে প্রবেশলাভে কৃতকার্য্য হয়, তাহলে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অধিকাংশ অনুচর ও সহকর্ম্মী আমাদের নৈতিক, এমন কি, ব্যক্তিগত সাহায্যদানেও অগ্রসর হবেন, এ কথা সুনিশ্চিত। ভারতের এই তেজস্বী নায়ক, নেতাজী আরো বলেন যে অহিংস ধর্ম্মের একনিষ্ঠ অনুরাগী বলেই হয় তো মহাত্মাজী সশস্ত্র যুদ্ধকে অনুমোদন করেন না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ তিনি কখনোই করবেন না।

প্রস্তাবিত অস্থায়ী রাষ্ট্র যদি ভারতে একবার পরিকল্পিতরূপে দেখা দেয়, তাহ'লে খুব সম্ভব মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যাবে। আর মহাত্মাজীর অনুচরদের মধ্যেও অনেকেই জাতীয় বাহিনীকে সাহায্য করবেন, যদিও তাঁদের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি প্রত্যাশা করা যায় না।

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন :—"মহাত্মা গান্ধীর দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্যক্তিরা ক্রমশঃই এ মত পোষণ করছেন যে ভারতের মুক্তি বিনা অস্ত্রে সম্ভব নয়। ব্রহ্মদেশকে যে সম্প্রতি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাতে শত্রুপক্ষ স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। ভারতের মুক্তিকামী দেশপ্রেমিকদের মনেও এ ঘটনাটি গভীর প্রভাব বিস্তাব করবে। কারণ ভারতের জাতীয় আন্দোলের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বাধীনতালাভের একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া, ব্রহ্মদেশ একদা ভারতেরই অঙ্গবিশেষ ছিল এবং ব্রিটেন কর্ত্তৃক অধিকারভুক্ত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত ভারতের মতই তার অবস্থা ও সম্মান ছিল। তাই, ইংরেজ শাসন থেকে ব্রহ্মদেশ যে মুক্ত হ'ল, এ থেকে ভারতবাসীরা জাতীয় আন্দোলনে অনেকখানি শক্তি ও উৎসাহ পেতে পারবে। ভারতের জনগণের দৃঢ়

বিশ্বাস হয়েছে নূতন ব্রহ্ম-রাষ্ট্র তাদের সর্ব্ববিধ সাহায্যদানে অগ্রসর হবে, যাতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রিটিশ সেনাদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে পারে।"

শ্রীযুক্ত বসুর অভিমত এই যে বর্ম্মায় সম্প্রতি থেকে এবং সদস্যসভায় উপস্থিত থেকে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে বর্ম্মার লোকেরা এবং তাদের জাতীয় সরকার ভারতকে যথোচিত সাহায্য দেবে। তাঁর মতে ডাঃ বা ম' একজন উৎকৃষ্ট, কর্ম্মদক্ষ নেতা যিনি অশেষ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে স্বদেশকে শেষ পর্য্যন্ত বিজয়পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

—রেঙ্গুন বেতার, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

১৫ই আগষ্ট তারিখে শোনানে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীগণ ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতালাভে সাহায্য করেছিল। এখন তারা স্বদেশের মুক্তি কামনায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এখন নয়াদিল্লী-মুখে অভিযান এবং লালকেল্লার গম্বুজে জাতীয় পতাকা স্থাপন করবার আয়োজনে ব্যস্ত। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যে সব ভারতীয় আছেন, তাঁরা দেশের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ দিতে প্রস্তুত। শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন, যে ভিতরে ও বাইরে, উভয় দিক্ থেকে ভারতে ব্রিটিশদের একসঙ্গে আক্রমণ করলে, তাদের চেপে মারা সহজ কাজ। ভারতের লোকেরা যেমন স্বদেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা পেতে ব্যগ্র, ভারতের বাইরে ভারতীয়দেরও সেই দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁর মত এই :—"দুই পক্ষেই একত্র কাজ করবার সময় এবার এসেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয়তার আন্দোলন ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে আরো গভীরভাবে চালাতে হবে। ব্রিটিশদের ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করা উচিত। ভারতীয়

সিপাহীর মধ্যে তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষী প্রচার-কার্য্য চালাতে হবে, যাতে করে ঠিক সঙ্কট মুহূর্ত্তে তারা ইংরেজদের দল থেকে বেরিয়ে যায়। এই দুই কাজ একত্র সুরু হ'লেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসকার্য্য সহজ ও অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

—বার্লিন বেতার, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

এক বেতার বক্তৃতায় নেতাজী সুভাষ বসু বলেন,—

"বর্ত্তমানে ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায় এবং কলকাতা শহরে দুর্ভিক্ষ ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে এই সমস্ত সংবাদ এসে পৌছানোর ফলে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ ভারতবাসীর কল্যাণ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ভারতবাসীদের যথোচিত সাহায্য-দানে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবন করছে। আজ আমি আনন্দের সহিত এ কথা ঘোষণা করছি যে ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে বর্ম্মা থেকে এক লক্ষ টন চাল ভারতে রপ্তানির প্রতীক্ষায় রয়েছে। এ চাল সম্পূর্ণভাবে ও বিনাসর্ত্তে ভারতবাসীদের জন্যই এবং তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারতের নিকটস্থ কোনো বন্দরে মজুত রয়েছে। যে মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ সরকার এই চাল খালাস করে নিতে স্বীকার করে, সেই মুহূর্ত্তেই বন্দরের ও কর্ত্তৃপক্ষের নাম-ধাম জানানো হবে এবং যে চাল নিতে আসবে, তাঁর নির্বিঘ্ন যাতায়াতের জন্যে জাপান সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাওয়া হবে।" শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন যে প্রথম মাল যদি এইভাবে খালাস করে নিতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে ভারতের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট জনগণের জন্যে আরো চাল খালাসের বন্দোবস্ত করা যেতে পারবে। শ্রীযুক্ত বসু আশা করেন যে অসংখ্য নর, নারী ও শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্যে তাঁর এই প্রস্তাবটি গৃহীত হবে।

—রেঙ্গুন বেতার, ২০শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

১৯৪৩ সালে, ২৪শে আগষ্ট তারিখে শোনানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে ভারতের খাদ্যসঙ্কট ব্যাপারে স্বাধীনতা-সঙ্ঘ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছে এবং ভারতবাসীদের অনশন-ক্লেশের লাঘবার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত আছে। ব্রিটিশ সরকার যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন, তাহলে একলক্ষ টন্ চাল ভারতবর্ষে পাঠাতে আমি প্রস্তুত আছি। অন্যান্য বন্দোবস্ত ও সব তৈরি। ভারতের উপকূলেই কোনো এক বন্দরে এই চাল মজুত রয়েছে, মাত্র খালাসের অপেক্ষায়। যদি ব্রিটিশরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় 'এ-আই-আর' অথবা অন্য কোনো মধ্যস্থের সাহায্যে তাহলে এই চাল এখনই জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হলেই আমি সেই বন্দরের নাম প্রকাশ করব আর আমি নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে ভারত-যাত্রী এই শস্যবাহী জাহাজগুলির ওপর কোনো জাপানী রণতরী অথবা বিমানবাহিনী হানা দেবে না অথবা কোনো রকম অনিষ্ট সাধন করবে না। এই চালান ভারতে পৌছুলে, আমাদের সঙ্ঘের তরফ থেকে প্রয়োজন হলে আরো চাল পাঠাবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।"

—আজাদ হিন্দ বেতার (জার্মাণী, তামিল ভাষায়)
২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৩।

*　　　　*　　　　*

কুয়ালালাম্পুরে ভারতীয়দের এক বিরাট সভায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে ভারতবাসীরা শীঘ্রই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ অচিরেই ভারত-অভিযান সুরু করবে। ঘন ঘন করতালি ও উল্লাসধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত বসু ঘোষণা করেন যে ভারতের জাতীয় বাহিনী শীঘ্রই ভারতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করবে। তিনি বলেন, :—

"স্বদেশের ভাইরা জানেন আমাদের উদ্দেশ্য কি। আমার মনে হয় যে ভারত আক্রমণ করলেই তাঁরা আমাদের সৈন্যদলকে অভ্যর্থনা ক'রে সহযোগিতায় নিশ্চয়ই অগ্রসর হবে। য়ুনিয়ন জ্যাকের পরিবর্ত্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বজাতীয় পতাকা অচিরেই ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে উড়তে থাকবে। ভারতের জাতীয় বাহিনী যাতে শীঘ্র আমাদের স্বদেশবাসীদের বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে সে বিষয়ে আমাদের উদ্যোগ পূর্ণতর করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে একটি জাতীয় বাহিনীর সংগঠন অপরিহার্য্য। জাপানের সাহায্যে খুব আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এ বাহিনী ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে। এখন ভারতবাসীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

গান্ধীজীর পঞ্চ সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত বসু মহাত্মাজীর দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য কামনা করে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেন, ডোমাই এজেন্সির প্রতিনিধির সাক্ষাতে। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার দৃঢ় সঙ্কল্পে জাতীয়বাহিনী যে মহাত্মাজীর সমর্থন লাভে সক্ষম হবে, এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস আছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অহিংসা আন্দোলন যে কার্য্যকারী অস্ত্র, সেটা ঠিক এবং মহাত্মাজীর আদর্শ ও চিন্তাধারা যাঁরা অনুধাবন করেছেন দীর্ঘকাল ধরে, তাঁরা কখনোই অস্বীকার করবেন না যে সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য মহৎ এবং ন্যায়-সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গান্ধিজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ, যখন জাতীয় নেতার সামনে এই অহিংসা নীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বসু যখন বলেন যে সত্যাগ্রহ অচল তখন মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। কিন্তু মহাত্মাজী হেসে উঠে বলেন যে যদি সশস্ত্র আন্দোলনে এবং শক্তি প্রয়োগে শ্রীযুক্ত বসু সত্যিই দেশে স্বাধীনতা

আনতে পারেন, তাহলে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে অভিনন্দন জানাবেন।

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন, হিন্দুস্থানী ভাষায়)

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

* * * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ পরিদর্শন করে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : "আমার বরাবর ধারণা যে সারা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু যুদ্ধ চালাতে হ'লে যে স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যের প্রয়োজন তার অভাব। এটা গৌরব এবং উৎসাহের কথা যে আজ আপনারা সেই জাতীয় বাহিনীর একটি দল গঠন করেছেন।"

—রোম বেতার (হিন্দুস্থানী ভাষায়) ৯ই জুলাই, ১৯৪৩।

পেনাঙ শহরের ভারতীয়গণের এক বিরাট সভায় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে মালয়ে জাতীয় বাহিনীর সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেছেন। তিনি বলেন : "যে বাড়ীগুলোতে এখন সামরিক শিক্ষার আয়োজন হয়েছে, সেগুলো পূর্ব্বে ব্রিটিশদের সেনাবাস ছিল। আমার নিশ্চিত ধারণা যে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যারাকগুলোও অদূর ভবিষ্যতে ওই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। ভারতে সহস্র সহস্র কর্ম্মী এখন কারাবাসের কষ্ট ভোগ করছেন। কিন্তু আমরা ভারতে প্রবেশ করলে তাঁদের বন্দিদশা শেষ হবে আর ব্রিটিশদেরই তখন ঐ সব কারাগারে অবরুদ্ধ করা হবে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী কর্তৃক দেশ অধিকৃত হ'লে মধ্যবর্ত্তী শাসন কাজ চালানোর জন্য এক অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার।"

য়্যুরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন যে সিসিলিতে বিজয়-ব্যাপার নিয়ে মিত্রপক্ষ বেশি বাড়াবাড়ি করলেও, তাতে ভারতের

কিছু লাভ হয়নি। কারণ য়্যুরোপের যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আগামী মুক্তি-সংগ্রামে জাপান যে ভারতবর্ষকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্যদানে অগ্রসর হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু জাপান সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকলেও ভারতবাসীদের স্বচেষ্টায় আপনার স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে। তাই তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এই নিবেদন করছেন যেন দেশের মুক্তিলাভের জন্যে আত্মত্যাগে কুণ্ঠা না আসে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় নানা জায়গায় ভারতীয় সৈন্যদের জন্য যে সব শিক্ষাকেন্দ্র আছে সেগুলো সম্প্রতি পরিদর্শন করে তিনি বুঝেছেন যে হাজার হাজার তরুণ ও যুবকের দল অত্যাচারী ব্রিটিশদের কবল থেকে দেশোদ্ধারের জন্য উৎসুক ও অধীর আগ্রহে তারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। দিল্লী অভিমুখে অভিযান করবার দিন প্রত্যাসন্ন। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে দেশোদ্ধারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—যাতে ইংরেজদের এবং তাদের মিত্রশক্তি আমেরিকানদের প্রভুত্ব এবং শোষণকার্য্য থেকে নির্য্যাতিত ভারত মুক্তি পায়। ইঙ্গ-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ চালনার কাজে জাপান অবশ্যই আমাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য দেবে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে স্বদেশের মুক্তি সাধনের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব তো আমাদেরই। যতদিন পর্য্যন্ত শেষ ইংরেজ না মরে অথবা ভারত থেকে বিতাড়িত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর একাগ্র কর্ম্ম সাধনার বিরতি নেই।”

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

* * * *

১৯৪৩ সালে, ২রা অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চসপ্ততিম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নেতাজী এক বক্তৃতা দেন—

“ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর দান এমনি অপূর্ব্ব

ও অতুলনীয় যে ভবিষ্যতের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিগত মহাযুদ্ধের শেষে যখন ভারতের নেতৃবর্গ প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা দাবি করেন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে তাঁরা বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তাঁদের দাবির প্রত্যুত্তরে এল ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন যাতে ভারতবাসীদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তাও কেড়ে নেওয়া হ'ল। তারপর, এই জঘন্য আইনের প্রতিবাদ জানানোর ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যা-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ল। ১৯১৯ সালের এই সব শোচনীয় ঘটনার পরে ভারতবাসীরা সাময়িক ভাবে স্তম্ভিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত উদ্যম দাবিয়ে রাখল ইংরেজ সরকার অতি নিষ্ঠুর ভাবে। আইন সঙ্গত নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টা, বিলিতি পণ্য বর্জ্জন, সশস্ত্র বিদ্রোহ—সবই বিফল হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার অন্ধকারে একটিও আলোর রশ্মি দেখা যায়নি এবং দেশের লোক এই রাজ নৈতিক দ্বন্দ্বের নিরসন চেষ্টায় নতুন পথ, নতুন উপায় খুঁজতে গিয়ে শুধু অন্ধকারেই পথ হাতড়াতে লাগ্‌ল। ঠিক এই সঙ্কটে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন অথবা অসহযোগের বাণী শোনালেন। মনে হ'ল যেন দৈবপ্রেরিত অগ্রদূত স্বাধীনতার পথনির্দ্দেশ দেবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাবশে সমস্ত দেশ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। ভারত যেন গান্ধীজীর মধ্যে নতুন যুগপ্রবর্ত্তকের সন্ধান পেল। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে এল নতুন আশার উদ্দীপনা, নতুন ভরসার উজ্জ্বল আলো। মনে হ'ল বুঝি আর দেরী নেই, যে মুক্তি অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হয়েছিল তা দুর্ণিবার পরিণতির মুখে এগিয়ে আসছে।"

"বিশ বছর, কি তারও বেশি দিন হবে, মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তি সাধনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে আরও বহুলোক অকুণ্ঠ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ১৯২০ সালে, যদি তিনি তাঁর উদ্ভাবিত নূতন পন্থা দেখিয়ে এগিয়ে না আসতেন, তাহ'লে

ভারত আজও যে অধঃপতিত অবস্থায় পড়ে থাকত সে কথা অতিশয়োক্তি নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান মহামূল্য, অতুলনীয়। অনুরূপ অবস্থায় আর কোনো ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় এতোখানি কর্ম্ম কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। মহাত্মা গান্ধীর একমাত্র ঐতিহাসিক তুলনাস্থল মুস্তাফা কালাম, যিনি গত মহাযুদ্ধে শোচনীয়‚পরাজয়ের পর তুরস্ক দেশকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন এবং কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে, 'গাজী' আখ্যা লাভ করেছিলেন।"

"১৯২০ সাল থেকে, মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমাদের দেশ দু'টি জিনিষ শিক্ষা পেয়েছে, যা স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রথমটি হ'ল—জাতীয় আত্মসম্মান এবং আত্মপ্রত্যয়, যার ফলে এখন সারা ভারতে বিদ্রোহাগ্নি অনির্ব্বাণ জলছে। আর দ্বিতীয়টি হ'ল—দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার যার কর্ম্ম-প্রভাব ভারতের নিভৃততম পল্লীতে গিয়ে পৌঁছেচে। মহাত্মাজীর কৃপাতেই স্বাধীনতার ঋজু পথে বলিষ্ঠ পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। বর্ত্তমানে মহাত্মাজী যে কর্ম্মযজ্ঞের উদ্বোধন করলেন, তারি উদযাপনের ভার এখন তাঁর স্বদেশবাসীর ওপর।"

"আপনাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাতে চাই যে ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে যখন মহাত্মাজী প্রকাশ্যে তাঁর অসহযোগ কর্ম্মসূচীর প্রস্তাব দাখিল করেন, তখন তিনি বলেন, 'ভারতের হাতে যদি আজ অস্ত্র থাকৃত, তাহলে সে অস্ত্র উন্মোচন করতে দেশ পশ্চাৎপদ হ'ত না।' এর পর মহাত্মাজী আরো বলেন যে সমগ্র বিদ্রোহ যখন অসম্ভব, তখন দেশের সামনে আরেকটি পথ মাত্র খোলা আছে, সেটি অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ। এর পর অনেকদিন আমাদের কেটে গেছে এবং ভারতবাসীর কাছে অস্ত্র ধারণ এখন আর তেমন অসম্ভব নয়। আজ ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং দিন দিন তার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে; তাতে আমরা সকলেই সুখী ও গৌরবান্বিত।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৩।

১৯৪৩, ২১শে অক্টোবর তারিখে নেতাজী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

"গত বাইশ বছর ধরে আমার রাজনৈতিক জীবনে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহের সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে আমি বুঝেছি স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের দু'টি বড় উপাদানের অভাব রয়েছে,—প্রথমটি জাতীয় বাহিনী, আর দ্বিতীয়টি সেনাদল পরিচালনার উপযুক্ত শক্তিশালী একটি জাতীয় সরকার। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইম্পিরিয়াল জাপানী বাহিনী যে আশ্চর্য্য কৃতিত্বের সহিত জয়লাভ করতে পেরেছে, এতে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতবাসীদের পক্ষে একটি জাতীয় বাহিনী গঠন এবং স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান সম্ভব হয়েছে। জাতীয় বাহিনীর প্রতিষ্ঠানেই এ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবে পরিণত হতে পেরেছে। যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত না হত, তা হলে পূর্ব্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা সঙ্ঘটি কেবল প্রচার-কার্য্যের বাহনই থেকে যেত। কিন্তু জাতীয় সেনাদল তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র স্থাপনা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ পর্য্যায়টি ভালোভাবে চালাবার এবং নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য স্বাধীনতা সঙ্ঘ থেকেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র পরিকল্পিত হ'ল।"

"এই অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত করে আমরা একদিকে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মনে রেখেছি আর অপরদিকে ইতিহাসেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছি। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯১৬ সালে আইরিশরা একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করে। গত মহাযুদ্ধে চেক্ জাতিও এ কাজ করেছিল আর যুদ্ধের অবসানে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে আনাটোলিয়াতে তুর্কী জাতির অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের বেলায়, আজাদ হিন্দ সরকার শান্তিকালীন স্বাভাবিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান নয়। এর কর্ম্মসূচী আর

সদস্য-সমিতি গঠন সম্পূর্ণ নতুন ধরণেরই। এটা হবে একটি যুধ্যমান প্রতিষ্ঠান যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ এবং ভারতে তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও যুদ্ধচালনা। অতএব, রাষ্ট্রের সেই বিভাগগুলিই নিয়ে সরকার কাজ চালাবে যেগুলো স্বাধীনতা-যুদ্ধের যথাযথ পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয়।"

"আমাদের ক্যাবিনেটে কয়েকজন ব্যক্তি বেসামরিক বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন, আরও থাকবেন এমন কয়েকজন যাঁরা স্বাধীন সরকারের সামরিক বাহিনীগুলির প্রতিনিধি। আজাদ হিন্দ সরকারের লক্ষ্যই যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চালনা, তখন সেনাবাহিনীদেরই বেশি প্রতিনিধি নিতে হয়েছে আমাদের ক্যাবিনেটে। ক্যাবিনেটের মন্ত্রিগণ ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, উপদেষ্টারূপে। এইভাবে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে' জাতীয় অস্থায়ী সরকার আগামী যুদ্ধের জন্যে সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে। তারপর ভারতে স্থানান্তরিত হ'লে এই প্রতিষ্ঠান স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধারণ রাষ্ট্রশাসনের কার্য্য চালাতে থাকবে। তখন অন্যান্য অনেক নতুন বিভাগ খোলা হবে।"

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ সফলতার পথে চলেছে। এখন বাকী শুধু শেষ পর্য্যায়ের যুদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে জাতীয় বাহিনী ভারতের সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে দিল্লীর দিকে অভিযান চালাবে, তখন শেষ যুদ্ধ সুরু হবে। ইঙ্গ-আমেরিকান দলকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে ভারতের জাতীয় পতাকা নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদচূড়ায় যে দিন ওঠানো হবে, সেইদিন ঐ অভিযানের সার্থক পরিণতি।"

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র উদ্বোধন উপলক্ষে নবনির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি নেতাজী বসু এই মর্ম্মে বক্তৃতা দেন :—

"গত কয়েক মাস ধরে ভারতবর্ষের মধ্যে যে রকম পরিবর্ত্তন হচ্ছে,

তাতে আমাদের পক্ষে সুবিধা, যদিও এতে আমাদের স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশা বেড়েই চলেছে।"

"ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বাঙলায়, যে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখা দিয়েছে তাতে দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভ খুব বেড়ে গিয়েছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ইংরেজ সরকারেরই তৈরি এবং গত চার বছর ধরে যুদ্ধ কার্য্যের জন্য ভারতের খাদ্য ও অন্যান্য রসদ ব্রিটিশরা আত্মসাৎ করে নির্ম্মম ভাবে আপনার স্বার্থ-সুবিধায় ব্যবহার করেছে। এরি ফলে শুনে থাকবেন যে, স্বাধীন ভারতীয় সঙ্ঘের তরফ থেকে আমি বিনাসর্ত্তে অনশনক্লিষ্ট স্বদেশবাসীদের জন্যে প্রথম দফায় একলক্ষ টন চাল দেবার প্রস্তাব করেছিলুম। ভারতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আমার এ প্রস্তাব শুধু নাকচ করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রতিদানে আমাদের কুৎসা রটিয়েছে।"

"আপনারা হয়তো জানেন যে জুলাই মাস থেকে আমি একাধিক বার সমস্ত মালয় উপদ্বীপ, থাইল্যাণ্ড, বর্ম্মা এবং ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলিতে ঘুরে বেরিয়েছি। সর্ব্বত্রই আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে যে উৎসাহ লক্ষ্য করেছি সেটা শুধু আশাপ্রদ নয়, আমাকে অনেকখানি ভরসা জুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই যে আমরা আগামী যুদ্ধের জন্যই শুধু প্রস্তুত হচ্ছি না, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও আমাদের চিন্তার বিষয়। যখন ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্রশক্তিরা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হবে, তখন দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা কতখানি শোচনীয় দেখবো, সেটা আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাসছে। তাই আমাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রে সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যে একটি নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলো যথারীতি আলোচিত হচ্ছে। একদিকে যেমন সামরিক আয়োজনের উন্নতি চলেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত গঠন ও সংস্কার কার্য্যে আমাদের লোকদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধাবসানে দেশের যে প্রধান অভাব লক্ষিত হবে সে অভাব

মোচনের আগামী ব্যবস্থা উদ্ভাবনে আমাদের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না হবে না।"

"যদি ভারতের মধ্যেই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে তারি সাহায্যে যুদ্ধ-আন্দোলন আমরা চালাতে পারতুম, তা হলে সব দিক থেকেই সেটা চমৎকার হ'ত! কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা আপনাদের অবিদিত নয়। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এখন কারাবরোধে আছেন, অতএব ভারতের মধ্যে এই রাষ্ট্র স্থাপনের আশা নিতান্তই অসম্ভব কল্পনা। আবার যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়টি ভারতেই অনুষ্ঠিত হোক অথবা ভারত থেকেই পরিচালিত হোক্, এ আশাও ব্যর্থ। কাজেই পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়-দেরই এখন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্বহস্তে চালাতে হবে।"

"এটা নিশ্চিত যে আমরা জাতীয় বাহিনী নিয়ে ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করে পবিত্র দেশভূমির অঙ্কে যেদিন স্বাধীন পতাকা প্রোথিত করবো, সেদিন দেশের মধ্যে প্রকৃত বিদ্রোহ সুরু হবে। আর সেই বিদ্রোহের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ অনিবার্য্য।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

* * * *

"ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্যের উদয়ক্ষণে একটি জাতীয় রাষ্ট্র ও অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জাতীয় সরকারের নির্দ্দেশ মত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। নিরস্ত্রীকরণ আর দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারাবাসের ফলে স্বদেশে এখন সশস্ত্র আন্দোলন চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই কাজ কিন্তু করবে ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র আর ভারতের ভিতরে ও বাইরে সকল লোকই এ কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন, আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধান্তে জনগণ-মতানুযায়ী, নির্ব্বাচিত একটি স্থায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে যতদিন না ইংরেজরা বিতাড়িত হয় এবং নতুন সরকার

প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন এই অস্থায়ী সরকারই শাসন ও অন্যান্য কাজ চালাবে।"

—'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' বেতার (সিঙ্গাপুর, হিন্দুস্থানী ভাষায়)
২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

১৯৪৩, ২২শে অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরে 'ঝান্সির রাণী'-বাহিনীর একটি শিক্ষা-শিবির কেন্দ্র উদ্বোধন কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই বক্তৃতা দেন :—

"ভগ্নীগণ! আজ আপনাদের বাহিনীর যে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ'ল সেটি আমাদের আন্দোলনের ক্রমোন্নতির ফল। আজ স্বদেশের নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে আমরা নিযুক্ত। অতএব, আমাদের নারীদের প্রাণেও যে এই নব জীবনের স্পন্দন সাড়া দেবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের অতীত শূন্যগর্ভ নয়। ভারতবর্ষে ঝান্সির রাণীর মত বীর-মহিলার আবির্ভাব সম্ভব. হয়েছিল। তার কারণ, ভারতের ঐতিহ্য গৌরবময় ছিল। সেই রকম ভারতের প্রাচীন যুগে মৈত্রেয়ীর মত নারীর জন্ম হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশদের প্রবেশের পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক যুগেও মহারাষ্ট্র প্রদেশে অহল্যাবাঈ ও বাঙলায় রাণী ভবানী আর রাজিয়া বেগম ও নুরজাহানের মত বীর রমণীর রাষ্ট্র-প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল ছিল না। ভারতভূমির উর্ব্বর শক্তিতে আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি, অতীত যুগের মতই ভারতে আবার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ কুসুম বিকশিত হবে।"

"এইখানে ঝান্সির রাণী সম্পর্কে দু একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রসঙ্গিক হবে না। যখন ঝান্সীর রাণী প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে ঘোড়ায় চড়ে সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার চালানো একটি কুড়ি

বছরের মেয়ের পক্ষে কি রকম শক্তি ও সাহসের পরিচয়। যে ইংরেজ সেনাপতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন তিনি নিজের মুখেই ব্যক্ত করেন, 'বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে দুঃসাহসিক'। প্রথমে রাণী তাঁর ঝান্সির কেল্লা থেকে যুদ্ধ চালান। পরে দুর্গ অবরুদ্ধ হ'লে তিনি একটি দল নিয়ে কাল্‌পিতে পালিয়ে যেন এবং সেখানে যুদ্ধের আস্তানা ফেলেন। এই রণক্ষেত্র থেকেও যখন তাঁকে পিছু হঠ্‌তে হয়, তখন তিনি তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করেন এবং সেটি অধিকার করেন। সেই কেল্লাকেই কেন্দ্র করে তিনি যুদ্ধ চালান অক্লান্ত উদ্যমে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই অসম সাহসের সহিত লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

"দুর্ভাগ্যবশে, ঝান্সির রাণীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সে পরাজয় রাণীর নয়, ভারতেরই। তিনি গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর অদম্য প্রাণ-শক্তির নির্ব্বাণ আজও হয় নি। প্রয়োজন হলে ভারতে ঝান্সির রাণীর মত মহিলাদের পুনরাবির্ভাব হতে পারে এবং তখন জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

*　　*　　*　　*

"এটা দৈব-প্রেরিত সুযোগ বলতে হবে যে পূর্ব্ব-এশিয়ার রণাঙ্গনে সমরাগ্নি জ্বলে উঠেছে যাতে আমাদেরই দেশভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালনার পরম অবকাশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে। ঈশ্বরেরই কৃপায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে দ্রুত অপসরণের সময় পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে অনেক ভারতীয় সৈন্যদল ফেলে যেতে হয়েছে। যদি তা' না হ'ত তাহলে আমাদের চেষ্টা সফল হতে পারত না। আমি বহুদিন ধরেই ভেবে এসেছি যে আমাদের দেশের বৃহত্তম অভাব হচ্ছে নিজেদের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন। এখন আমাদেব জাতীয় সেনাদলের সৃষ্টিতে সেই অভাব মোচন হ'ল।"

—ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ বেতার (সিঙ্গাপুর), ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*　　　*

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে এক বক্তৃতা দিয়েছেন :—

"১৮৫৭ সালের পর থেকে, এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠিত হয়েছে প্রবাসী ভারতীয়গণেরই প্রচেষ্টায়। এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী জাতিরা স্বীকার করে নিয়েছেন। পৃথিবীর নানা স্থানে যে সব ভারতবাসী ছড়িয়ে আছেন তাঁরা সবাই এই স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র-পতাকার নীচে এসে একত্র দাঁড়িয়েছেন এবং স্বদেশের ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাঁদের সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধচালনার উদ্দেশ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়েছেন। আমাদের দেশের সহস্র নরনারীকে অনশনে পীড়িত করে ব্রিটিশরা যে আমাদের মধ্যে জাতীয় নব চেতনার বীজ বপন করে দিয়েছে, তাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিজয় কামনার অদম্য প্রেরণায় আমাদের সাহস ও সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছে, সেজন্য আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ। দেশের মুক্তির জন্য পাঁচ ছয়টি লক্ষ্য আমরা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছি। প্রথম—যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ; দ্বিতীয়—ব্রিটিশদের শত্রুর প্রতি সহানুভূতি ; তৃতীয়, স্বদেশে আমাদের লোকদের সঙ্গে বাইরের ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ; চতুর্থ, বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সঙ্গে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমসাময়িক যোগস্থাপন, এবং পঞ্চম—স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান। শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই, মিত্রপক্ষ ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমরা শেষ প্রহরণ ছাড়তে পারব।"

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন : "বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই, ভারত তার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কেবল দু'টি উপকরণের অভাব ছিল : প্রথম হ'ল—একটি জাতীয় সেনাদল আর দ্বিতীয় হ'ল—বৈদেশিক সাহায্য। আজ এদু'টি জিনিষই আমরা পেয়েছি। এতদিন ধরে আমি বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবাসীর হাতে যে চরম সুযোগ এসেছে সেই কথাটিই বার বার জোর দিয়ে বলেছি আর সকল শ্রেণীর

স্বদেশবাসীদের কাছে নিবেদন জানিয়েছি যেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা অযথা বিলম্ব না করেন। আমি আবার তাঁদের বলি এই দৈবপ্রেরিত সুবিধা তাঁরা যেন হেলায় না হারান।"

—টোকিও বেতার, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

* * * *

নান্‌কিং-এ একটি বিপুল অভ্যর্থনা সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন :—

"ব্রিটেন ও আমেরিকাকে পরাস্ত করবার জন্য 'বৃহত্তর প্রাচ্য এশিয়া'র সুখ-স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে চীন ও ভারতের প্রচেষ্টা একত্র মিলিত হোক।" শ্রীযুক্ত বসু মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ ও চীনের অন্যান্য নেতাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেন যে তাঁরা ইঙ্গ-আমেরিকান মৈত্রী বর্জ্জন করে সমগ্র চীনের ঐক্য সাধনে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে এবং বৃহত্তর প্রাচ্য এশিয়ার অখণ্ড মিলনে যত্নবান হন। ইঙ্গ-আমেরিকান দলের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ এবং চুংকিং নেতৃবর্গের নিকটে তাঁর অনুরোধ এই যেন তাঁরা ইঙ্গ-আমেরিকানদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করে এশিয়া ভূখণ্ডের নিষ্কণ্টক স্বাধীনতার উদ্দেশে অন্যান্য প্রাচ্য জাতিদের সহযোগিতা করেন। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ ও তাঁর পত্নী সম্প্রতি ভারত-সফরে গিয়ে ভারতবাসীদের কাছে অনুরোধ করেছেন যেন তারা বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরেজদেরই সাহায্য করে। যদি চিয়াং-কাই-শেক সত্যিই চীনের স্বাধীনতা আন্তরিক ভাবে কামনা করতেন এবং জগতে মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপনে বিশ্বাসী হতেন, তা হ'লে বিদেশী মনিবদের সাহায্য দানে ভারতবাসীকে কখনোই অনুরোধ জানাতে পারতেন না।

এই সূত্রে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্‌কে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে

চান যে ১৯৩৯ সালে যখন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তখন আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে তিনি চীন দেশে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠান এবং চিয়াং-কাই-শেককে অনুরোধ করেন যে যদি ন্যায় ও সত্যে তাঁর আস্থা থাকে, তাহ'লে ব্রিটিশ-বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন তিনি সাহায্যদানে কুণ্ঠিত না হন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে ১৯৩৯ সালে চীনে যাবার তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাতে অনুমতি দেননি। এখন অবশ্য ব্রিটিশ ছাড়পত্রের আর তাঁর প্রয়োজন নেই—

—ব্যাটেভিয়া বেতার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

* * *

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন :—

"আপনাদের কাছে আমার নূতন বাণী এই। টোকিওতে এসে পৌঁছানোর পর, আমি ও 'আজাদ হিন্দ' অস্থায়ী সরকারের সহকর্ম্মীরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম ৫ই ও ৬ই নভেম্বর তারিখে এবং দর্শক হিসেবে বৃহত্তর প্রাচ্য-এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের সভায় যোগদান করেছিলাম। এই সভায় স্বাধীন ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপান সরকারের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সব জাতীয় প্রতিনিধিগণ একমত হয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত যে যৌথ প্রস্তাব পাশ করেন, তা' হয়তো আপনাদের অবিদিত নেই। এই যৌথ প্রস্তাবের মর্ম্ম হ'ল এই যে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন স্থান অধিকার করে সহকর্ম্মিতায় ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ভার গ্রহণ করবে। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধির অন্বেষণে অন্যান্য দেশের ওপর নির্য্যাতন ও শোষণনীতি প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে প্রাচ্য-এশিয়া, তাদের উচ্চাশী সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি যেখানে

অদম্য লোলুপতায় তার চতুর্দ্দিকে হাত বাড়িয়েছে! সবচেয়ে বড়কথা, প্রাচ্য-এশিয়ার শান্তি শৃঙ্খলা তারা নষ্ট করতে বসেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ এইখানেই। জাপান যে বর্ত্তমান যুদ্ধে নেমেছে তার প্রধান কারণ, সে চায় প্রাচ্য-এশিয়ার নির্য্যাতিত জাতিগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুর জোয়াল থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে। এ যুদ্ধে প্রাচ্য-এশিয়ার সমগ্র জাতিগণ কায়মনোবাক্যে জাপানকে যে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছে তার কারণ জাপানের জয়লাভের ওপর নির্ভর করছে এশিয়ার আশা ও ভরসা। আপনাদের অস্তিত্ব-রক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে :—

(১) বৃহত্তর প্রাচ্য-এশিয়ার দেশগুলি পরস্পর সহযোগিতায় তাদের নিজের নিজের অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করবে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি-কামনায় একটি নূতন নীতির পরিকল্পনা করবে।

(২) বৃহত্তর প্রাচ্য এশিয়ার দেশগুলি পরস্পরের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সহকর্ম্মিতায় ও বন্ধুত্বে নিজেদের অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত করবে।

(৩) বৃহত্তর প্রাচ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে ঐ দেশগুলি পরস্পরের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আপন আপন অঞ্চলে সৃষ্টি-মূলক কৃষ্টির কাজ করে যাবে।

(৪) বৃহত্তর প্রাচ্য-এশিয়ার দেশগুলি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরস্পরের প্রয়োজন স্বীকার করে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টায় অবহিত হবে, যাতে সমগ্র অঞ্চলের যৌথ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

(৫) বৃহত্তর প্রাচ্য-এশিয়ার দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্ব-শান্তির হিতার্থে সচেষ্ট হবে যাতে জাতীয় পার্থক্য ও বিভেদ-নীতি দূরীভূত হয়, সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলতে

থাকে এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানব-জাতির কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়।

আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথম দৃষ্টান্ত যখন প্রাচ্য-এশিয়ার বন্ধনমুক্ত জাতিগুলি এক নূতন আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে পরস্পরের এত কাছে এসেছে। এর পূর্ব্বেও অবশ্য এ ধরণের চেষ্টা হয়েছে, আপনারা হয়তো জানেন কিন্তু সে সব চেষ্টা কৃতকার্য্য হয়নি। সে ব্যর্থতার কারণ, বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপরতা ও লোভান্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য কামনা। পৃথিবীর সামনে একটা বড় আদর্শ খাড়া করবার চেষ্টায় শেষ পরীক্ষা হ'ল লীগ্ অফ্ নেশ্যন্স্। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যেভাবে আপনার স্বার্থবুদ্ধিতে প্রণোদিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের কাজে লাগিয়েছিল, তাতে লীগ্ অফ্ নেশ্যন্স্ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক চালিত একটি পুতুলে পরিণত হয় এবং ফলে আন্তর্জ্জাতিক শোষণ-ক্রিয়ার অস্ত্রস্বরূপ বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে, প্রাচ্য এশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনার অথবা বৃহত্তর পূর্ব্ব ভূখণ্ডের সহোন্নতি-চক্রের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জনগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা, ন্যায়ধর্ম্ম এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরে। এর চেয়ে আরো ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান আমি কল্পনা করতে পারি না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যেখানে বাকি পৃথিবীর দেশেরা বিফল হয়েছে, প্রাচ্যজগৎ সেখানে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করবে। ইতিহাসে এ ব্যাপার বহুবার ঘটেছে এবং দেখা গেছে যে পূর্ব্ব দিক্ থেকেই আলো আসে। আজ এই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে, সেই আলো আবার প্রাচ্য ভূখণ্ডেই দেখা দিল! তাই ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত অনুসারে নূতন জগৎ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পূর্ব্বদিকেই সুরু হয়েছে, তার ভিত্তি স্থাপন হয়েছে পূর্ব্ব-এশিয়ায়, এবং সে ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হয়েছে পূর্ব্বদিকে, উদীয়মান সূর্য্যের দেশে। এই হিসাবে, বৃহত্তর

পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতি-সম্মেলন একটি নূতন ও মহৎ পরীক্ষা। এর সফলতার ওপরে শুধু পূর্ব্ব-এশিয়ারই ভবিষ্যৎ নয়, সমগ্র এশিয়ার, তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ নির্ভর করছে।

—টোকিও বেতার, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

* * *

সম্প্রতি এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন যে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতি-সম্মিলন প্রাচ্য জগতে এক নূতন রাষ্ট্র পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেছে। তার চেয়ে বড় কথা, সম্মিলিত জাতিরা এই পরিকল্পনাটিকে নষ্ট হতে দেবে না বলে দৃঢ়-সঙ্কল্প। সকলের মধ্যেই একটা স্থির প্রতিজ্ঞা, আদর্শনিষ্ঠা লক্ষ্য করবার বস্তু। শ্রীযুক্ত বসু এই প্রসঙ্গে আরো বলেন :—

"তথাকথিত উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক জাতিরা প্রায়ই বলে এসেছে যে নতুন পরিকল্পনা তখনই সম্ভব, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে শান্তি আসবে। এধারে পূর্ব্ব-এশিয়ায় জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের একটা খণ্ড চলেছে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি থাকলেই কাজ করা যায়। মনে যদি থাকে আন্তরিক বল এবং সততা, তা হলে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাও অতিক্রমসাধ্য। আমাদের মনে হয়,—সম্মুখে এমন কোনো প্রচণ্ড বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে না যা প্রাচ্য জগতের নূতন পরিকল্পনার অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এই সম্মিলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যে প্রস্তাবটি পেশ করেছেন স্বাধীন ব্রহ্ম সরকারের অধিনায়ক ডাক্তার বা ম' তার মূল কথা এই যে আসন্ন মুক্তিসংগ্রামে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী সাহায্য ভারতবর্ষ পাবেই। এই প্রস্তাবটি সকল জাতির প্রতিনিধিগণ যখন উৎসাহ-সহকারে গ্রহণ করলেন, জবাবে আমি এইটুকু বললাম যে প্রাচ্য-এশিয়ার এই নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনাটি সত্য ও বাস্তব পদার্থ, জেনেভায় লীগ অফ নেশন্‌স্‌-এর মত দস্যুদলের সম্মিলন নয়।"

"জাপানের বর্ত্তমান রাজনীতি সবারই কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করে, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জকে মুক্তি দান করে, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং চীনের জাতীয় সরকারের সঙ্গে একটা আপোষ করে জাপান তার রাজনৈতিক 'শুভবুদ্ধি ও সততার পরিচয় দিয়েছে। জাপান যে নির্য্যাতিত এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি কামনা করে, তার প্রমাণ সে ভালোভাবেই দিয়েছে অপরকে সাহায্য দানের আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়ে এবং ন্যায় ধর্ম্ম, সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন প্রাচ্য-এশিয়ার নূতন রাষ্ট্র-পরিকল্পনার সৃষ্টি করে।"

"ভারতবর্ষ অবশ্য এই প্রাচ্য জাতির সম্মিলনে সরকারীভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেনি এবং আমি দর্শক হিসেবেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ভারতের সমস্যা সম্মিলনীর কার্য্য-সূচীর তালিকাভুক্ত ছিল না বটে কিন্তু ভারতের সমস্যাটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বলেই পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়। সম্মিলনীতে সকলেই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত বোধ করেছিলেন, যখন জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল টোজো প্রকাশ্য সভায় উঠে প্রস্তাব করেন, জাপান সরকার মনস্থ করেছেন যে ব্রিটিশরা বিতাড়িত হবার পর থেকে জাপানীদের অধীনে গচ্ছিত রাখা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটিকে 'আজাদ হিন্দ' স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হবে। এখন আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীদের এবং এশিয়ার সমস্ত নির্য্যাতিত মানুষদের উচিত আমাদের স্বপ্নকে কার্য্যে পরিণত করবার পথে এগিয়ে যাওয়া। আগামী প্রচণ্ড সংগ্রামে আমাদের কাজ ভালোভাবে করবার জন্য আমরা কোমর বেঁধেছি; আমাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধে জয়লাভ আমরা করবই।"

শ্রীযুক্ত বসু আরো বলেন যে প্রাচ্য-এশিয়ায় ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। এঁরা সবাই ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পিছনে একতাবদ্ধ ও দৃঢ় ব্যূহ রচনা করেছেন এবং এঁদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ভারতীয়

স্বাধীনতা সঙ্ঘ যুদ্ধোপকরণের সমস্ত আয়োজন সুনিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের আহ্বান জানিয়েছে যেন বহু-সংখ্যক সৈন্য এই যুদ্ধে যোগদান করতে এগিয়ে আসে। এ আহ্বানে বহু লোক সাড়া দিয়েছে, তাই স্বাধীনতা সঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হয়েছে একটি বাহিনী গঠন করা। এই বাহিনী হ'ল আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা ভারতের জাতীয় সেনাদল যাদের মুখের বুলি 'দিল্লী চলো' আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে।

"গত ২১শে অক্টোবর তারিখ থেকে, আমরা নিজেদের রাষ্ট্র স্থাপনা করেছি। এই অস্থায়ী সরকার সমস্ত ভারতবাসীরই বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে। তা ছাড়া, জার্মাণী, ইটালি, ক্রোয়েশিয়া, ব্রহ্ম, ফিলিপাইন, মাঞ্চুকুয়ো, জাতীয় চীন প্রভৃতি নানা মিত্র-শক্তি আমাদের আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। আশা করি শীঘ্রই অন্যান্য শক্তিবর্গও আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেবে। আমাদের জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে আমরা যে অচিরেই স্বাধীনতা লাভের শেষ যুদ্ধে নামব, এ কথা ভাবতে আমরা আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। সেই ১৮৫৭ সালের পর এই সর্ব্বপ্রথম আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে যাকে এতগুলি শক্তিশালী বিদেশের মিত্রপক্ষ মেনে নিয়েছে। এই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত যখন এশিয়ায় ও য়্যুরোপে প্রবাসী ভারতীয় স্বদেশবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত চেষ্টায় দেশের স্বাধীনতার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ১৮৫৭ সালের পর এই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল যে বিদেশী শোষক-শাসকদের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে। অতএব মুক্তিসংগ্রামের শেষ অঙ্কের জন্যে রঙ্গমঞ্চ তৈরীই আছে।"

এর পর নেতাজী বলেন :

"স্বদেশবাসিগণ! এ সুযোগ হারাবেন না, অযথা সময় নষ্ট করবেন না। কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠুন, শেষ সংগ্রাম আপনাদের জিততে হবে। তবেই পবিত্র ভারতভূমির অঙ্গনে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা বিজয় গৌরবে উড়তে থাকবে। যখন আমরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাবো,

তখনই আমাদের যুদ্ধের শেষ অধ্যায়। যতক্ষণ সর্ব্বশেষ ইংরেজ ভারত থেকে বিতাড়িত না হয়, ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেই। পুরানো দিল্লীর লাল কেল্লায় যখন আমাদের সামরিক বিজয়-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, বড়লাটের প্রাসাদে আমাদের পতাকা উড়বে, তখনই ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম বিজয় মণ্ডিত হবে, আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে।"

—টোকিও বেতার, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

চীনগণের প্রতি নেতাজী এক বেতার বক্তৃতায় নিম্নোক্ত বাণী দেন :

"আপনাদের নেতার অধিনায়কতায় চীনকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে আপনারা পরিণত করতে পারেন। চীনের যদি সেই ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে জাপান তৎক্ষণাৎ মহাদেশ থেকে সৈন্যদল অপসারণ করে নেবে। তাহ'লে চীন ও জাপান পরস্পরের মৈত্রী ও সদ্ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র আপনাদের দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনবে। আজ প্রাচ্য-এশিয়ার সামনে এমন একটি নতুন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে যা পূর্ব্বে কল্পনাগোচর হয় নি। শ্বেতমানুষদের দ্বারা একশ' বছরেরও ওপর নির্য্যাতিত ফিলিপাইন ও ব্রহ্মদেশে জাপানের সাহায্যে যে স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, তা থেকে প্রমাণ হয় সমস্ত প্রাচ্যজাতিদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনই জাপানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন প্রত্যেক ভারতীয়ের উচিত নিজেদের দেশের স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান করা, তেমনি চীনেদেরও তাদের স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। আমি দেখতে চাই যে প্রাচ্য-এশিয়ায় নূতন জাতি-সম্মিলনের গগনাঙ্গনে চীনদেশ উজ্জ্বল তারকার মত শোভা পাক। আজ জাপানেরই চেষ্টায় চীনের কতক অংশ বিদেশীর শোষণ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। জাতীয় সমস্যার সমাধানের চাবি আছে চিয়াং-কাই-শেক্ এবং চুংকিং সরকারের হাতে যদিও এদের একটা অহেতুক ধারণা হয়েছে যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকান দলের জয়লাভ অনিবার্য্য। এ যুদ্ধ কতদিন

স্থায়ী হবে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধ যতদিনই চলুক আমাদের অন্তিম জয়লাভে আমার দৃঢ় আস্থা আছে। এখন আমি আমার দক্ষিণ সামরিক ঘাঁটিতে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমরা শীঘ্রই ব্রহ্ম সীমান্তে অগ্রসর হ'ব আমাদের শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালাবার জন্যে। এ যুদ্ধে, ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যদল ছাড়া, চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধেও হয়তো আমাদের লড়াই করতে হবে। এতে আমার ব্যক্তিগত দুঃখ ও অনুশোচনা সকলের চেয়ে বেশীই। কিন্তু আমার স্বদেশের মুক্তির জন্যে যত বড় অপ্রিয় কাজই হোক্ আমায় করতে হবে এবং সে কর্ত্তব্য-পথ থেকে আমি এতটুকু বিচলিত হ'ব না। চীনারা যে বর্ত্তমানে ইঙ্গ-আমেরিকানদের সাহায্য করছে এবং ভারতসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে, এতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি। কিন্তু চীনাদের উদ্দেশে আমার বাণী এই যে যদিও তারা ব্রিটিশদের দলভুক্ত তবু ভারতীয়রা এখনও চীনাদের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। আমার আন্তরিক কামনা, চীনারা যেন তাঁদের অসৎ নেতাগণের দ্বারা আর প্রতারিত না হ'ন।

—সাংহাই বেতার, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৩।

*　　*　　*　　*

নান্‌কিন্ বেতার কেন্দ্র থেকে এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন :—

"একজন নেতার নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনের উচিত জাপানের সঙ্গে সম্মানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। জাতীয় চীন সরকারের সঙ্গে সম্প্রতি যে আপোষ হয়েছে, তার ফলে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনদেশ থেকে সমস্ত সৈন্যদল সরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি জাপান দিয়েছে। যদি জাপানের সঙ্গে সন্ধি করবার মত শুভবুদ্ধি চুংকিং সরকারের হয়, তা হলে সত্যিই সমগ্র এশিয়ার চিরস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধিময় নবযুগের সূত্রপাত হবে। এতে ভারতবাসীরা প্রকৃত উৎসাহ

পার্বে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চালাবার মত দৃঢ় মনোবল অর্জ্জন করতে পারবে। চীনের অর্থনৈতিক অবস্থাও স্থির হয়ে ভবিষ্যতে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাপানের রাজনীতি এমন দিকে চলেছে যাতে প্রাচ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সুম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজ চীনের সাম্নে স্বর্বণ সুযোগ উপস্থিত এবং চীনা ভাইগণের কাছে আমার এই উপদেশ, 'এ সুবিধা হেলায় হারিয়ো না।' আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী আমি। আমি বিপ্লবী। আমি চাই যেমন প্রত্যেক ভারতবাসী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করুক, তেমনি প্রত্যেক চীনদেশীয় নর-নারী দেশের মুক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করুক এবং আপনাদের জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তিকে পরহস্তের লোলুপ স্পর্শ থেকে রক্ষা করুক। অতীত আমাদের ভুলতে হবে। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কারবার, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ভারতের পুর্ব্ব-সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছে কারণ ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করেনা এবং ভয় পায় যে সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বপক্ষে যোগদান করবে। সীমান্ত রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যের পরিবর্ত্তে ইংরেজরা এখন চুংকিং এবং ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনীর সন্নিবেশ করেছে। তাই যখন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, তখন শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, চুংকিং সৈন্যদের বিরুদ্ধেও তাদের লড়তে হবে। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক বলে থাকেন যে তিনি স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী। অথচ তিনি ভারতে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে, ভারতের স্বদেশপ্রেমিক লোকদের অবদমিত করবার জন্য সৈন্যপ্রেরণ করেছেন। চীন অচিরেই একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হবে এবং সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করবে, এই কথা বলে ইঙ্গ-আমেরিকানরা কূটচালে এক দল চীনাদের হাত করেছে। কিন্তু চীনাদের সাবধান হ'তে হবে এই মারাত্মক, কূটমন্ত্রণার

প্রচার-কার্য্যের বিরুদ্ধে। তাদের বুঝতে হবে যে জাপানের পরাজয়ে সমগ্র এশিয়ারই বিপদ। চীনদেশ যাতে ফের উঠ্‌তে পারে, সে সাহায্য না করে ইঙ্গ-আমেরিকানরা তার রক্তশোষণ করেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পিছ-পা হবেনা। সারাটা জীবন ধরে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিরুদ্ধেই আমি বিদ্রোহ করে এসেছি। বহু দীর্ঘদিনব্যাপী কারাবাস এবং অকথ্য নির্য্যাতনেও আমার দেশপ্রীতি ক্ষুণ্ণ হয় নি, দেশমাতাকে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প একটুও নত হয়নি। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে চতুর ইংরেজ রাজনৈতিক দলপতিরা আমাকে আদর্শচ্যুত করবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু কিছুতেই আমাকে দলে টানতে পারেনি। আমি ঠিক জানি, তারা এখানেও ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং চীনাদের প্রতারণা করতে পারবে না। চীনাদের বুঝতে হবে যে জাপানের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসা ও চুক্তি করা কিছু অসম্ভব কাজ নয় এবং আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় ধারণা যে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেললে চীনেরই মঙ্গল। যদি ভারত আজ স্বাধীন হ'ত, আমি মধ্যস্থ হবার জন্য নিজেই এগিয়ে আসতুম। চীনাদের ঐক্যসাধন সমস্ত এশিয়াবাসী জাতিদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে ঐক্য না হলে, এশিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই আমি চীনা ভাইদের অনুরোধ জানাই যেন তাঁরা ইঙ্গ-আমেরিকানদের সঙ্গে কোনও রূপ সহযোগিতা না করেন। তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, অন্যান্য প্রাচ্য-এশিয়ার জাতিদের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়ে এই সমগ্র পূর্ব্ব ভূখণ্ডের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন জগতের পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে সাহায্য করা।"

নেতাজী আরো বলেন, "যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, তাহলে কালই আপনারা এক নেতৃত্বাধীনে সমস্ত চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করে জাপানের সঙ্গে গৌরবসূচক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন। আর একবার সে কাজটি হ'লেই, দেখবেন চীন থেকে জাপান তার সমস্ত সৈন্যবল অপসারিত করে নেবে। এর জন্যে যুদ্ধাবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করবার প্রয়োজন নেই।

এখনই আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারেন। আপনারা এখনই যদি জাতীয় পুনর্গঠনের চেষ্টা সুরু করেন, তা হলে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব দৃঢ় ভিত্তিতেই স্থাপিত হতে পারে। ব্রহ্মদেশকে ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে এবং জাতীয় চীন সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বীকার করে জাপান সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করেছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে জাপানের উক্তিগুলি মৌখিক নয়, আন্তরিক। প্রাচ্য এশিয়ার জাতিগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও শান্তির জন্য জাপানের কর্ম্মোদ্যম সত্যিই প্রস্তুত। আমি আমার দেশ যত আন্তরিকভাবে ভালোবাসি, আমার প্রত্যাশা আপনারাও আপনাদের স্বদেশকে তত গভীরভাবেই ভালোবাসেন। তাই আমি চাই যে প্রত্যেক চীনদেশীয় মানুষ তার দেশের মুক্তি সাধনায় একনিষ্ঠ চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হোক্। তাদের আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত করতে আমি কখনোই তাদের পরামর্শ দিতে পারি না। বর্ত্তমানে, এশিয়ায় যে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে সে সম্পর্কে জাপানের নীতি আমি যা বুঝেছি, তা থেকে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে প্রাচ্য-এশিয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চীনাদের হাতে এক মস্ত সুযোগ এসেছে ইঙ্গ-আমেরিকান দলের কবল থেকে মুক্তি পাবার। এ সুযোগ চীনারা যেন অপব্যবহার না করেন। চীনদেশ থেকে বিদেশীদের প্রভাব নিঃশেষে অপসারিত হয়েছে। চীনাদের অবশ্য অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে এবং সে সমস্যা-সমাধানে চুংকিং সরকারের নিজস্ব দায়িত্ব। চুংকিং দল ইঙ্গ-আমেরিকানদের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভে কেন যে এতটা আস্থাবান্, সেটা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। প্রাচ্য-এশিয়ায় এবং য়ুরোপের বহুস্থানে আমি অনেক ঘুরেছি এবং দেখেছি। তাই, এ যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে চক্রশক্তির ক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মেছে। অতএব এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এ যুদ্ধ যদিও তীব্র ও ভীষণভাবে বহুদিন চলবে, তবুও ইঙ্গ-আমেরিকান দল শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হবেই।"

তারপর নেতাজী বলেন, "আজ আমি চলে যাচ্ছি শোনানের প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্রে। সেখান থেকে যাবো বর্ম্মায়, তারপর ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে। ভারতের জাতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে রণক্ষেত্রে আমার বর্ত্তমান উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজকে শীঘ্রই লড়তে হবে ব্রিটিশ ও চীন সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের সাহায্যকল্পে তাদের হয়ে চীনদের কেন যে আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে, এ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। চুংকিং তো নিজেকে জাতীয় সরকার বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু অন্যান্য জাত-ভাইদের যাঁরা দাস করে রেখেছে এমন বিদেশী শক্তির সাহায্যে তারা কেন এগিয়ে এসেছে? ১৯৩৮ সালে যখন আমি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম, তখন চীনে আমি এক মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলাম। চুংকিং এখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সৈন্যদল পাঠিয়ে তারই প্রতিদান দিয়েছে এবং উপরন্তু ভারতে ব্রিটিশের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করছে। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক্ যে একদা ভারতের জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যদের সামরিক অভিযানের হুকুম দেবেন, এ কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? তিনি যদি তাই করেন, তাহ'লে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অটল প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে চীনারা কখনো যে ক্ষমা করবে না, সে বিশ্বাস আমি করি।"

—নানকিন্, বেতার ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

পার্ল হার্ব্যারের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নেতাজী বলেন, "১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ ঐ দিনে এশিয়া প্রথম স্বাধীনতার পথে যাত্রা সুরু করে। আজ এশিয়া থেকে ইংরেজ ও আমেরিকানদের বিতাড়িত করবার জন্যে

সমস্ত প্রাচ্য-এশিয়া জাপানের নেতৃত্বে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এটা স্বাধীনতার দুর্গ বিশেষ, সেখানে শত্রুপক্ষের প্রবেশ দুঃসাধ্য। যে মুহূর্ত্তে প্রাচ্য দেশগুলির সম্মিলিত সৈন্যশক্তি আক্রমণ সুরু করবে, সেই মুহূর্ত্তে ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে পালাতে হবে, সে কথা আমি নিশ্চিত জানি। যদিও কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনদেশের প্রতি ভারতবাসীগণের সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এখন তাদের মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমার মনে হয়, ভারতবাসীদের মত চীনাদেরও জাতীয় স্বার্থের কথা ভোলা উচিত নয়। অবশ্য চীনা ভাইদের এমন পরামর্শ দিই না যে তারা তাদের আত্মসম্মান খোয়াক্, বরঞ্চ তারা বিপরীতটাই করুক্ এ আমি প্রত্যাশা করি। ওয়াং-চিং-উই-এর অধীনস্থ জাতীয় চীন রাষ্ট্রের কাছে সমগ্র অধিকৃত-চীনদেশ ফিরিয়ে দেবার পরেও চীন জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। যদি যুদ্ধ থামিয়ে জাপানের সঙ্গে চীন কোনো এক সম্মানসূচক বন্দোবস্তে আসতে পারে, তাহলে চীনের অবস্থার উন্নতি হবেই। পূর্ব্ব-এশিয়ার প্রগতি দু'টি জিনিষের ওপর নির্ভর করে,—একটি হ'ল চীনের স্বাধীনতা আর দ্বিতীয়টি হ'ল, ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভুত্ব থেকে ভারতবর্ষের অব্যাহতি।

—সিঙ্গাপুর বেতার, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৩।

* * *

রেঙ্গুন থেকে কাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই মর্ম্মে বক্তৃতা দিয়েছেন :—

"বন্ধুগণ, আশা করি আপনাদের স্মরণ আছে যে ১৯৪৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতের জাতীয় বাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে এক বেতারকেন্দ্র উদ্বোধন আমি করেছি। তারপর থেকে আমাদের সেনা-বাহিনীর কর্ম্মচারীরা ও অন্যান্য লোকেরা নিয়মিতভাবে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতারে বক্তৃতা করছেন। আপনারা এও জানেন যে সৈন্যদলের

প্রধান ঘাঁটি এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ম্মকেন্দ্র শোনান থেকে বর্ম্মায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বেতার স্টেশনের একটি বিভাগও তাদের সঙ্গে চলে এসেছে। এটি এখন বর্ম্মায় শাখা-বিভাগ। শোনানের বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে বর্ম্মায় এই স্টেশনের সর্ব্বদাই যোগাযোগ থাকবে। জাতীয় বাহিনীর বেতার কেন্দ্রের এই নতুন বিভাগটি খোলবার জন্যে আমাকে যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, সেজন্য আমি বিশেষ গৌরব বোধ করছি। এই বেতারকেন্দ্র থেকে আমাদের সৈন্যদলের কর্ম্মচারীরা যে সব বক্তৃতা দিচ্ছেন, তা আমার স্বদেশবাসীদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদলের মনে। এসব বেতার বক্তৃতা রণক্ষেত্রে ভারতীয় লোকের ওপর যে ভাবে কার্য্যকরী হয়েছে তাতে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েছে। ভারতের দ্বারপ্রান্তে জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতিও তার মাত্রা বাড়িয়েছে। ব্রিটিশদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমে তারা ভারতবাসীদের বোঝাতে চাইলে যে জাতীয় বাহিনীর কোনো অস্তিত্ব নেই। পরে যখন তারা বুঝলে যে ভারতবাসীরা এ বাহিনীর অস্তিত্বের কথা শুনেছে ও জানতে পেরেছে তখন তারা প্রচার করতে লাগল যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে জোর করে তাদের সৈন্য দলভুক্ত করানো হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি কোনো রকমে একটা অসম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষা দিয়ে যুদ্ধের জন্য ছেড়ে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে। এ কথাও তারা বলতে লাগল যে এইসব বন্দী ভারতীয় সৈন্যরা এখনও ব্রিটেন-ভক্ত এবং সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা ভারতের জাতীয় বাহিনী ত্যাগ করে চলে আসবে। এই কথাটা ব্রিটিশরা স্পষ্টই ভুলে গেছে যে প্রথমে কি কারণে সে যুদ্ধ করছে সেটা পরিষ্কার না জানিয়ে কাউকে দিয়েই সর্ব্বান্তঃকরণে যুদ্ধ করানো অসম্ভব। ব্রিটিশদের সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হ'ল, তখন 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' আমার প্রতি এমন অশিষ্ট এবং অভব্য বাক্যে গালিগালাজ

প্রয়োগ করতে সুরু করল যে তার কাছে মেছোবাজারের ভাষাও হার মানে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমার প্রতি ভারতের জাতীয়তাকামী কর্ম্মীদের মনে যেটুকু শ্রদ্ধা আছে, সেটা কখনই এই ভদ্রতা-রীতি-বিরুদ্ধ কটু-বর্ষণে টলে যাবে না। বর্ত্তমানে ভারতের হিতার্থে, আমার স্বদেশবাসীদের কল্যাণ-কামনায় আমি যে কাজ করছি এবং আমার মনে যে আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব নেই, এ কথা তাদের নিন্দাবাদই প্রকারান্তরে প্রমাণ করে দিচ্ছে, এই সহজ তথ্যটা বুঝবার মত বুদ্ধি ব্রিটিশ প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নেই—এটা সত্যই পরিতাপের বিষয়। ভারতীয় মাত্রেই জানেন যে ১৯৪০ সালে আমার কারামুক্তির পর আমি স্বদেশেই থেকে যেতে পারতুম। কিন্তু আমার ভিতরকার মন যেন দেশ ছেড়ে চলে যাবারই ইঙ্গিত জানাল। গত কয়েক বৎসর ধরে আমি আমার সমস্ত সময় ও শক্তি নিযুক্ত করেছি দেশের মুক্তি সাধনায়। এখনই আমি বুঝতে পারছি যে গত তিন বছর ধরে আমার গতিবিধি ও কর্ম্মসূচী ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই পরিচালিত হয়েছে। যদি ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করতুম, তা হলে স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র কখনোই সংগঠিত হতে পারতো না, এবং আমার স্বদেশও স্বাধীনতার এত কাছাকাছি এসে পৌঁছুতে পারতো না। গত কয়েক বৎসর ধরে আমি পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। তার ফলে জেনেছি যে ভারতকে স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, ভারতবাসীদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনায় সাহায্য করতে জাপান এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতি সত্যিই উৎসুক। শুধু নির্ব্বোধ লোকেই এ কথা চিন্তা করে যে জাপান পূর্ব্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়কে শক্তি প্রয়োগে নিজের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে। আমি জাপানে অনেকবার গিয়েছি এবং সে দেশের সমস্ত গণ্য-মান্য নেতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেছি। আমার এই আতিথ্য-কালে আমি স্পষ্টই জানতে পেরেছি যে এশিয়ার জনগণ যাতে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে সে

বিষয়ে জাপান আন্তরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত এবং প্রতিশ্রুতি সম্পর্কেও জাপানের কথায় ও কাজে মিথ্যাচরণ নেই। প্রবাসী ভারতবাসীরাও প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে যাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভুত্ব থেকে তাদের স্বদেশ মুক্ত হতে পারে। এই স্বাধীনতার আদর্শের জন্যই তারা জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মহৎ উদ্দেশ্য যে সফল হবেই সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ভারত থেকে ইংরেজরা অচিরেই এবং চিরদিনের জন্যই বিতাড়িত হবে।"

—স্বাধীন ভারত বেতার, সাইগন, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪।

* * * *

এক বক্তৃতায় নেতাজী বলেছেন যে স্বাধীনতার সেনাবাহিনী ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনের অভিপ্রায়ে ভারতের সীমান্তরেখা দৃপ্ত বিজয়ে অতিক্রম করেছে। স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যদলের ও জাপান-বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য করে শ্রীযুক্ত বসু প্রাচ্য-এশিয়ার ও ভারতের জনগণের কাছে আবেদন করেন যেন তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই জিহাদী সৈন্যদলের সহিত সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে ভারত-ভূমিতেই ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সহিত বর্ত্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের তুলনা করলে দেখা যাবে যে যদিও পূর্ব্বের প্রচেষ্টা বেশ ভালো ভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, তবু জনগণ এখনকার মত এত সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয় নি। সে সময়ে মিত্রপক্ষ কেউ ছিলনা, বিদ্রোহীদের সামরিক শিক্ষা দেবার অবকাশও ছিল না। কিন্তু তবুও সে বিদ্রোহের একটি মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল; ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নতুন শক্তি-সঞ্চার হয়েছিল। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই আন্দোলন বিপ্লবী রূপ ধারণ করেছে। নেতাজী বলেন, "এই শেষ দু' বছরের মধ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলন এক নতুন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং সবাই বুঝেছে যে সফল

হতে হলে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের দরকার। প্রাচ্য-এশিয়ায় জাপানের আশ্চর্য্য কৃতিত্বে ও সাফল্যে ভারতের দেশপ্রেমিকরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ পেয়েছেন, ফলে ভারতের জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। আজ এই বাহিনী, জাপানের সাহায্যে, ব্রিটিশদের সাংঘাতিক পরাজয় ঘটিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রচুর আত্মত্যাগের দাবি করে। তাই সে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে গেলে আগে স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে। যতদিন দেশের জন্য ত্যাগের মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত না হই, ততদিন আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব না। ভারতের ঐশ্বর্য্য ইংরেজ আত্মসাৎ করেছে আর হাজার হাজার ভারতীয় যুবা অনশনে প্রাণত্যাগ করছে, এ গুলো কি সত্য নয়? তবে স্বাধীনতার চরম সংগ্রামে আমাদের যে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তার তুলনায় এ সব অকিঞ্চিৎকর। ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনো ভারতবাসীর কোনো রকম সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। ব্রিটেন এই সংবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছে যে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জাপানের কোনো মাথা-ব্যথা নেই। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে জাপান যে সাহায্য দিচ্ছে তার প্রধান উদ্দেশ্য যাতে একদিন সে ভারতবর্ষ জয় করতে পারে। এটা হ'ল ব্রিটিশ প্রচার-বিভাগের একটি যথার্থ ও উপযুক্ত নমুনা। আমার মনে হয় কেউই এ সব কথা বিশ্বাস করবেন না। যদি ইংরেজরা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদকে দেশের শত্রু বলে অভিহিত করতে পারে, তা হলে জাপানকেও সেই পর্য্যায়ে তারা ফেলবে, এ আর কি বিচিত্র সংবাদ?"

নেতাজী এই বলে শেষ করেন:

"ভারত সম্পর্কে জাপানের কি মনোভাব, তা আমি জানি। জানি বলেই আমার দেশবাসীদের আশ্বাস দিতে পারি যে ভারতকে স্বাধীন দেখবার ইচ্ছা জাপানের সত্যিই আছে। আজ ভারতের এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সারা এশিয়ারই যুদ্ধ।"

—রেঙ্গুন বেতার, ২৫শে মার্চ, ১৯৪৪।

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়ে নেতাজী বসু বলেন,

"অস্থায়ী রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে জাতীয় বাহিনী ভারত আক্রমণ করেছে এবং ভারতের ভিতর প্রবেশ করেছে। ভারতবাসিগণ! এই সরকার আমাদের নিজস্ব। আশা করি, এর সাহায্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দাসত্ব থেকে আমরা স্বদেশের মুক্তি সাধন করতে পারব। ভারতের জাতীয় বাহিনী ততক্ষণ অস্ত্রত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমাদের অত্যাচারী মনিবের দল ভারত থেকে চিরদিনের বিতাড়িত না হয়। আমাদের জাতীয় সরকারের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম হ'ল—আগে শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করে তারা দেশের যে সমূহ ক্ষতি করেছে তারি সংস্কার-সাধন করা। আর দ্বিতীয়টি হ'ল—যে অঞ্চলগুলি সম্প্রতি মুক্ত হ'ল তাদের জন্য একটি যথাযথ রাষ্ট্র-প্রণালী ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। আরেকটি কথা আপনাদের এই প্রসঙ্গে শোনাতে চাই। জাপানের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে এবং তার সাহায্যের ওপর অনেকখানি ভরসা স্থাপন করেই আমাদের জাতীয় সরকার অগ্রসর হচ্ছে। জাতীয় স্বাধীন সরকারের তরফ থেকে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে ভারতের ওপর সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা ভৌগোলিক ক্ষেত্রে জাপানের কোনো রকম দুরভিসন্ধি নেই! বর্ত্তমানে মুক্ত এলাকাগুলির শাসন কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থায় স্বাধীন ভারতীয় সরকার নিযুক্ত আছে। আপনারা হয়তো জনেন যে ভারতের মুক্ত এলাকার শাসনকার্য্যের জন্য লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর অধীনে একটি কার্য্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে। স্বাধীন সরকার এই অঞ্চলে নিজের মুদ্রা চালাতে মনস্থ করেছেন এবং ইতিমধ্যে টাকার নোট ছেপেছেন। কিন্তু জাতীয় বাহিনী ভারত-অভিযান এত দ্রুত ভাবে চালিয়েছে যে অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের কোনো ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণই তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। তাই বর্ত্তমানে মুদ্রিত নোটগুলি কিছুদিনের জন্য চালু থাকা বন্ধ হতে পারে। ততদিন জাপানী মুদ্রা তার

পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হবে, এই স্থির হয়েছে। তবে আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, যে সুবিধা হলেই এবং অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অস্থায়ী রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তিত নোটগুলি আবার ব্যবহার করা হবে।"

নেতাজী অবশেষে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর কাছে নিবেদন জানান যেন তাঁরা অস্থায়ী স্বাধীন সরকার এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

—রেঙ্গুণ বেতার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৪।

* * * *

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তার-যোগে হের অ্যাডল্‌ফ্ হিটলারকে নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠিয়েছেন ;—

"স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্র এবং ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে সশস্ত্র জার্মাণ রাষ্ট্রের নায়ক আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যেন আক্রমণ-রত বিপক্ষদলকে হটিয়ে দিয়েই অচিরেই আপনার সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। ত্রি-শক্তি দলের অজেয় সাহস এবং অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্বন্ধে ভারতীয়গণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আজ ভারত সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে জার্মাণী যে অতি শীঘ্রই ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্য-বাদীদের বিতাড়িত করে পৃথিবী নিরাপদ করবে এ বিষয়ে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

—বার্লিন বেতার (বাঙলা ভাষায়), ২০শে জুন, ১৯৪৪।

*

'নেতাজী সপ্তাহের' প্রথম দিনে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়েছেন—

"ভারতের জাতীয় বাহিনীর অভিজ্ঞ সৈনিকদল ভারতভূমিতে পদার্পণ করার ফলে বর্ত্তমানে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম—প্রাচ্য-এশিয়া যেখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক কার্য্যের

কেন্দ্র ; দ্বিতীয়—সম্প্রতি মুক্ত ভারতের অঞ্চল যেখানে আমাদের জাতীয় সরকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ চালাবে আর তৃতীয়—ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত যেখান থেকে প্রত্যাশা করি আমাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সহযোগিতা. যেখানে অচিরেই আমাদের পতাকা উত্তোলিত হবে আশা করছি।"

—টোকিও বেতার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪।

এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন :

"জাপান যখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, তখন আমি স্বেচ্ছায় জাপানে আসা স্থির করলুম। আমার স্বদেশবাসিদের অনেকের মতই আমি বুঝতুম না, জাপান ১৯৩৭ সালে চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে নাম্‌লো কেন। তাই এ যাবৎ সহানুভূতি ছিল চুংকিং-এর ওপর। জাপানে এসে যেটা দেখলুম এবং যেটা আমার বহু দেশবাসীরা সম্‌ঝাচ্ছেন না যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধ বাধ্‌বার পর থেকে পৃথিবীর সম্পর্কে জাপানের মনোভাব, বিশেষ করে প্রাচ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সম্পর্কে জাপানের মতি-গতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এ পরিবর্ত্তনটা শুধু জাপানী সরকারের নয়, জাপানের জন-সাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই যে নতুন মনোভাব, যাকে আজ প্রাচ্য-চেতনা বলতে চাই, —এটা ফিলিপাইন্, বর্মা এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানের বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়েছে এবং চীনের সম্পর্কে জাপানের সাম্প্রতিক কার্য্য-কলাপ এই কারণেই বদলেছে। জাপানে আসার পর থেকে এ দেশের রাষ্ট্র-নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে এশিয়ার প্রতি জাপানের বর্ত্তমান মনোভাব একটা ধাপ্পাবাজি নয়, ওটা তার আন্তরিক শুভকামনারই নিদর্শন। ১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার জাপান পরিদর্শনের পর আমি ফিলিপাইন দ্বীপে গিয়েছিলুম এবং সেখানে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সমস্ত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করেছিলুম।

বর্মাতেও বেশ কিছু দিন কাটিয়েছি এবং স্বাধীনতা—ঘোষণার পর অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখবার ও বোঝবার সুযোগ-সুবিধা আমার হয়েছে। তারপর চীনেও গিয়েছি কৌতূহল-বশে—দেখবার জন্যে যে বর্ত্তমানে চীনের প্রসঙ্গে জাপানের নূতন নীতি শুধু কূট চাল না কি আন্তরিক পরিবর্ত্তন। সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে চীনের জাতীয় সরকারের যে আপোষ হয়েছে তাতে চীনারা যা যা চেয়েছিলেন, প্রায় তাই সবই পেয়েছেন। নূতন সর্ত্ত অনুসারে জাপান স্বীকার করেছে যে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী সৈন্যদল সরিয়ে নেওয়া হবে। তাহলে, চুংকিং কিসের জন্যে লড়াই চালাচ্ছে? ইংলণ্ড ও আমেরিকা চুংকিংকে সাহায্য করছে নিছক্ পরোপকারের জন্য এবং বিনা স্বার্থে—এটা কি বিশ্বাস যোগ্য? জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার কাজে বর্ত্তমানে তারা চুংকিংকে নানাভাবে সাহায্য দান করেছে, এর বদলে যথাসময়ে কি তারা ধার শোধ দাবী করবে না নিক্তির ওজনে? জাপানের বিরুদ্ধে চুংকিং-এর যে বৈরিভাব ও শত্রুতা ছিল অতীতে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা বর্ত্তমানে পূর্ণমাত্রায় তারি সুযোগ নিচ্ছে। ফলে, চিয়াং-কাই-শেক্‌কে তাদের কাছে চীনকে বন্ধকী রাখতে হয়েছে। যতদিন জাপান চীন-সম্পর্কে নতুন নীতি অনুসরণ করে নি, ততদিন অবিশ্যি বলা চল্‌ত যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে ইঙ্গ-আমেরিকানদের সাহায্য পাওয়া চীনের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এমন যখন চীন-জাপানের পারস্পরিক সম্বন্ধ ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই গড়ে উঠেছে, তখন জাপানের বিরুদ্ধে অর্থহীন শত্রুতা চালানোয় চুংকিং-এর কোনো অছিলা খাটে না।

"১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন; যদি স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করা যেত, তা হলে চীন-জাপানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আনবার চেষ্টা তিনি করতেন। এই বাণী রাজনৈতিক দূরদর্শিতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চীনের বর্ত্তমান অরাজকতার মূলে রয়েছে ভারতের দাসত্ব। কেননা, ইংরেজ ভারতের ওপর চেপে বসে আছে। তাই

ইঙ্গ-আমেরিকানরা চুংকিংকে ধাপ্পা দিয়ে বলছে যে ভারতের মধ্যে দিয়ে অনেক সাহায্য এবং রসদ আসবে যাতে চুংকিং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারে। চীন ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারত প্রাণপণ চেষ্টা করবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এতদূর বলতে প্রস্তুত যে ভারত স্বাধীন হলেই চুংকিং ও জাপানের মধ্যে সম্মানজনক মীমাংসা হবে আপনা থেকেই। চুংকিং-ও বুঝবে, এত দিন ধরে কি বোকামিই না সে করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইঙ্গ-আমেরিকানরা চুংকিং শাসন—পরিষদকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে একবার জাপানকে হারাতে পারলেই চীন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে মস্ত বড় শক্তিশালী ক্ষমতা হতে পারবে। আসল কথাটা কিন্তু অন্যরকম। যদি জাপান দৈববশে পরাস্তই হয়, তাহ'লে চীনই আমেরিকার প্রভাব এবং বশ্যতায় চলে যাবে এবং চিরদিন সেই প্রভুত্বের অধীনেই থাকবে। এটা শুধু চীনের নয়, সারা এশিয়ার পক্ষে একটা দুর্ঘটনা—বিশেষ। হোয়াইট্ হল আর হোয়াইট হাউসের শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা দুর্নীতিমূলক চুক্তি করে চুংকিং মিথ্যা আশায় অন্ধ হয়ে লড়াই করে মরেছে; ভাবছে যদি কোনো রকমে জাপানকে হারানো যায়, তাহলে এশিয়ার প্রভুত্ব তার করতলগত।"

"এমন একদিন ছিল যখন লোকে বল্‌ত ভারতবর্ষের ওপর জাপানের স্বার্থপর মৎলব আছে। যদি এ দোষারোপ সত্যি হ'ত, তাহলে জাপান ভারতের স্বাধীন সরকারকে মেনে নিল কেন? আর অস্থায়ী ভারত-সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দু'টি ছেড়ে দিল কি করে? জাপানই বা প্রাচ্য-এশিয়াস্থিত সমস্ত ভারতবাসীদের মুক্তি-সংগ্রাম বিনা সর্ত্তে সাহায্যদানে অগ্রসর হবে কেন? ভারতের ভিতর থেকে আমার স্বদেশবাসিগণ কতখানি আমাদের সাহায্য করতে পারেন—তারি উপর নির্ভর করছে জাপানের কাছ থেকে আমাদের

কতটা সাহায্যের প্রয়োজন, যাতে শেষ ব্রিটিশরা ভারত থেকে বিতাড়িত হয়। যদি আত্মশক্তি দ্বারা ভারত নিজে থেকেই মুক্ত হতে পারে, তা হলে জাপান নিশ্চয়ই খুসি হবে। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরাই প্রথমে জাপানের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম।"

"আমি আন্তরিক ভাবেই কামনা করি যে আমার স্বদেশবাসীরা মতিস্থির করে কাজ করবেন। ইঙ্গ-আমেরিকানরা এই যুদ্ধে জয় লাভ করবে, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও চুক্তিবদ্ধ হবার কথা যেন তাঁরা চিন্তাও না করেন। যুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং যুদ্ধ-কালীন অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আমি জোর করে বলতে পারি যে ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তে এবং ভারতের মধ্য স্থলেই আমাদের শত্রু পক্ষের দুর্ব্বলতাই বেশি। আমাদের নিজেদের শক্তি ও উপকরণ সম্বন্ধেও চিন্তা করে বুঝেছি যে জয়লাভ আমাদের নিশ্চিত। সম্মুখে যে ঘোরতর কঠিন সংগ্রাম পড়ে রয়েছে, তা বিলক্ষণ জানি; মানি যে, ভারতেই ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য-বাদী শেষ লড়াই চালাবে এবং নাছোড়বান্দা হয়ে মরণ কামড় বসাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে যুদ্ধ যতই কঠিন ও দীর্ঘ হোক্ না কেন, এ যুদ্ধের ফলাফল একটি-ই—আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের শেষ মুক্তি সংগ্রাম সুরু হয়েছে।"

—সিঙ্গাপুর বেতার, ১০ই জুলাই, ১৯৪৪।

* * * *

যে সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতভূমিতে প্রবেশ করে নূতন যুদ্ধোদ্যমে প্রস্তুত হয়, সেই সময়ে, অর্থাৎ গত একবছরের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, তারি একটা আলোচনা প্রসঙ্গে নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন যে যতদিন ব্রিটিশদের শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ মুক্ত না হয়, ততদিন স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প অটুট্ থাকবে। তিনি বলেন :

"প্রায় বছরাবধি হল প্রাচ্য-এশিয়ার ভারতবাসীদের কাছে আমি একটি কার্য্য-সূচী দাখিল করেছিলুম যুদ্ধ চালনায় সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে। সেই প্রসঙ্গে প্রস্তাব জানিয়েছিলুম যেন আমার স্বদেশবাসীরা অর্থবল, লোকবল এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে আমাদের ক্রমাগত সাহায্য করেন—যাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে এবং সে স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশে সশস্ত্র আন্দোলন চালনায় আমরা পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হতে পারি। সৈন্যদলের পুনর্গঠন, সংস্কার, বিস্তার এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার জন্যে আমি তাঁদের কাছে দাবি জানিয়ে এই আশ্বাস দিয়েছিলুম যে যদি তাঁরা আমার পূর্ণ প্রচেষ্টার আহ্বানে সাড়া দেন, তা হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলতে বিলম্ব হবে না। যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি অবশ্য এখুনি সম্ভব নয় ; তার বেশ কিছু দেরি আছে। তবু প্রাচ্য-এশিয়ার ভারতবাসীরা আমার নিবেদন যে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং সাড়া দিয়ে অকৃপণ সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, তার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। এরি ফলে ভারতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত হয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি-সেনা পবিত্র ভারত ভূমিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে।"

নেতাজী আরো বলেন, যদিও এখন পর্য্যন্ত যতটা অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কাছে সেটা তুচ্ছই, তবুও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ চালাবার জন্যে তিনি যতটা দাবী করেছিলেন তার অতিরিক্ত চাঁদা তিনি পেয়েছেন। এ কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছেন। আর্থিক সঙ্গতির জন্য, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে 'ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ আজাদ হিন্দ লিমিটেড' নামে একটি নিজস্ব ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক যে ভালোভাবে চলেছে তার

প্রমাণ, নানা জায়গায় ইতিমধ্যে এর অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে দরকার মত অন্যত্র খোলা হবে। তাঁর বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ভারতীয় অর্থের সাহায্যেই স্বাধীনতা আন্দোলন চালানো যে সম্ভব হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমান অভিযান প্রসঙ্গে নেতাজী বলেন:

"লোকবলের সাহায্য প্রার্থনা করে আমি যে আবেদন জানিয়েছিলুম, তা আশ্চর্য্যভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে লোকে যে অপ্রত্যাশিত আগ্রহ দেখিয়েছে, তাতে লোক ভর্ত্তি করার কাজে আমাদের কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রাচ্য-এশিয়াতে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মত লোক সরবরাহের এত বড় একটা ঘাঁটি রয়েছে, যে কোনো মুহূর্ত্তেই আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। তাই সেনাবাহিনীর ক্রমবিস্তার অব্যাহত ভাবেই চলবে। সব চেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা হ'ল প্রাচ্য-এশিয়ায় ভারতবাসীদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা এবং 'ঝাঁন্সীর রাণী' নামক মহিলাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান দেবার জন্যে আবেদনের প্রত্যুত্তরে নারীদের অদ্ভুত আগ্রহ প্রকাশ। যে সব মহিলাদল ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছে, তারা বিপ্লবী উদ্যমে, সামরিক কায়দায় ও কৃতিত্বে, পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় এবং কর্ম্ম-তৎপরতায় সকলের কাছেই প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। ১৯৪৩ সালে ২১শে অক্টোবর তারিখে 'আজাদ হিন্দ্' অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ, আগামী যুদ্ধের জন্য আয়োজন—অনুষ্ঠান প্রায় তৈরী হয়ে এসেছিল এবং ভারতীয় সৈন্যগণ ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের দিকে যে রকম সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তাতে অস্থায়ী রাষ্ট্রের সংগঠন বিশেষ জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, সারা পৃথিবীতে বিপ্লবী কর্ম্ম-পন্থার পদ্ধতি অনুসারেই এটা রচিত হয়েছে। ভারতের এই স্বাধীন রাষ্ট্র জাপান, জার্মাণী প্রমুখ সাতটি মিত্র-শক্তি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এতে সমস্ত দুনিয়ার সামনে আমরা একটা নতুন পদমর্য্যাদা

পেয়েছি এবং আমাদেরই শুধু খাতির বাড়েনি, আমাদের স্বাধীনতা কামী যুদ্ধরত ভ্রাতৃবৃন্দেরও উৎসাহ এবং এবং কর্ম্মশক্তি শতগুণে বেড়ে গিয়েছে।”

“ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার অব্যবহিত পরেই তার প্রথম কাজ হল ১৯৪৩ সালে ২৩শে অক্টোবর তারিখে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা। তার কয়েকদিন পরেই টোকিও শহরে প্রাচ্য-এশিয়ার জাতিসমূহের এক সম্মেলন হয়। সেখানে ভারত দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল। আমার মনে হয় যে এই ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনের আসল কৃতিত্ব হল পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিগণ আর ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গভীর বন্ধুত্ব এবং ঐক্য-সূত্র রচনা। এই সময়ে, সম্মিলনীতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টোজো এই মর্ম্মে বিবৃতি দেন যে জাপান সরকার আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত শাসনভার ন্যস্ত করে দিতে মনস্থ করেছেন। এই বিবৃতি অনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এবং অস্থায়ী ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী কর্ণেল লোকনাথনকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনারপদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করেন।”

তারপর নেতাজী প্রচার-বিভাগের কার্য্যাবলী আলোচনা করেন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ‘আই-এন-এ ব্রডকাস্টিং স্টেশন’ নামে একটি বেতার-কেন্দ্র খোলা হয়। অস্থায়ী ভারত সরকারের কর্ম্মকেন্দ্র বর্মায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর, ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকটে দ্বিতীয় বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অস্থায়ী সরকার আরো দুটি বেতার স্টেশন পরিচালনা করছেন। বর্মার নূতন স্বাধীন সরকার ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রকে যেভাবে সর্ব্ববিধ সাহায্য করছে, তার জন্যে তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রসঙ্গে নেতাজী মন্তব্য করেন যে, এই বছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে আরাকান অঞ্চলে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালু করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এটা অগ্নিস্নান বলতে হবে। আর এই কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের কিছুটা পুরস্কার মিলেছে কয়েকজনকে বিশিষ্ট সামরিক সম্মান-দানে। প্রায় মাসখানেক পরে এই যুদ্ধ ইন্দো-ব্রহ্ম সীমান্তের আরেকটি অঞ্চলে সুরু হয়, টিডিম্-এর নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং তার সপ্তাহখানেক পরেই আসামের মণিপুর অঞ্চলে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধক্রিয়া ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। অচিরেই ভারতের সীমান্তরেখা কয়েক স্থানে অতিক্রম করা হয়। ইম্পিরিয়াল জাপানী বাহিনীর পাশাপাশি আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটি দল যুদ্ধ করতে করতে মণিপুর ও আসামের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তারপর থেকে ভারত সীমান্তের ভিতরেই যুদ্ধ চলেছে এবং ভারতীয় সৈন্যদল কালাদান ও হাকা অঞ্চলেও যুদ্ধ চালাচ্ছে। নেতাজী বলেন :

"যদিও সম্প্রতি আমাদের অগ্রগতি এমন কিছু চমকপ্রদ হয়নি, তবু আমরা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ভিতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যুদ্ধ ব্যাপারে অতি স্বাভাবিক বিপদাপদ সত্ত্বেও, বর্ষায় প্রবল বৃষ্টি, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপ এবং আরো নানাবিধ অসুবিধা ও প্রাকৃতিক বিপত্তি তুচ্ছ করে, আমাদের সৈনিকরা ভারতভূমিতে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এতে শুধু তাদেরি নয়, যারা ভারতের ভিতর থেকে আন্দোলন চালাচ্ছে তাদেরও, যথেষ্ট উৎসাহও প্রেরণা বেড়েছে।"

শত্রুর পশ্চাদপসরণের ফলে যে অঞ্চলগুলি মুক্ত হচ্ছে তাদের শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারে অস্থায়ী ভারত সরকারের সম্মুখে যেসব বিশেষ সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার আলোচনা করে নেতাজী বলেন যে এ সমস্যা

বহু পূর্ব্বেই অবধারিত হয়েছিল এবং তারি যথাযথ বিধানের জন্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের পুনর্গঠন বিভাগ ইতিমধ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। আজাদ হিন্দ সৈন্য দলের যেসব বীর পুরুস ও রমণী মুক্ত অঞ্চলগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছে, নেতাজী তাদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা-সূচক মন্তব্য করে বলেন, যে শুধু ভারতের বাইরেই নয়, ভিতরেও সমস্ত নরনারী একই মন্ত্রে উদ্দীপিত—'হয় কর্ম্ম, নয় মৃত্যু।'

ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালীর একটা আভাস দিয়ে নেতাজী তাঁর বিবৃতির শেষে জানান, "প্রথমে সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের এই বিজয়-গতি অক্ষুণ্ণ রেখে ক্রমশঃ ভারতের আরো ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে পুরোভাগের সৈন্যদলের জন্য আমাদের আরো নতুন লোক এবং রসদ পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, এই আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও নানাভাবে বাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে যখন আমরা ভারতের আরো অভ্যন্তরে গিয়ে পৌছুবো, তখন তারা যেন ক্রমাগতই নতুন নতুন কাজে এবং পরিকল্পনায় নামতে পারে। স্বাধীন ভারতের শাসন-পরিচালনা এবং পুনর্গঠনের জন্যে উপায় উদ্ভাবন কার্য্যে আমাদের ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তৃতীয়তঃ, অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে আরো শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে অর্থ, সৈন্য ও রসদ সংগ্রহের কাজ ত্বরিত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

—ডোমাই নিউজ এজেন্সি, ২১শে জুলাই, ১৯৪৪।

* * * *

এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন:

"আমার মনে হয় ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত জাতীয় নেতা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে সাহস হারিয়েছেন। 'ভারত ছাড়' —এই বুলি কোনো দলীয় বা সাম্প্রদায়িক চীৎকার মাত্র নয়। এটা সারা ভারতেরই কণ্ঠস্বর।"

সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতাজী বলেন :

"আধুনিক যুদ্ধে, সাফল্য কিংবা বিফলতা কোনোটাই শেষ কথা নয়। মিত্রপক্ষের হয়ে কেউই জোর করে বলতে পারেন না যে জয় তাঁদেরই হবে। খুবই সম্ভব যে তাদের জয়লাভ হবে না। নির্ব্বোধ রাজনৈতিকের দল যাঁরা খালি আপন আপন স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, তাঁরাই ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষ করবার পক্ষপাতী। কিন্তু এটা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতীয় সেনাবাহিনী কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত। যতক্ষণ না ভারত ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভুত্ব থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্ত হয়, ততদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ অস্ত্রত্যাগ করবে না। কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে, সমস্ত স্বাধীন ও মুক্ত জাতি অস্ত্র-শক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে পৃথিবী থেকে ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্রশক্তিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত দেশগুলি থেকে এই সব স্বাধীনীকৃত অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রচেতনা কিছু কম নয়। আমার দৃঢ় ধারণা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাস্ত হবে এবং সে পরাজয়ের ফলে নূতন স্বাধীন ভারত জন্মলাভ করবে।"

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বসু বলেন—"আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ চেষ্টায় কোনও দিনই শৈথিল্য দেখাবে না, কারণ তারা জানে তাদের স্বদেশ-বৎসল বন্ধু ও সহকর্ম্মীরা কত তীব্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কবে তারা বিজয়গৌরবে ভারতে প্রবেশ করবে।"

—বার্লিন বেতার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

"গত রবিবারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করেন, 'ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ-নাগপাশ থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্তকরা। এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে শুধুমাত্র সম্মিলিত শক্তিতে এই যুদ্ধে লিপ্ত হলে এবং নিজেদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারলে।' তিনি আরো বলেন-যে সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় তাদের সঞ্চিত শক্তি প্রয়োগ

ক'রে শত্রুকে ঘোরতর ভাবে আক্রমণ ক'রে—জাপান প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইবে। তিনি আরো বলেছেন, 'বর্ত্তমানের এই যুদ্ধ অবস্থা অক্ষশক্তির অনুকূলে বলা ঠিক হবে না। এই যুদ্ধের এক চরম পরিণতির জন্যে জাপানে বা পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য বন্ধনমুক্ত দেশে তেমন কর্ম্মোদ্যোগ নেই। সম্প্রতি স্থানে স্থানে যে পরাজয় ঘ'টেছে, তার জন্যে অবশ্য নিরাশ হওয়া অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়েছে।' তিনি আরো বলেন, যদি তেমন কোনো আপোষ-রফা হয়েই যায়, সে আপোষ-রফা ভারতবাসীর—স্বার্থের পরিপন্থীই হবে। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে এই বাণী দেশের কোনো দল বা সম্প্রদায়ের বাণী নয়, এই দাবী সমগ্র ভারতবাসীর দাবী। অতএব, যদি কোনো নেতা এই দাবীর প্রতিকূলে যান্, তবুও ভারতবাসীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন কিছুতেই হবে না। অতঃপর তিনি ১৯২৮ সালের কংগ্রেস প্রস্তাবের কথা উল্লেখ ক'রে ভারতবাসীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, সেখানে পূর্ণ-স্বাধীনতা দাবী করা হ'য়েছিলো; এবং বলেন, কোনো একজনের ব্যক্তিগত উচ্চাশা যা-ই হোক্-না কেন, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছা আজ সবার মধ্যে বর্ত্তমান। পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয় এবং ভারতীয় মুক্তি সেনাদল এই যুদ্ধে সাফল্যলাভ অবশ্যই করবে। অতঃপর যুদ্ধের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ ক'রে নেতাজী বলেন, গত মহাযুদ্ধে যেমন হয়েছিলো, এবারও তাই হবে—যে পক্ষ এই যুদ্ধ বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারবে, জয় হবে সেই পক্ষেরই। এবং এই কারণেই ইঙ্গ-আমেরিকার পরাজয় এবার—অনিবার্য্য। সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য অজানা সঙ্কট সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, পূর্ব্ব-এশিয়ার দেশসমূহ জাপানের সহযোগিতায় এক সামগ্রিক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। অক্ষশক্তি এখনো কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হ'য়ে যুদ্ধের সকল পরি-

সমাপ্তি ঘটাবার মত শক্তি রাখে। জাপানের মন্ত্রিসভার রদবদল এই দৃঢ়তার একটি প্রমাণ। নেতাজী বলেন যে ভারতীয় মুক্তি সেনা অসম সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছে। কোনো কোনো ভারতীয় নেতার পূর্ণ জয় জয়লাভের সম্ভাবনায় নৈরাশ্য দেখেও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী কখনো অস্ত্র ত্যাগ করবে না। যতদিন স্বাধীনতা লাভ না হবে, ততদিন যুদ্ধ তারা চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, পাকিস্থান পরিকল্পনা প্রায় সমগ্র ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু নয়, এ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। অবশেষে এই কথা বলে নেতাজীর তার বক্তৃতা শেষ করেন, 'ভারতীয় মুক্তি সেনাকে ভারতভূমিকে প্রবেশে বাধা দেয় এমন শক্তি কোথাও নেই, কেননা সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের সাদরে বরণ ক'রে নেবার জন্যে উৎসুক।'

—ফ্রী ইণ্ডিয়া রেডিও (সায়গন), ১০ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

"বর্মার এক সংবাদে প্রকাশ, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের ষাণ্মাসিক আজাদ হিন্দ দিবস পালনের জন্যে গত সোমবার বর্মার ভারতীয়দের এক বিরাট সম্মেলন হ'য়েছিল। এই সভায় নেতাজী বসু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষে লোকবলে ও অস্ত্রবলে বিপুল শক্তিতে সজ্জিত হ'য়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা আরম্ভের এই উপযুক্ত সময়।"

"নেতাজী বলেন যে, ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রধান নেতা নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন, এই দুর্ব্বলতার দরুণ তাঁরা মনে করছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোষ-রফা ক'রে ফেলাই হয়ত ঠিক। কিন্তু এই সব কাপুরুষরা হয়ত ভুলে যান, যদি তা বোঝাপড়া একটা ক'রে ফেলা হয়, তা হ'লেও ভারতবাসীরা সে বোঝাপড়া গ্রাহ্য করতে রাজি হবে না। যে 'ভারত ছাড়' দাবী আজ দু'বছর আগে গ্রহণ করা হয়েছে, সে দাবী একটি ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী দলের নেতার নয়, সে-দাবী

সমগ্র ভারতবাসীর দৃঢ়তা প্রকাশ করছে। অতএব কোনো নেতা এই 'ভারত-ছাড়' দাবীকে উপেক্ষা ক'রে যদি ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ-রফায় রত হন্, তাহ'লে ভারতীয়দের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হবে না। কেননা, ভারতের মর্ম্মকথা আজ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—'স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু।' এরপর শ্রীযুত বসু বলেন, আপোষরফা অথবা স্বাধীনতা—এর চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৯২৯ সালে। তখন কংগ্রেস সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলো—যে, ভারতের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বরাজ, অন্য কোনো নেতা এ-ভিন্ন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চাইলে ভারতের জনসাধারণ তাতে ঘোরতর আপত্তি করবে। কংগ্রেসের সেই চরম সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর ক'রে—পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইঙ্গ-মার্কিন বন্ধন থেকে যতদিন ভারতবর্ষ মুক্ত না না হয় ততদিন এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"

"যুদ্ধের সাধারণ অবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে নেতাজী বললেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি অক্ষশক্তির অনুকূলে বলা চলে না। তিদি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, এমন একটি প্রচণ্ড যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই অপ্রতিহত জয় সম্ভব নয়, কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত যে শেষ-বেশ ইঙ্গ-আমেরিকাকে পরাজয় বরণ ক'রে নিতেই হবে। ইউরোপীয় যুদ্ধের কথা উল্লেখ ক'রে নেতাজী বললেন লাল ফৌজ ওদিকে যতই সাফল্য লাভ করবে ইঙ্গ-আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ততই তিক্ততা ও সংঘর্ষের সূচনা দেখা দিবে। এই যুদ্ধেই ইঙ্গ-আমেরিকার শক্তি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে। তারপর তিনি বললেন, এক চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে জাপানে ও পূর্ব্ব-এশিয়ার দেশসমূহ সদলবলে প্রস্তুত হচ্ছে, এবং একটি মারাত্মক আঘাত হানবার জন্যে জাপান সুযোগের অপেক্ষায় র'য়েছে। অক্ষশক্তি আজ সমস্ত শক্তি সংঘবদ্ধ ক'রে তুলছে এক চরম সংগ্রামের জন্যে। এই কারণেই সম্প্রতি জাপানী মন্ত্রিসভার রদ-বদল করা হয়েছে।"

"পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের মনোবলের কথা উল্লেখ ক'রে নেতাজী

বললেন, এখানকার ভারতীয়রা আজ ভীষণ সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত, সর্ব্ব প্রকার দুঃখদুর্দ্দশার সম্মুখীন হ'বার জন্যে তারা তৈরি, যে কোনো প্রকার ত্যাগ বরণ করার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব—তাদের আজ একমাত্র উদ্দেশ্য পূর্ণস্বাধীনতা অর্জ্জন করা। শ্রীযুত বসু মনে করেন, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পূর্ব্ব-এশিয়ার সমগ্র অধিবাসী আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমানভাবে আগ্রহশীল। একমাত্র দুঃখের কথা এই-যে পূর্ণজয়ের যে দৃঢ়বিশ্বাস আজ সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়াবাসীদের আছে, কোনো কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের তা নেই। পাকিস্থান-পরিকল্পনার উল্লেখ ক'রে নেতাজী বললেন, ভারতবর্ষের কোনো কোনো আপোষ-রফায় বিশ্বাসী নেতারা একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা ক'রে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ'ড়ে তুলছেন, কিন্তু কোনো ভারতীয়—যে সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা যে জাতিভুক্তই সে হোক্ না—পাকিস্থানের পরিকল্পনাকে সে সে বরদাস্ত করবে না। পাকিস্থানওয়ালারা অথবা আপোষ-রফাকারীরা যা-ই বলুক না কেন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনারা নিজেদের লক্ষ্যের পথে যাত্রা ক'রেছে, তারা জানে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নেবে।

—বার্লিন রেডিও, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৪।

"বিভাগীয় কর্ত্তা, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ইত্যাদি 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের বিশিষ্ট কর্মীদের উদ্দেশ করে নেতাজী বসু বলেছেন—

'আমরা আক্রমণ আরম্ভ ক'রেছি কিছু দেরীতে। বর্ষা আমাদের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি ক'রেছে। আমাদের পথঘাট জলে ডুবে গেছে। স্রোতের বিপরীতে আমাদের নদীপথে চলাচল করতে হ'য়েছে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে ইম্ফল অধিকার করতে পারলে আমাদের সুবিধা হ'তো। এ-সত্ত্বেও আমাদের উপযুক্ত পরিমাণে বিমান থাকলে এবং প্রতিপদে শেষ সৈনিক পর্য্যন্ত লড়াই করার সংকল্প না করলে সাফল্য-

লাভ আমাদের ঘটতো। জানুয়ারী মাসে আমাদের অভিযান সুরু হ'লে আমরা সাফল্যলাভ করতে পারতাম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে সব রণাঙ্গণেই হয় আমরা শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছি না-হয় আমরা এগিয়ে গিয়েছি। কালাদান রণাঙ্গনে আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলুম। টিডিমেও আমরা অগ্রগমন করতে পেরেছি। প্যালেন ও কোহিমাতেও আমরা এগিয়েছি। হাকা রণাঙ্গনে আমরা শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছি। শত্রুপক্ষের প্রভূতপরিমাণে লোকবল ও রণসম্ভার থাকা সত্ত্বেও আমরা পূর্ব্বোক্ত সাফল্যলাভ করতে পেরেছি।

বৃষ্টি আরম্ভ হবার পর ইম্ফলের ওপর আমাদের পূরো আক্রমণ স্থগিত রাখতে হ'লো। শত্রুপক্ষ তাদের যান্ত্রিক সেনাদল পাঠিয়ে কোহিমা-ইম্ফল রোড পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হ'লো। এরপর আমাদের ভাবতে হলো, আমাদের সেনাদলকে আমরা কোন জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসাবো। দু'টো পথ খোলা ছিলো, হয়, বিষণপুর-প্যালেন রণক্ষেত্রে ঘাঁটি আগলে শত্রুকে এগোতে না দেওয়া, না-হয় পিছিয়ে এসে আরো সুবিধাজনক একটি ঘাঁটি নেওয়া।'

'এই অভিযান থেকে কি শিক্ষা আমরা লাভ করেছি? আমরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। যখন অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ঘটায় পিছিয়ে আসবার জন্যে আদেশ করা হয়েছিলো, তখন একদল অসামরিক লোক পিছিয়ে আসতে রাজি হয়নি, তারা বেয়নেট নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আর তারা জয় পতাকা বহন করে এনেছিলো।'

'আমাদের সেনাদল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি ব্রিটিশ সেনাদলের ভারতীয়রা আমাদের দলে এসে যোগ দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাদের আমাদের দলে আনবার জন্যে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। শত্রুপক্ষের কৌশল আমরা জানতে পেরেছি। আমরা শত্রুপক্ষের দলিলপত্র হস্তগত করেছি। সেনানায়করা অশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। অভিযান আরম্ভ হবার আগে আমাদের সেনাবাহিনীর

"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ৪ঠা নভেম্বর জাপানী প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কোইশোর সঙ্গে টোকিওতে আলোচনা সভায় মিলিত হন্। তিনি ঘোষণা করেছেন, গত বৎসর ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা তাদের যথাসর্ব্বস্ব সংগ্রহ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। এখন যুদ্ধ চরম স্তরে এসে পৌছেছে, শ্রীযুত বসু বলেন, তাই এই ভারতীয়রা তাদের শক্তি দ্বিগুণ ভাবে প্রয়োগ করে যথা সম্ভব শীঘ্র শত্রুপক্ষকে ছত্রখান্ ও বিনষ্ট করার জন্য উদ্‌গ্রীব।"

—ডোমাই নিউজ এজেন্সি, ৪ নভেম্বর, ১৯৪৪।

"গতকাল সন্ধ্যায় টোকিওতে ভারতীয়দের এক জনতাকে উদ্দেশ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেন, ফিলিপাইন ও তাইওয়ানের উপকূলে জাপানীদের এই অদ্ভুত সাফল্য যুদ্ধের গতি বদলে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে আজ আমরা যুদ্ধের তৃতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে পৌছেছি। প্রথম পর্য্যায়ে জাপান ও তার মিত্রবর্গ যুদ্ধে অশেষ সাফল্য অর্জ্জন করে এবং শত্রুপক্ষ পরাভূত হয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শত্রুরা পাল্টা আক্রমণ করতে আরম্ভ করে, সে আক্রমণ এখন শেষ হয়েছে। জাপান ও তার মিত্রপক্ষ এবার এই তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্য্যায়ের সমস্ত সুযোগ ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করবে।"

"ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে বর্মা-আত্মরক্ষা-বাহিনী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে জাপানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতার উল্লেখ করে নেতাজী বলেন, 'আমরা এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে আমরা স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে রক্তদান করতে প্রস্তুত আছি, আমরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করছি। এমন যুদ্ধে আমরা রক্ত দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকলে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আমাদের চরম সাফল্যের পথে বাধা দেবে।— ইঙ্গ-আমেরিকা জানে যে তারা কোনো উচ্চ আদর্শ নিয়ে লড়াই করছে না

অতএব তাদের আত্মিক শক্তি কিছু নেই। এই যুদ্ধ তারা শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে জয় করতে চায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের মত এ যুদ্ধও প্রমাণ করবে—শেষ-বেশ মানুষের মনোবলের কাছে অস্ত্রবল জয়ী হতে পারেনা। আমাদের শত্রুপক্ষ শুধুমাত্র অস্ত্রবলেই জয়লাভ করতে চায় বলে, তাদের রসদ ফুরিয়ে আসার আগেই খুব তাড়াতাড়ি তারা যুদ্ধটা শেষ করে দিতে চায়। তারা মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে, আর আমরা ধীর স্থির ভাবে অটলপ্রতিজ্ঞ হয়ে লড়াই করে চলেছি, এমন কি, সময়ও এখন ইঙ্গ-আমেরিকার বিপক্ষে। এ সংগ্রাম যতই কঠিন ও যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, চূড়ান্ত জয়ের পূর্ব্বে আমরা আমাদের অস্ত্র ত্যাগ কোরবো না। আমরা দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। শত শত বৎসরের চেষ্টায় ব্রিটিশেরা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, এক মাসের চেষ্টায় সেই দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে সময় লাগবে। ভারতবর্ষের মুক্তি পৃথিবীর পঞ্চমাংশের একাংশ মানবজাতির মুক্তি, এই বিরাট মহামানবের মুক্তির উপযুক্ত মূল্য আমাদের দিতে হবে।"

"জাপানী জাতিকে উদ্দেশ করে নেতাজী বসু বলেন, 'আমরা সব রকম বিপদে আপনাদের অনুসরণ করবো। আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যখন হয়েছি, তখন সহস্র বিপদেও সে প্রতিজ্ঞা পালন আমরা করবো। আপনারা যে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার প্রমাণ আপনাদের সাম্প্রতিক সাফল্যলাভ। শত্রুপক্ষ কখনই আপনাদের সাফল্যে বাধা দিতে পারবে না। আপনাদের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ অন্যান্য যুদ্ধরত জাতির মনোবল আরো বাড়িয়ে তুলেছে।"

—ফ্রী ইণ্ডিয়া রেডিও (সাইগন) ৪ নভেম্বর, ১৯৪৪।

"আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার-বক্তৃতায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান

রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। নেতাজী বলেন যে ভারতীয় জনসাধারণ প্রাচ্যের এই যুদ্ধ পরিচালনার কাজে জাপানকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য আগ্রহশীল। কিন্তু ভারত-বাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদও ভারতবর্ষের এই ঘরোয়া ব্যাপারে ইঙ্গ-আমেরিকার হস্তক্ষেপ ও উস্কানী ভারতের স্বাধীনতার পথে প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক। নেতাজী বলেন, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মিষ্টার জিন্নার মধ্যে আর একটি আলাপ আলোচনায় হয়ত দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনতে পারবে। শ্রীযুত বসু বলেন, মিষ্টার জিন্না পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার জন্যে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। কিন্তু মিঃ জিন্না হয়ত ঐটা ভেবে দেখেন নি যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করলে ভারতীয় জাতীয় শক্তিও বিভক্ত হয়ে যাবে এবং ইউরোপে বলকান্‌দের যে অবস্থা হয়েছে এখানেও তাই হবে। নেতাজী বসু আরো বলেন, 'মহাত্মা গান্ধী একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, এবং তিনি চান্‌ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে রাখতে। মহাত্মাজীর ও মিঃ জিন্নার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাঁদের মধ্যে ফাঁকা আলাপ আলোচনার সুরাহা কিছু হবেনা, কেবলমাত্র ভারতবাসী আরো পথভ্রান্ত হয়ে পড়বে।' শ্রীযুক্ত বসু আশা করেন এত বাধা বিপদ সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী দাসত্ববন্ধন থেকে ভারত-বাসীকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে।"

—টোকিও রেডিও (হিন্দুস্থানীতে) ৭ নভেম্বর, ১৯৪৪।

"আজাদ হিন্দ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়াবাসীদের উদ্দেশে নববর্ষের অভিনন্দনে জানাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প নতুন করে প্রকাশ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসী শেষ ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"

নেতাজী অতঃপর বলেন, "এটা স্বাভাবিক যে পুরাতন বিধান ধ্বংস ক'রে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর নব-বিধানের বনিয়াদ খাড়া করতে সময় লাগবে অনেক—এবং আরো অনেক সংগ্রাম প্রয়োজন হবে। ভারত-বাসীর ওপর যে কঠোর কর্ত্তব্যভার প'ড়েছে, আমরা তা অবগত আছি। আমরা জানি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কতটা পাকা বনে'দের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রিটিশরা কতটা ধূর্ত্ত জাত। আমরা এও জানি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সহযোগিতায় পুষ্ট তা বিনষ্ট করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গলদ ও ভারতবর্ষের বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদ ও আমাদের মিত্রপক্ষের শক্তির কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের জয় অতি নিকটে।"

—টোকিও রেডিও, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৫।

নেতাজীর কর্ম্মপ্রশস্তি

"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জাপানে উপস্থিতি ও প্রধানমন্ত্রী তোজো দ্বারা তার অভ্যর্থনা সম্বন্ধে Dentsche Diplomatlischo Korrespondenz পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এই ঘটনা য়্যুরোপ ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রবন্ধকার বলেছেন যে সুভাষচন্দ্র বসুই একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি এখনো মুক্ত আছেন। বার্লিন ও রোম নগরীতে শ্রীযুক্ত বসু ভারতের স্বাধীনতার একজন আদর্শ পুজারী হিসেবে সুপরিচিত হ'য়েছেন এর্বং এই দেশসমূহে তিনি অনেক বন্ধু-বান্ধবও লাভ করেছেন। অনেকবার তিনি রাইখ পররাষ্ট্র সচিব দ্বারা আমন্ত্রিত হ'য়েছেন এবং তারপরে ফুয়েরার ও ডুসেও তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রেছেন। য়্যুরোপে অবস্থানকালে তিনি এ বিষয় স্থির নিশ্চিত জেনেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্যে ত্রিশক্তিসংঘের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও একটী মিত্রপক্ষ। শ্রীযুত বসুর এদেশ ত্যাগ করায় জার্মাণী যদিও দুঃখিত,

তবুও যে কারণে তিনি পূর্ব্ব এশিয়ায় গিয়েছেন তার জন্যে জার্মাণী আনন্দিত। ভারতবর্ষ এখন জাপ-স্বার্থে জড়িত এলাকার প্রতিবেশী, দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানের অভূতপূর্ব্ব জয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন উদ্যম লাভ ক'রেছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায় শ্রীযুত বসুর সম্মুখে এখন অনেক জটিলতা সমাধানের ভার প'ড়েছে। জেনারেল তোজো সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ঘোষণা ক'রেছেন যে ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তির জন্য জাপান ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে সাহায্য করবে, এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার ঘটনাবলী থেকে একথা প্রমাণিত হ'য়েছে যে জাপান কথায় যা বলে কাজেও তা-ই করে। জাপানে সুভাষ বসুর যাবার উদ্দেশ্য এবং যেখানে তিনি গিয়েছেন সেখানেই তাঁর অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনালাভ নতুন করে প্রমাণ করছে যে এ যুদ্ধ আর ইঙ্গ-আমেরিকার যুদ্ধ নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে শ্রীযুত বসুর পূর্ব্ব-এশিয়ায় গমন ব্রিটিশদের কাছে ভাল লাগবে না। ভারতের পরিস্থিতি ব্রিটিশের অনুকূলে আর নেই। ভারতীয় সমস্যার সমাধানে ব্রিটিশরা যে অপারগ, বর্ত্তমানের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিলেই তা প্রমাণ হয়। নিজেদের বন্ধন মোচনের বলিষ্ঠ চেষ্টা আজ ভারতবাসীদের নিজেদেরই করতে হবে। আজ আর সন্দেহ নেই যে সে-কাজ সুরু হ'য়েছে। শ্রীযুত বসুর মত ভারতের দেশপ্রেমিক নেতার নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্তভাবে এবার ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে।

—বার্লিন রেডিও, ১৯ জুলাই, ১৯৪৩

"নিপ্পন টাইমস্ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় লিখেছে যে জাপানের জনসাধারণ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গকারী জাতীয়তা-বাদী নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে। নিপ্পন টাইমস্ আরো লিখেছে, প্রত্যেক এশিয়াবাসী এমন একজন স্বদেশভক্ত নেতার জন্য স্বভাবতই গর্ব্বিত। এই নেতা ৪০ কোটি

ভাবতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে মশাল জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছেন। জাপানের ও তার মিত্র পক্ষের অভাবনীয় জয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক চরম সুযোগ সমুপস্থিত। গত ৩০০ বৎসরের মধ্যে ভাইতবর্ষের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের এমন সুযোগ আর ঘটেনি। ব্রিটিশ শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতির এবং স্বাধীন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার এই সুযোগ ভারতবাসী ছাড়তে রাজি নয়। পূর্ব্ব-এশিয়ার নেতা হিসাবে জাপান চায় তার সমগ্র এশিয়ার প্রতিবাসীরা স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করে এবং সুখে সম্পদে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে—পূর্ব্ব-এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র পথ। এই পত্রিকাটি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সাম্প্রতিক এক বক্তৃতার প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, যখন তিনি ভারতবর্ষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবেন, এবং ভারতবর্ষকে যে দুর্ব্ব্যবহার ও অবিচারের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে সে কথা চিন্তা করেন তখন তাঁর অন্তরাত্মা করুণায় ও ঘৃণায় ভরে উঠে। সেইজন্যেই ভারতবর্ষ থেকে চিরদিনের মত ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করাই তার সংকল্প কেননা ভারতবর্ষের এই দৈন্য ও দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী একমাত্র ব্রিটিশ।"

—ফ্রী ইণ্ডিয়া রেডিও (সাইগন) ২১শে জুন, ১৯৪৩।

"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের রাজকীয় শাসন পরিষদের রাজনৈতিক সহায়ক সমিতি সম্মুখে যে বক্তৃতা ক'রেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখানকার বিখ্যাত সংবাদপত্র নিচিনিচি শিম্বুন নিম্নোক্ত মন্তব্য ক'রেছে :—জাপানে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আগমন গূঢ় অর্থপূর্ণ কেননা আমাদের এই জাপান বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার প্রধান সমর্থক। ভবিষ্যতে জাপান ভারতের জনসাধারণকে সর্ব্বাধিক সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদই জাপানের লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানব

জাতির কল্যাণের পথ সুগম করাই জাপানের উদ্দেশ্য। জাপান ও ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় এক, কেননা জাপান ও ভারতবর্ষ উভয়েই চায় বেয়াদপ ইঙ্গ-মার্কিনকে ধ্বংস করতে। শ্রীযুত বসু দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লেছেন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন শুধু মাত্র ভারতীয়দেরই প্রশ্ন এবং ভারতীয় জনসাধারণ দ্বারাই এই সংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব। শ্রীযুত বসু উত্তেজিত কণ্ঠে যে কথা ব'লেছেন, তা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না। তিনি ব'লেছেন—শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে, ভারতের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে, এবং এই আন্দোলন মারাত্মক রূপ নিতেও আর বেশি দেরী নেই। শ্রীযুত বসু বলেন 'আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য রক্তপাত চাই, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন করলে, সে স্বাধীনতা হবে না। অতএব আমাদের শত্রু বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে আমরা বদ্ধপরিকর হ'য়েছি। ব্রিটেন তার তরবারী খুলেছে, প্রত্যুত্তরে ভারতবর্ষও তার তরবারী নিষ্কোষিত ক'রেছে। আইন অমান্য আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেবে, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারবো, তখনই স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত বলে আমরা বিবেচিত হবো।' তাঁর স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ ক'রে নেতাজীর এই হ'চ্ছে জ্বালাময়ী বক্তৃতা।

"শ্রীযুত বসুর মত সুযোগ্য নেতা অবশেষে ভারতবর্ষ লাভ ক'রেছে। তিনি একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যেই প্রস্তুত, তিনি শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী। হে ভারতবাসী, এশিয়া তোমাকে এই মহান্ স্বদেশ প্রেমিকের নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করার জন্যে আহ্বান করছে। এই মহা সংগ্রামে, ভারতবাসী, তোমরা একক নও। জাপানী প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো জাপানী শাসন পরিষদের ভাষণে ঘোষণা করেছেন, জাপ সরকার শুধু যে তোমাদের সাহায্যই করবে, তা নয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। জাপানী জাতের এ

মহৎ উদ্দেশ্য আজ বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। য়্যুরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্ব্ব-এশিয়ায় তাদের শোষণ ও পীড়ন-নীতি বহাল রাখতে চেয়েছিল, জাপানীরা সেখানে নববিধানের সূত্রপাত করেছে। যখন বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথে অগ্রগমন ক'রে চলেছে, ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতার জন্যে উৎপীড়ক ব্রিটিশের নাগপাশ ছিন্ন করার সংগ্রামে লিপ্ত। ভারতবর্ষ যে শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, এই কথা ভেবে জাপানী সরকার ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে—যাতে চির আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জ্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়। প্রধান মন্ত্রী তোজো আরোও ঘোষণা করেন যে ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হবার দিন আর দূরে নয়। শ্রীযুত সুভাষ বসুকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি জাপান দিয়েছে। ভাবতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যেই এই সাহায্য দিতে জাপান উদ্‌গ্রীব। জাপান তার কথা ঠিক রাখবে। হে ভারতবাসী, জাগো। জাপানের ও পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিবাসীরা তোমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেবার জন্যে প্রস্তুত।

টোকিও রেডিও, ২৪ জুন ১৯৪৩

'স্বাগত সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নিপ্পন টাইমস্‌ লিখেছে—স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের অধিনায়ক শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রকে জাপান সাদরে অভ্যর্থনা করছে। এক বছর পরে আজ তিনি প্রথম টোকিওতে এসেছেন। তিনি উচ্চপদ-অধিকারী বলে সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে না, ভারতবর্ষের দৃঢ়সংকল্পের প্রতীক হিসেবে তিনি যে সাহস ও কর্ম্মক্ষমতার নিদর্শন দিয়েছেন তারি প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের এ চিহ্ন। যে আজাদ হিন্দ সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সুষ্ঠুভাবে তার পরিচালনা করেছেন তিনি, এবং ক্রমশই তা আরো দৃঢ়

ও কার্য্যক্ষম হয়ে উঠ্‌ছে। অগণ্য ভারতীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহ-যোগিতাও তিনি পেয়েছেন। এশিয়ার মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় সেনাদল সম্মুখ-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, তারা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছে এবং সগৌরবে এর মহিমা প্রচার তারা করেছে।

সংবাদ পত্রটি আরো লিখেছে: "এক বছর আগে যে অস্থায়ী সরকার ছিল শুধুমাত্র সম্ভাবনা, আজ সে সম্ভাবনা পূর্ণ হয়েছে এবং ক্রমশই তা লক্ষ্য পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই জন্যেই, সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুণ এই সাফল্যের জন্যেই জাপান তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। সেইজন্যেই "শ্রীযুত বসু যখন তাঁর এক বছরের পরিশ্রমের জয়মাল্য কণ্ঠে কণ্ঠে ধারণ ক'রে জাপানে এসেছেন, জাপান তখন তাঁকে বীরের সম্মানে সম্মানিত করেছে ও সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে গত বছরের মত বরাবর জাপান তার সহযোগিতা ও সাহায্য দিয়ে যাবে যতদিন না ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে এবং জাপান ও পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের স্বাধীনতা বিপদহীন ক'রে তুলতে পারে।

ডোমাই নিউজ এজেন্সি, ২রা নভেম্বর, ১৯৪৪।

"এক বছর বাদে তাঁর পরিদর্শনের উপলক্ষ্যে জাপানী সেনাবাহিনী ভারতীয় নেতা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। জাপানী জাতি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর কর্ম্মদক্ষতা ও সক্ষম নেতৃত্বের জন্য শ্রদ্ধা করে। নেতাজী যে পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন এজন্য জাপান আন্তরিকভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। গত এক বছরের মধ্যে নেতাজী ও তাঁর সেনাদল পূর্ব্ব-এশিয়ার সংগ্রামে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জ্জন ক'রেছেন। এই সাফল্যের জন্যেই সমগ্র জাপানী জাতি নেতাজীর জাপানে আগমনের জন্যে আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছে।"

"পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানই একমাত্র স্বাধীন দেশ, তাই স্বাধীনতার পূজারী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জাপান সম্মান করে। তিনি তাঁর

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যথাসর্বস্ব পণ ক'রেছেন, নেতাজীর এই মনোভাবকে জাপান শ্রদ্ধা করে।"

—টোকিও রেডিও, ২ নভেম্বর, ১৯৪৪

"গত সন্ধ্যায় (৪ঠা নভেম্বর) জেনারেল কোইশো সুভাষচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রীযুত বসু এখানে সরকারী কাজে এসেছিলেন। তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এক ভোজ সভার আয়োজন হয়। এই সভায় জেনারেল কোইশো শ্রীযুত বসু ও তার দলবলকে শ্রদ্ধেয় অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করেন এবং অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যত উন্নতির জন্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। জেনারেল কোইশো বলেন: 'গত বছর ২১এ অক্টোবর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপরাপর স্বদেশভক্ত ভারতীয় দ্বারা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানারকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই সরকার সংগ্রাম করে চলেছে—তাদের যুদ্ধোদ্যমে বিরতি নেই, উৎসাহে কোনোরকম শৈথিল্য নেই। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যে আমি শ্রীযুত বসু ও অস্থায়ী সরকারের অন্যান্য সভ্যদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি পূর্ব্ব-এশিয়ায় অনেক দেশ করায়ত্ত করে সেখানকার অধিবাসীদের দাসত্ব শৃঙ্খল পরিয়েছে এবং তাদের অস্ত্রবল প্রয়োগ ক'রে চ'লেছে: পূর্ব্ব-এশিয়ায় তাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে তারা ভূয়ো সভ্যতা আমদানী ক'রে প্রাচ্যের ঐতিহ্য নষ্ট ক'রে তাদের চির পদানত ক'রে রাখতে চায়।"

"জেনারেল কোইশো আরো বলেন: ইঙ্গ-মার্কিণদের এ দেশ চির পদানত রাখবার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও জাপান পূর্ব্ব-এশিয়ার আত্মরক্ষার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করে চ'লেছে। বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ১০ লক্ষ অধিবাসী তাদের জাতীয় গৌরবে গরীয়ান হ'য়ে দাঁড়ায় এবং ইঙ্গ-আমেরিকার আক্রমণকে বিপর্য্যস্ত ক'রে

দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। আমি ভারতবর্ষের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করছি, এই মহাদেশ বহু বছর যাবৎ ব্রিটিশ শোষণের হাতে যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ভোগ করে আসছে। আর একজন এশিয়াবাসী হিসেবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের নিষ্ঠুর শোষণ নীতির জন্যে আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুত বসু ও তার অস্থায়ী সরকারের অন্যান্য সদস্য স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের মনে প্রেরণা এনে দেবেন। এই প্রেরণার বলে তারা ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশকে উচ্ছেদ ক'রে ভারতবর্ষকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে।"

"জেনারেল কোইশো আরো বলেন: অস্থায়ী সরকারের ক্রমোন্নতি দেখার জন্য এবং অবিলম্বে এর লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে জাপান অস্ত্রশস্ত্র ও নৈতিক সাহায্য দিয়ে এই সরকারকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুলতে চায়। বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ায় মিলিত ঘোষণার বার্ষিক উৎসব আগামী পরশু। সেই ঘোষণার পাঁচটা সূত্রের মূল কথা এই—ব্রিটিশ ও আমেরিকান-আক্রমণে গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ যে পূর্ব্ব-এশিয়া বিপর্য্যস্ত হ'চ্ছে, তাকে পূর্ব্ব-এশিয়াবাসীদের হাতে পুনরুদ্ধার করা। কয়েকটা ঘোষণা থেকেই এ-কথা স্পষ্ট হ'য়েছে যে জাপান ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নব বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই যত্নবান।"

"বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ চরম পর্য্যায়ে উপনীত হ'য়েছে এই কথার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, যে তাইওয়ানের উপকূলে এবং ফিলি-পাইনের সমুদ্র যুদ্ধে এবং লিটির চারিপাশের যুদ্ধের গতি দেখে জাপান নয়, সমগ্র এশিয়াবাসী আজ আনন্দিত। আমরা যদিও এটা জানি যে, শত্রুপক্ষ তার বল সঞ্চয় করে তাদের শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ এবং বিমানবহর নিয়ে বার বার আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। চূড়ান্ত জয় পর্য্যন্ত জাপান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এর জন্যে সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ সে করবে এবং তার মিত্রবর্গের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সে মিলিত হবে।

"এই কথা ব'লে জেনারেল কোইশো তার বক্তব্য শেষ করেন—'আমি বিশ্বাস করি শ্রীযুত বসু জাপানের প্রকৃত শক্তি ও প্রকৃত মনোভাব বিশ্বাস করবেন। এবং যে কঠিন সংগ্রামই হোক না কেন, আমাদের সহযোগিতায় তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তা করবেন। সেই সঙ্গে আমি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের ক্রমোন্নতির জন্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এখন আমি কি আপনাদের His excellency সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের জন্যে প্রার্থনা ক'রে আপনাদের প্ল্যান গ্রহণ করতে বলতে পারি?"

—ডোমাই নিউজ্ এজেন্সি, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪৪।

"নিপ্পন টাইমস্ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম্মক্ষমতার প্রশংসা ক'রে তার কৌশলকে প্রায় অতিমানবীয় আখ্যা দিয়েছে। আজ, ভারতীয় সংগ্রামের এই বীরের প্রতি সমগ্র জাপান সশ্রদ্ধ চোখে তাকাচ্ছে। জাপানী ও ভারতীয় যোদ্ধার মিলিত রক্তে এই দুই জাতির একই উদ্দেশ্য সাধন ব্রত আজ সার্থক হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত বসু আজ নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে জাপান ভারতবর্ষের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে যাবে। এবং এ লড়াই চলবে ততদিন, যতদিন না ভারতবর্ষও জাপানের মত একটা স্বাধীনরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

—বার্লিন রেডিও, ৭ই নভেম্বর ১৯৪৪।

"পররাষ্ট্র সচিব ও বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার সচিব মামুরা শিগেমিট্সু তার পররাষ্ট্র দপ্তরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রধানকর্ত্তা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও তার অন্যান্য সহকর্ম্মীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন—যে, শ্রীযুত বসুর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়বাহিনী পূর্ণ জয়লাভ করবেই। শিগেমিট্সু বলেন, অতীতে জাপান যেমন অঙ্গীকার করেছে, সেই অঙ্গীকার অনুসারে জাপান ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য দান করবে। সভায় বিশিষ্ট জাপানী ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"তার বক্তৃতার প্রথমে শ্রীযুত বসুকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে মিঃ শিগেমিট্‌সু বলেন—আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে শ্রীযুত বসু এক দিন দর্শক হিসেবে বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতীয় সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের ও ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব বিনাশের সংকল্প প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে শ্রীযুত বসুর দৃঢ়তার জন্য তাকে প্রশংসা করে মিঃ শিগেমিট্‌সু বলেন, শ্রীযুত বসু Indian Civil Service-এর পদগ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পোষা কুকুর হয়ে থেকে ভোগলালসার পথ বর্জ্জন করে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছেন।"

"তিনি আরো বলেন, শ্রীযুত বসু বৃটিশের Divide and Rule নীতি সম্বন্ধে খুব ভাল ভাবেই জানান এবং এও জানান যে এ নীতি অস্ত্রবলের প্রয়োগেই চলে আসছে। তাই তিনি শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। সেইজন্যই তিনি এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পলায়ন করে তিনি ন্যায়ের পতাকা উড়িয়েছেন। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আবির্ভাব সমগ্র পৃথিবীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ব্রিটিশ জাতির হৃদয়ে আতঙ্কের সূত্রপাত করেছে। আমি, স্থির নিশ্চিত জানি—শ্রীযুত বসুর নেতৃত্বে ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী চরম সাফল্যলাভ করবে। আমি আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে জাপান ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে তার যথাসম্ভব সাহায্য দান করবে।"

—ডোমাই নিউজ এজেন্সী—১১ই নভেম্বর ১৯৪৪

"সুভাষ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণের ওপর এক প্রবন্ধে নিচিনিচি শিম্বুন পত্রিকা লিখেছে—নিজের মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে শ্রীযুত বসু তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; আজ তিনি লোকান্তরিত। পত্রিকাটী

আরো লিখেছে—বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার মিলিত উন্নয়ণ পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং জাপান যথাসম্ভব সাহায্য দান করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিল। কিন্তু জাপান আজ পরাজিত—যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা শ্রীযুত বসুর উদ্দেশ্যে এইজন্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি যে তিনি তার মাতৃভূমির জন্যে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, এবং জীবনে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।"

—টোকিও রেডিও, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৫।

স্বপ্নশেষ

১৯৪৫ সালের ২৪এ এপ্রিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রেঙ্গুন ত্যাগ করে ব্যাংকক যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করেন—

"বর্মায় অবস্থিত আমার বর্মী ও ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি,

"হে ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমি অতীত দুঃখের সহিত বর্মা ত্যাগ করিতেছি। আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু এটা কেবল প্রথম প্রচেষ্টারই অকৃতকার্য্যতা। আমাদের আরো অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। একবার বিফল হওয়া সত্ত্বেও হতাশ হইবার কোন কারণ আমি দেখি না।"

"হে আমার বর্মাস্থিত স্বদেশবাসীগণ! আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রতি যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আপনাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছে। আপনারা মুক্তহস্তে অর্থ, ধন ও জনবল দান করিয়াছেন। সামগ্রিক যুদ্ধোদ্যমের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন আপনারা। কিন্তু আমাদের বিপক্ষে বাধাবিপত্তি ছিল অজস্র, অতএব বর্মার যুদ্ধে সাময়িকভাবে আমাদের হার হইয়াছে।"

"নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগের যে স্পৃহা আপনারা দেখাইয়াছেন, বিশেষ করিয়া বর্মায় আবার হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করিবার পর,—যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন আমি তাহা ভুলিতে পারিব না।"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—পীড়নে বা দলনে মানুষের আত্মচেতনা দমন করা যায় না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি সানুনয়ে আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শির উন্নত রাখুন, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আবার এক সংগ্রামের শুভদিন অচিরেই আসিবে।"

"যখন ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হইবে, তখন বর্মাস্থিত ভারতীয়দের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

"আমি নিজের ইচ্ছায় বর্মা ত্যাগ করিতেছি না। এখানে থাকিয়া এই পরাজয়ের বেদনা আপনাদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবারই ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু মন্ত্রিগণের ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মীদের উপদেশ মত আমাকে বর্মা ত্যাগ করিয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। আমি জন্ম-আশাবাদী। অচিরে ভারতের মুক্তি সম্বন্ধে আমার আশা আজো অটুট আছে। আমিও আপনাদের অনুরূপ আশায় বিশ্বাসী হইতে অনুরোধ করি।"

"বরাবর আমি বলিয়া আসিয়াছি যে প্রত্যূষের পূর্ব্বেই গাঢ় অন্ধকার আসে। আমরা এখন অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতেছি। অতএব এ রাত্রি ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই।"

ভারতবর্ষ অবশ্যই স্বাধীন হইবে

"আমার কথা শেষ করিবার আগে বর্মার জনসাধারণ ও বর্মার সরকারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া আমি পারি না। এই সংগ্রাম পরিচালনার সময় তাঁহাদের নিকট আমি অনেক সাহায্য ও সহ-

যোগিতা লাভ করিয়াছি। সেদিন অচিরেই আসিবে, যখন স্বাধীন ভারত বর্মার এ ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত শোধ করিবে।"

"ইন কিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ"

স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ ফৌজ

"আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী অফিসার ও সৈনিকগণ!

"আজ অতীব বেদনার সহিত আমাকে বর্মা ত্যাগ করিতে হইতেছে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে যে বর্মায় তোমরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছ এবং এখনো যেখানে যুদ্ধ করিতেছ—সেই বর্মা আজ আমি ছাড়িয়া যাইতেছি। ইম্ফলে ও বর্মায় আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টায় পরাস্ত হইয়াছি। ইহা প্রথম প্রচেষ্টা মাত্র। আরো অনেক সংগ্রাম আমাদের করিতে হইবে। আমি জন্ম-আশাবাদী, কোনো অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইতে রাজি নাই। ইম্ফলের উপত্যকায়, আরাকানের পর্ব্বতে ও অরণ্যে এবং বর্মার তৈলখনি-অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে তোমাদের অসম সাহসিকতার সহিত লড়াই-এর কথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।"

"বন্ধুগণ! এই দুর্য্যোগের মুখে আজ আমি শুধুমাত্র একটী আদেশ তোমাদের দিতে পারি—যদি সাময়িকভাবে তোমাদের পরাজয় বরণই করিতে হয় সে পরাজয় বীরের মত গ্রহণ করিও, আত্মসম্মান ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়া চলিও। তোমাদের এই ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের দরুণ যে ভবিষ্যৎ বংশধর স্বাধীন মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিবে—যারা কৃতদাস হিসাবে আসিবে না—তারা তোমাদের প্রশস্তি গান করিবে, এবং জগতের সম্মুখে সগৌরবে প্রচার করিবে যে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ আসাম, মণিপুর ও বর্মায় সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে।"

"ভারতের স্বাধীনতায় আমার অটল বিশ্বাস আজো অটল আছে।

আমি আজ তোমাদের হাতে তোমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, তোমাদের জাতির সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধার মর্য্যাদা রক্ষার ভার দিয়া বিদায় লইতেছি। আমার ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে ভারতীয় জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য তোমরা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগের যোদ্ধারা, তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি জীবনদান করিতেও দ্বিধা করিবে না। ইহাতে অন্যান্য রণাঙ্গণে তোমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ যখন যুদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন তোমাদের ব্যথা স্মরণ করিয়া তাহারা নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইবে।

"আমি যদি নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই পরাজয়ের বেদনা তোমাদের সঙ্গে সমভাবে ভাগ করিয়া লইবার জন্য আমি এখানেই রহিতাম। কিন্তু আমার মন্ত্রিবর্গ ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপদেশ অনুসারে বর্মা ত্যাগ করিয়া আমাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। ভারতবর্ষের ও পূর্ব্ব-এশিয়াস্থ আমার স্বদেশবাসীকে আমি জানি বলিয়া এটুকু আমি বলিতে পারি যে কোনো অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ তাহারা চালাইয়া যাইবে, অতএব তোমাদের এ দুঃখ কষ্ট আত্মত্যাগ বিফলে যাইবে না। আমার নিজের কথা এইমাত্র বলিতে পারি যে ১৯৪৩ সালের ২১এ অক্টোবরে যে প্রতিশ্রুতি আমি গ্রহণ করিয়াছি আমি সে প্রতিশ্রুতিতে চিরদিন আবদ্ধ রহিব—আবার ৩৮ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি তোমাদের নিকট এই আবেদন করিতেছি—তোমরাও আমার মতই এই আশা পোষণ কর এবং আমার মত এই বিশ্বাস রাখ যে প্রত্যূষের পূর্বেই অন্ধকার বিরাজ করে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই—অচিরেই সে স্বাধীন হইবে।"

"ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ!"

স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫

সর্ব্বাধিনায়ক, আজাদ হিন্দ ফৌজ

পরিশিষ্ট (১)

জেনারেল তোজোর ঘোষণা

১৯৪২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাউস অব পীয়ার্স-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করেন :—

"বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। এই ভারতবর্ষ তার কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আর সভ্যতা নিয়ে নির্দ্দয় ব্রিটীশ শাসন থেকে মুক্তি এবং বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলে যোগদানের চেষ্টা করছে। জাপানী সাম্রাজ্য চায় ভারতবর্ষ হোক ভারতীয়দের ভারতবর্ষ। জাপান চায় ভারত তার পূর্ব্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হোক। এই কাজে জাপান তাকে সকল দিক থেকে সকল রকম ভাবে সাহায্য করবে। যদি ভারতবর্ষ তার ইতিহাস আর ট্রাডিসনকে উপেক্ষা করে, যদি সে ব্রিটীশ শক্তি আর তার প্রচারকার্য্যের কাজে আত্মসমর্পণ করে তাকে অনুসরণ করতে থাকে, তা হ'লে এই ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ হারাবার জন্যে আমার দুঃখ বোধ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।"

১৯৪২ সালের ১২ই মার্চ জেনারেল হেদেকী তোজো ডায়েটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথা ঘোষণা করেন :—

"আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে "ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই জন্যে।" এইটাই ভারতের ৪০ কোটী জনসাধারণ এতদিন আশা করছিল এবং শীঘ্রই এই সত্য কার্য্যকরী হতে চলেছে। ব্রিটেন ভারতীয়দের বঞ্চনা করছে এবং বার বার জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে দমন করছে। গত প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করবে

বলেছিল। কিন্তু তারপর থেকে কি ঘটেছে? আমি বিশ্বাস করি যে, সে কথা ভারতের জনসাধারণ এখনও স্মরণ রেখেছে। এখন ব্রিটেন আবার মিষ্টি কথা দিয়ে ভারতীয়দের বঞ্চনা করছে। যদি ভারতীয় নেতারা ব্রিটেনের মধুর কথায় প্রতারিত হ'য়ে এই ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ হারাণ, তা' হ'লে আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষ কখনই স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না। ব্রিটীশ আশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত হওয়া ছাড়া চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর আর কোন সর্ব্বনাশ চিন্তা করাও যায় না। ভারতের পক্ষে গৌরবজনক কি? দাঁড়িয়ে এখন স্বাধীন ভারতের জন্য যুদ্ধ করা এবং বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া—সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা অথবা ব্রিটেন আর আমেরিকার জোয়াল কাঁধে নিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্য্যন্ত ক্রীতদাসে পরিণত করার ব্যবস্থা করা? এখন ভারতকে অতীত ভুলে যেতে হবে এবং সম্মুখের গুরুতর বিপদের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।"

১৯৪২ সালের ৬ই এপ্রিল জাপানী ডায়েটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জেনারেল হেদেকী তোজো বলেন:—

"জাপানী সৈন্যেরা সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুন অধিকার করেছে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও এখন তাদের কবলে। পূর্ব্ব ভারতীয় মহাসাগরে এই আন্দামানের অবস্থান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই সৈন্যবাহিনী ভারতের ব্রিটীশ সামরিক ঘাঁটীর ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। জাপানী সাম্রাজ্য ব্রিটেন আর আমেরিকাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদি এখনও ভারত ব্রিটেনের সামরিক প্রভুত্বের অধীন থাকে, তা হ'লে জাপানী সেনাবাহিনী ভারতে অভিযান চালাতে বাধ্য হবে, কারণ তারা ব্রিটেন আর আমেরিকাকে রসাতলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতের চল্লিশ কোটী জনসাধারণের কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা জাপানী সাম্রাজ্যের নেই এবং তারা ভারতের জনসাধারণকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে অব্যাহতিই দিতে চায়। আমরা জাপানী—আমাদের ভারতের

জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি আছে। আমি ইতিপূর্ব্বেই ১২ মার্চের ডায়েটে যে বক্তৃতা দিয়েছি, তাতেই আমি ভারতের জনসাধারণের প্রতি জাপানের আন্তরিকতা জ্ঞাপন করেছি। আজ ভারতবাসীর ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা এবং ভারতকে তার অতীত গৌরবে ভূষিত করার চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। এখন যখন ভারতে ব্রিটীশ প্রভুত্ব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় নেতারা এবং ৪০ কোটী জনসাধারণ আর ব্রিটেনের মিষ্টি কথায় প্রতারিত হবেন না। মিষ্টি কথায় ভুললে পতন অবধারিত। যুদ্ধের মধ্যে যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয় তার জন্য আপনাদের ব্রিটেনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা এবং স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আপনাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।"

ডায়েটের ৮২তম অধিবেশনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হেদেকী তোজো নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

"ব্রিটেনের নিষ্ঠুর দমননীতিতে পিষ্ট ভারতবর্ষ একটা ভয়াবহ অবস্থার ভেতর দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে চলেছে। ভারতের এই অভিযানের প্রতি আমার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আছে। জাপান ভারত থেকে ভারতবাসীর শত্রু এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাব অপসারিত এবং ভারতের সত্যকার স্বাধীনতা দান করার জন্য তার সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি স্থির বিশ্বাস নিয়ে অদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি যেদিন ভারতের জনসাধারণের ঐকান্তিক বাসনা সফল হবে—তারা স্বাধীনতা ও সম্পদ লাভ করবে।"

টোকিও রেডিও (জাপানী ভাষায়), ১৬ই জুন, ১৯৪৩।

৫ই জুলাই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের উদ্যোগে শোনানে যে জনসভা হয় তাতে জেনারেল হেদেকী তোজো এই বাণী দান করেন :—

"পূর্ব্ব-এশিয়ায় নূতন যুগের সূচনা হবে, যখন দীর্ঘ দিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হবে এবং ভারতবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে যে স্বাধীনতা কামনা করে আসছে তা সফল হবে। বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় নেতারা তাঁদের বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং নৈতিক দিক থেকে তাঁরা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুতি শেষ করেছেন। ব্রিটেনও অপর পক্ষে শেষ পন্থা হিসেবে ভারতে প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর দমননীতি প্রয়োগ করছে; অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের দিকে শয়তানী হস্ত প্রসারিত করছে। সুতরাং এই সময়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ ভারতের পক্ষে সহজ নয়। তাই এখন ৪০ কোটী ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং দরকার হলে সম্মুখে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আসছে তার জন্য রক্ত দান করতে হবে। জাপান বহুবার বলেছে যে ভারতে ব্রিটীশ প্রভুত্ব উচ্ছেদ ক'রে ভারতবাসীর ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য জাপান সাহায্য করবে। অন্য কথায় বলতে গেলে জাপান ভারতের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের জন্য তার সমস্ত শক্তি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবে। জাপানের এটা আন্তরিক ইচ্ছা যে, ভারতীয়েরা ভারতের অভ্যন্তরেই থাক আর ভারতের বাইরেই থাক তারা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করুক স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং ঠিক একই সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে এ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভাব অপসারিত করুক। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভারতে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে এই ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ ক'রে ত্রিদলীয় শক্তিকে সহযোগিতা দান করতে হবে।"

জেনারেল তোজোর বাণীর উত্তরে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করা হয়:—

"বন্ধুত্বপূর্ণ ও উদ্দীপনাময় বাণীর জন্য জাপানের মহামান্য প্রধান

মন্ত্রীকে এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাপানী জাতিকে এই নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা এ্যাংলো স্যাক্সন শক্তি যতদিন না নিশ্চিহ্ন হয় ততদিন জাপান এবং অন্যান্য চক্রশক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ ক'রবো।"

টোকিও রেডিও, ৫ই জুলাই, ১৯৪৩

জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ভারতবর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের জোঁয়াল থেকে ভারত মুক্তি লাভের যে চেষ্টা করেছে তাতে জাপানের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতে গুরুতর পরিস্থিতিই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার এবং পূর্ণ সমর্থন দান অপরিহার্য্য করে তুলেছে। তিনি অন্যান্য শক্তির কাছে আবেদনে ভারতকে স্বাধীনতা লাভের পবিত্র প্রচেষ্টায় যে জাপান সাহায্য করছে তাকে সহযোগিতা করতে বলেন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হেদেকী তোজো ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিপুঞ্জের পরিষদে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের নেতা মাননীয় মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু যে বক্তৃতা করেছেন তাতে কেবল ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া নিঃসন্দেহে উদ্দীপনা লাভ করেছে। এই বক্তৃতায় মাননীয় মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতের জনসাধারণ ভারত ও এশিয়ার ভবিষ্যৎ অন্তরে অঙ্কন করে তাদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভের জন্য দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্ব্বে বহু বিবৃতিতে জাপানী সাম্রাজ্য পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে যে তারা আমেরিকা ও ব্রিটেনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার সংগ্রামে ভারতবর্ষকে যথা সম্ভব সাহায্য দান করবে। এখন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। এবং এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতের স্বদেশ

প্রেমিকরা অভূতপূর্ব্বভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে তাদের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য। এই সময়ে আমি একথা ঘোষণা করছি যে জাপান তার সহযোগিতার প্রথম নিদর্শন হিসাবে জাপানী সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে জাপানের গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ভূভাগ হিসাবে অর্পণ করবেন। সমস্ত জনসাধারণকে স্ব স্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—জাপানের জাতীয় জীবনের এই যে মহান নীতি তা দ্রুত কার্য্যকরী করা হচ্ছে। বর্ত্তমানে জাপানী সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা দানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয়েরা সেই দিকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করছে—এটা দেখবার জন্য জাপান উৎসুক। গতকল্য এবং আজকার অধিবেশনে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মাননীয় প্রতিনিধিরা যে দৃপ্ত ভাষণ দান করেছেন তা থেকে আমি এই বিশ্বাস অর্জ্জন করেছি যে তারা সবাই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করবেন। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা ভবিষ্যতে এ থেকেও এই কাজে আরও বেশী সাহায্য দান করবেন।

—টোকিও রেডিও ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৩।

পরিশিষ্ট (২)

জাপান এবং ভারতবর্ষ

১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল অপরাহ্ণে ইনফরমেশান ব্যুরোর দ্বিতীয় মন্ত্রী মেজর জেনারেল মাসাও যোশিজুমি জাপানী ভাষায় "ভারতের জনসাধারণের নিঃশব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন লক্ষ্য করা উচিত"—এই নামে এক বেতার বক্তৃতা দেন। পরে এই বক্তৃতা হিন্দুস্থানী এবং মালয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হ'লো:—

"ব্রিটীশ তার নিজের স্বার্থে ভারতের জনসাধারণকে উৎসর্গ করছে, ভারতের জনসাধারণের ধূর্ত্ত ও প্রতারণা পূর্ণ প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না, বরং তাদের ভারতের জনস্বার্থের দিক থেকে এই প্রচারকার্য্য বিচার ক'রে দেখতে হবে। বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার এই যুদ্ধে জাপান এশিয়ায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা চায় এবং সে চায় ভারতের স্বরাষ্ট্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে। নিজের আত্মরক্ষার জন্যই ব্রিটেন জাপানাত্মক প্রতিরোধের জন্য ভারতকে চীয়াং-কাই-শেকের সাহায্য করতে বাধ্য করছে। এটা ব্রিটেনের স্বাভাবিক বিশ্বাসঘাতকতা; নিজের রক্ষার জন্য অপরকে উৎসর্গ করবার নীচ মতলব। এর দ্বারা সে চুংকিং আর ভারতবর্ষ উভয়কে যুগপৎ ভাবে প্রতাড়িত করছে। যদি ভারতবাসীগণ নিজেরা ক্ষমতার লক্ষে পৌছিবার জন্য চাপ দেয় তা হ'লে ব্রিটীশেরা তা রোধ করতে পারে না। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এই অবস্থায় ব্রিটেন তার শেষ তাস ফেলতে পারে অর্থাৎ ভারতীয় নেতাদের দিয়ে জোর করেন ব্রিটেনের নিজের মতলব হাসিল করে নিতে পারে। তাই ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সাহসের সঙ্গে ব্রিটেনের এই চক্রান্ত ও স্বৈরাচারে বাধা দেবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

* * * *

শোনানে এক জনসভায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান পরামর্শদাতা মিঃ রাসবিহারী বোস বলেন:—"আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যারা ভারতের বাইরে আছে, তারা এখন ব্রিটীশ শাসনের কবল থেকে স্বদেশবাসীদের রক্ষার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগে যা ছিল না, এখন সেই উৎসাহোদ্দীপক জিনিস রয়েছে, এবং তা হচ্ছে আমাদের শক্তিশালী মিত্র জাপানের সাহায্য। আমাদের মহৎ প্রচেষ্টায় জাপান সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি নিজে শুনেছি, জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হেদেকী তোজো ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন

এই জন্যেই এবারে আমি চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। গ্রহ, নক্ষত্র এখন আমাদের অনুকূল এবং শত্রুর প্রতিকূল। অতীতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতকে একা লড়তে হয়েছে, কিন্তু এবারে ভাগ্যদেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হাসি হেসেছেন। জাপান এবং অন্যান্য চক্রশক্তি আমাদের মিত্র। আমরা আজ এমন যুদ্ধ করবো যা অতীতে আমরা করিনি। আমাদের লড়াই কেবল আমাদের স্বাধীনতার জন্যে নয়, যে পৃথিবী দীর্ঘদিন এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির ব্যাভিচারে উত্যক্ত হয়ে উঠেছে সেই পৃথিবীতে ন্যায় এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই আমাদের লড়াই।"

—টোকিও রেডিও, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*　　　*

জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হেদেকী তোজোর সম্বর্দ্ধনা সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেন:—"আপনার শুভ উপস্থিতি আমাদের নূতন উৎসাহ দান করেছে এবং আমাদের জন্মভূমিকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করেছে। এই সমস্ত সৈন্য (ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) যদিও তাদের বিপদ সম্বন্ধে সজাগ এবং তাদের কি কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে সে সম্বন্ধে অবহিত, তবু ও তারা জানে যে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে সাহায্য দান করবে জাপান এবং তার মিত্র শক্তিগুলি। আমি আমার সেনাবাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমারা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধে সহযোগিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সিঙ্গাপুর রেডিও, ৯ই জুলাই, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাপানেরও সংগ্রাম। এটা ভারতেরই শেষ সংগ্রাম নয়, জাপানেরও শেষ সংগ্রাম।' এই কথাই জাপানী

গভর্ণমেণ্টের জনৈক মুখপাত্র মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের বাৎসরিক স্মরণীয় দিনে ঘোষণা করেছেন। উক্ত মুখপত্র আরও বলেছেন—'বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চল গঠন করতে ভারতের মুক্তি অপরিহার্য্য এবং এ কাজ সমস্ত এশিয়াবাসী পরস্পরের সহযোগিতায় সম্পাদন করবে। এই জন্যই এশিয়ার সমগ্র জনসাধারণ ভারতীয় জনসাধাণকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

বার্লিন রেডিও, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

কোনও কোনও ভারতীয় এই ধারণা পোষণ করতে পারে যে ব্রিটেনের কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পেলে জাপান বা জার্ম্মাণী ভারতবর্ষ গ্রাস করবে। যদি এইরূপ ধারণা থেকে থাকে তা হ'লে তা থেকে হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই নেই। জাপানের ভূতপূর্ব্ব দূত এবং বর্ত্তমানে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনৈতিক পরামর্শদাতা মিঃ শিরোটোয়াই ১৯৪৩ সালের ১০ আগষ্ট, এই কথা ঘোষণা করেন—

মিঃ শিরাটোয়াই আরও বলেন যে "চীনে জাপানের যে কোন সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা নেই, তা চীনের সঙ্গে তার বর্ত্তমানে ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারা যায়। ভারতবর্ষের বেলায়ও একই কথাই প্রযোজ্য।"

টোকিও রেডিও, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৩।

* * *

"পূর্ব্ব-এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান পরামর্শদাতা মিঃ রাসবিহারী বোস টোকিও-তে ২রা অক্টোবর ভারতীয় জনসাধারণকে উদ্দেশ করে যে বেতার বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি জাপানের মতলব এবং সমস্ত সন্দেহ সম্পর্কে তাদের মনকে রাখতে বলেন। তিনি বলেন যে, জাপান পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সেই জন্যেই ভারত থেকে ব্রিটীশদের বিতাড়নে সে

সাহায্য দান করবে এবং ব্রিটীশ বিতাড়নের পর ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের অধিকারে আসবে। মিঃ রাসবিহারী বোস এই কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন যে, জাপানের আন্তরিক আশ্বাস ভারতবাসীদের বিশ্বাস করতে হবে, কারণ জাপান আন্তরিকভাবেই ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করে। তাই ভারতীয়দের একযোগে পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে এ্যাংলো-আমেরিকানদের উচ্ছেদ করতে হবে।

রেঙ্গুন রেডিও, ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৩,

*　　　*　　　*

নেতাজী স্থভাষ চন্দ্র বসু জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মামুরা শিগেমিৎস্থর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পান। এই টেলিগ্রাম মিঃ শিগেমিৎস্থ বলেন—'যখন মহাযুদ্ধ একটা চূড়ান্ত পরিণতির মুখে এসেছে সেই সময় ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা' ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ—এগুলির গুরুত্ব অধিক। এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে ভারতের জাতীয় বাহিনীর শক্তি আপনার পরিচালনায় উত্তরোত্তর বেড়ে চলুক। আমি অনুভব করছি যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন বেশী দূরে নয়।'

সিঙ্গাপুর রেডিও, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

ব্রহ্মদেশে জাপানী দূত মিঃ সাওয়াদা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানের সাহায্য নৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে ভূমিগত বা অর্থনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া সত্যকার বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চলের কোন অর্থ হয় না।"

টোকিও রেডিও, ২৪শে অংক্টোবর, ১৯৪৩।

*　　　*　　　*

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নিপ্পনের পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় মামুরা শিগেমিৎসুর কাছে নিম্নলিখিত বাণী পাঠান : "পুনরায় আপনি পররাষ্ট্র সচিব অর্থাৎ বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার মন্ত্রী হওয়ায় আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতিতে আপনার পারদর্শিতা আমার অবহিত থাকায় পুনরায় এই পদ প্রাপ্তিতে আমি অত্যধিক আনন্দ লাভ করেছি। আপনার পদ প্রাপ্তির এই ক্ষণে আমি শত বাধা বিপত্তির কথা স্মরণ করেও আপনাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে যতদিন না আমাদের উভয়ের জয়লাভ ঘটে, ততদিন আমরা নিপ্পনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করবো।"

এর উত্তরে মিঃ শিগেমিৎসু নিম্নে উদ্ধৃত বাণী প্রেরণ করেন :—আমি আপনার অভিনন্দনের উত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি এই চরম মুহূর্ত্তে আপনার আন্তরিক আশ্বাসের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সফল হবে এবং আপনার যোগ্য নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি যুদ্ধ জয়যুক্ত হবে। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

রেঙ্গুন রেডিও, ২৫শে জুলাই, ১৯৪৪।

*　　　*　　　*

কইশো প্রধানমন্ত্রী রূপে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন এই সংবাদ পেয়ে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জেনারেল কইশো এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের এই আশ্বাস দেন যে জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা নিপ্পনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।

রেঙ্গুন রেডিও, ১৭শে জুলাই, ১৯৪৪

*　　　*　　　*

পরিশিষ্ট (৩)

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ১৯৪৩ সালের ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করে—"ভারতে ব্রিটীশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের যুদ্ধের জন্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করেছে, এর নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ, অথবা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। এই নবগঠিত সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটীশদের তাড়ানো এবং ভারতকে ভারতবাসীর অধীনে আনা।"

টোকিও রেডিও, ৮ই জুলাই, ১৯৪৩

*　　　*　　　*

"জাপান ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে স্বীকার করেছে এবং মিত্র বাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী একেবারে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং এই হচ্ছে প্রথম খাঁটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। সাধারণ সৈনিক থেকে আরম্ভ করে অফিসাররা পর্য্যন্ত সবাই ভারতীয় এবং এই সেনাবাহিনীর নিজস্ব পোষাক ও পতাকা আছে।

বার্লিন রেডিও, ৯ই জুলাই, ১৯৪৩

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা

ভারতীয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দর্শকদের সভায়, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, নেতাজী এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণের পর নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করা হয় :—

১৭৫৭ সালে বাঙ্গালা দেশে ব্রিটীশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয় জনগণ এক শত বৎসর ধরে অবিশ্রান্তভাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছে। এই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলা, বাঙ্গলার মোহনলাল, হায়দর আলী, টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পি, আপ্পা সাহেব ভোঁসলা, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দ্দার শ্যাম সিংহ আতিরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি, ডুমরাওনের মহারাজ কুনোয়ার সিংহ, নানা সাহেব এবং আরও বহু বীরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে, ব্রিটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই তাঁরা সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাণ্ডায়মান হননি। পরে যখন ভারতীয় জনগণ অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলো তখন তারা সম্মিলিত হ'লো। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের অধিনায়কত্বে তারা স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ সংগ্রাম করলো। যুদ্ধের প্রথম দিকে কয়েকটি জয়লাভ সত্বেও দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব ধীরে ধীরে তাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা এনে দিল। তথাপি ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুনোয়ার সিং এবং নানা সাহেব জাতির গগনে চিরন্তন নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান থেকে আমাদের আরও আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার প্রেরণা দিচ্ছে।

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটীশেরা সবলে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করে দেয় এবং আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করে। এর পর কিছুদিন ভারতবাসীরা হতমান এবং হতবাক হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর ভারতে নবজাগরণ এলো। ১৮৮৫ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণ তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন, প্রচারকার্য্য, ব্রিটীশ দ্রব্য বর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন প্রভৃতি সর্ব্ব উপায় এবং অবশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সবই

সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। অবশেষে ১৯২০ সালে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে ভারতবাসী যখন নূতন পন্থার সন্ধান করছিল, তখন গান্ধী অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নূতন অস্ত্র নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন।

এর পর ২০ বৎসর কাল ভারতীয়গণ নানা প্রকার দেশপ্রেম মূলক কাজ করে। মুক্তির বার্ত্তা ভারতের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌছায়। ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য নির্য্যাতন বরণ করতে শিখলো, আত্মত্যাগ করতে শিখলো এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শিখলো। কেন্দ্র থেকে সুদূরবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত জনগণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সমবেত হলো। এইভাবে ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করলো না, তারা আবার একটা অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হ'লো। এর পর তারা এক স্বরে কথা বলতে পারলো এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের জন্য এক মনে প্রাণে সংগ্রাম করতে পারলো। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত আটটী প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের কাজের দ্বারা ভারতীয় জনগণ প্রমাণ দিল যে তারা প্রস্তুত ; তাদের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করবার তারা ক্ষমতা অর্জ্জন করেছে।

এই ভাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের ভূমি প্রস্তুত হ'লো। এই যুদ্ধের সময় জার্মানী তার মিত্রদের সহায়তায় ইউরোপে আমাদের শত্রুদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। এদিকে জাপান তার মিত্রদের সহায়তায় পূর্ব্ব-এশিয়ার আমাদের শত্রুর উপর প্রবল আঘাত করে। বিভিন্ন অবস্থার সমন্বয়ে ভারতীয় জনগণ তাহাদের মুক্তি অর্জ্জনের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ পেয়েছে।

বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছে এবং একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এটা একটা নূতন ঘটনা। তারা শুধু স্বদেশে তাদের দেশবাসীর সঙ্গে সমান ভাবে চিন্তা করছে না, স্বাধীনতার পথ ধরে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব্ব-এশিয়ায়

বিশেষ করে সামরিক প্রস্তুতির ধ্বনিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০ লক্ষ ভারতীয় এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সম্মুখে রয়েছে ভারতের মুক্তি-বাহিনী, এবং তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"দিল্লী চলো।"

শয়তানী নীতির দ্বারা ভারতবাসীকে মরিয়া ক'রে তুলে, তাদের অনাহারের পথে ঠেলে দিয়ে, লুট আর দমননীতি চালিয়ে ভারতে ব্রিটীশ শাসন ভারতের জনসাধারণের শুভেচ্ছা হারিয়েছে এবং এই শাসনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এই নিষ্ঠুর শাসনকে ধ্বংসের জন্য অগ্নিশিখা চাই। ভারতীয় মুক্তি বাহিনী এই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করবে। ভারতস্থিত বেসামরিক জনসাধারণ এবং ব্রিটেনের পরিচালনাধীন ভারতীয় বাহিনীর একটা বড় অংশের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, বাইরে আমাদের সাহসী ও অপরাজেয় মিত্রদের নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে, ভারতীয় মুক্তি-বাহিনী তার ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সমাধা করবে বলে বিশ্বাস করে।

স্বাধীনতা আজ আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য হ'লো একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা এবং সে গভর্ণমেণ্টের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক নেতা আজ কারাগারে রয়েছেন, জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ অবস্থায় ভারতে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে গঠন করা বা সে গভর্ণমেণ্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নহে। সেই জন্যই পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্ত্তব্য হ'লো স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সমর্থন নিয়ে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করা এবং মুক্তি বাহিনীর (আজাদ হিন্দ ফৌজ) সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ দ্বারা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হবার পর আমাদের ওপর যে কর্ত্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা পালন করতে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি যুদ্ধে আমাদের সহায়

হোন। এই ঘোষণার দ্বারা আমরা মাতৃভূমির মুক্তি, তার উন্নতি এবং পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে যাতে সে স্থান লাভ করতে পারে তার জন্যে আমাদের এবং আমাদের সাথীদের জীবন পণ করছি।

ভারতভূমি থেকে ব্রিটীশ এবং তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সংগ্রাম চালাতে হবে। এর পর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হবে স্বাধীন ভারতে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এবং তাদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা। ব্রিটীশ এবং তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার পর স্বাধীন ভারতে স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের বিশ্বাসভাজন হয়ে দেশ শাসন করবে।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে। এই গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটী নাগরিকের সমান অধিকার এবং ধর্ম্মের স্বাধীনতা স্বীকার করছে। এই গভর্ণমেণ্ট ঘোণষা করেছে যে এই গভর্ণমেণ্ট জাতির প্রত্যেকটি সন্তানকে—বিদেশী গভর্ণমেণ্টের ধূর্ত্ত বুদ্ধির দ্বারা যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বিভিন্নতা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক অংশের কল্যাণ আর উন্নতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।

ভগবানের নামে অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে এবং যে সকল পরলোকগত বীর আমাদের নিকট বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, তাঁদের নামে আমরা ভারতীয় জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান করছি। ব্রিটীশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু করবার জন্য আমরা তাদের এবং তাদের মিত্রদের আহ্বান করছি। শত্রু যতদিন না ভারতভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং যতদিন না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম, সাহস, অধ্যবসায় এবং চরম জয়ে আস্থা নিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন—রাষ্ট্রাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ মন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মিসেস লক্ষ্মী (নারী সংগঠন), মি এস্, এ আয়েঙ্গার (প্রচার), লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জি (অর্থ), লেঃ কঃ আজিজ আমেদ, লেঃ কঃ এন্, এস্ ভগৎ, লেঃ কঃ জে কে ভোঁসলে, লেঃ কঃ গুলজ্জারা সিং, 'লেঃ কঃ এম্ জেড্ কিয়ানী, লেঃ কঃ এ পি লোকনাথন, লেঃ কঃ ঈশান কাদ্রি, লেঃ কঃ শা নওয়াজ (সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি), এ এম সহায় (সম্পাদক—মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা সম্পন্ন), রাসবিহারী বসু (সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা), করিমগণি, দেবনাথ দাস, ডি এম্ খান, এ ইয়েলাপ্পা, আই থিবি, সর্দ্দার ঈশ্বর সিং (পরামর্শদাতা), এ এন্ সরকার (আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা) ।

—শোনান, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ।

জাপানী বোর্ড অব ইনফরমেশন ঘোষণা করেন যে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ২৩শে অক্টোবর জাপানী গভর্ণমেণ্ট এই নূতন গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নেন এবং তার পরেই এ কথা ঘোষণা করা হয়। জাপান সম্রাটের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়—"মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে। জাপান সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এই ধারণা পোষণ করেন যে ভারতীয় জনগণের বহু আকাঙ্ক্ষিত বাসনা স্বাধীনতা লাভ করবার এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাই সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং এতদ্বারা ঘোষণা করছেন যে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

—টোকিও রেডিও, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩ ।

* * *

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শনিবারে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এ কথা ঘোষণা করেছেন।

—ব্যাটাভিয়া রেডিও, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

* * *

বার্লিন রেডিও-এর সংবাদে প্রকাশ যে জার্মাণী স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট নূতন ভারত গভর্ণমেণ্টকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন।

—সিঙ্গাপুর রেডিও, ২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

স্বাধীন ফিলিপাইনের গভর্ণমেণ্ট শোনানস্থিত ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নিয়েছেন। গতকল্য ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লরেল মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রেরিত এক বাণীতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডাঃ লরেল বলেছেন যে, ফিলিপাইনবাসীরা এতে আনন্দিত হয়েছে এবং তারা ভারতের মুক্তি এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় কামনা করছে।

—স্বাধীন ভারত বেতার (সাইগন), ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

* * *

১৯৪৪ সালের ২০শে নভেম্বর জাপানী বোর্ড অব ইনফরমেশন ঘোষণা করেন :—"অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু এবং জাপান সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির মধ্যে টোকিও-তে বর্ত্তমানে আলোচনা চলেছে। কি ভাবে এই দুই সরকারের পারস্পরিক

সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় এবং কেমন করে ভারতের মুক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধে সাফল্যলাভ করা যায় এই হচ্ছে আলোচনার বিষয়বস্তু। এই আলোচনার ফলে স্থির হয়েছে যে জাপানী গভর্ণমেণ্ট অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন।"

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুন নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সভাপতিত্বে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। লর্ড ওয়েভেল এবং মিঃ এমেরীর বিবৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। ব্রিটীশের নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের মতামতও বিবেচনা করা হয়।

মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :—

(১) লর্ড ওয়েভেলের প্রস্তাবের সঙ্গে ১৯৪২ সালের ক্রীপস্ প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে এবং এই ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

(২) বর্ত্তমান প্রস্তাব কেবলমাত্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সম্পদ ও সঙ্গতিকে শোষণ করবার ফন্দী।

(৩) এই প্রস্তাবের দ্বারা ব্রিটীশ সানফ্রান্সিসকোতে রাশিয়া ভারতের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিল, তাকে নষ্ট করতে চায়।

(৪) এই প্রস্তাব গ্রহণ কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে এবং এর দ্বারা ১৯৩৯ সাল থেকে কংগ্রেস যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, তা উল্টে দেওয়া হবে।

(৫) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের সমর্থন হারাবে।

(৬) এই প্রস্তাবে অনেক ফাঁক আছে। পৃথিবীব্যাপী ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে দাবী উঠেছে এতে রয়েছে তা প্রশমিত করার চেষ্টা।

(৭) এই প্রস্তাব করা হয়েছে এই কারণে যে, ব্রিটীশ জানে যে নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।

(৮) এই সঙ্কট সময়ে যদি ব্রিটেন আর ভারতের মধ্যে বোঝাপড়া হয় তা হ'লে ভারত ব্রিটেনের ঘরোয়া সমস্যা হ'য়ে যাবে এবং তার ফলে সে পৃথিবীর অনেক জাতির সমর্থন হারাবে।

(৯) ভারতবর্ষ যদি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ব্রিটেনের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে, তা হ'লে সে স্বাধীনতা পাবে না।

(১০) মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ছাড়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে।

(১১) ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কখনই ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে না।

মন্ত্রিসভা ব্রিটিশের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের ওপর জোর দিচ্ছেন। মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ভারত সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তা চলতে থাকবে। মন্ত্রিসভা এই সঙ্গে ওয়েভেল প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে ক্ষমতা দিচ্ছেন।

—সিঙ্গাপুর রেডিও, ১৭ই জুন, ১৯৪৫।

পরিশিষ্ট (৪)

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এবং এশিয়ার অন্যান্য জাতি

বর্মার পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় থাকিন নূ ১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই মাননীয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নিকট 'নেতাজী সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে এক অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন:—

"১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই আপনি ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের নেতৃপদ গ্রহণ করবার পর এত সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একটার পর একটা

ঘটেছে যে; এক বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেই পারা যায়নি। অল্পদিনের মধ্যে শোনান থেকে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধের সীমান্ত বর্মায় স্থানান্তরিত হওয়ায় কেবল বর্মা এবং ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ার পক্ষেই শুভ সূচিত হচ্ছে, আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম লাভ করতে পারেননি। এই অপ্রশমিত উৎসাহ কেবল ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের নয়, ঝাঁসি বাহিনীর রাণীকেও অনুপ্রেরণা দান করেছে এবং এই বাহিনীর যুদ্ধের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার দেশবাসী দৃশ্যতঃ গত বৎসরে যে সাফল্য লাভ করেছে, তার ফলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে স্বাধীনতা এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার চূড়ান্ত জয়লাভে আপনার আস্থা দৃঢ় হয়েছে।”

এর উত্তরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই বাণী প্রেরণ করেন:—
“মাননীয় মহাশয়! অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, ঝাঁসি বাহিনীর রাণী এবং আমার নিজের তরফ থেকে আপনার ৭ই জুলাই-এর অভিনন্দনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বর্মার জনসাধারণের গভর্ণমেণ্টের শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, অস্থায়ী সরকার এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়, বিশেষ করে শোনান থেকে বর্মায় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত হবার পর বর্মায় গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সহযোগিতা গভীরভাবে অনুভব করছি। বর্মায় গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের এই সহযোগিতার ফলেই ভারতের জাতীয় বাহিনী ভারতে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য ভারত-বর্মা সীমান্তে উপনীত হতে পেরেছে। আমি এই কথা চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছি—যে এই মুহূর্ত্তে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বর্মার সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে, যুদ্ধ করছে আমাদের সাধারণ শত্রু এ্যাংলো-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্য—এশিয়ার

স্বাধীনতা, বর্মার স্বাধীনতা এবং ভারতের স্বাধীনতার। আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

রেঙ্গুন রেডিও, ৮ই জুলাই, ১৯৪৪।

* * *

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অধিনায়ক মাননীয় সুভাষ চন্দ্র বসু এবং থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় কোভিট অভাইওঙ্গসির মধ্যে সম্প্রতি এই টেলিগ্রাম দুইটি বিনিময় হয়েছে :—

নেতাজীর টেলিগ্রাম: অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, স্বাধীনতা লীগ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনার প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সুযোগে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমরা ভারতবাসী আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমরা থাইল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবো। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, আপনার এই পদে স্থিতি কালে ইতিপূর্ব্বেই থাইল্যাণ্ড এবং স্বাধীন ভারতের মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ও রাজনৈতিক বন্ধন স্থাপিত হয়েছে তা দৃঢ় হবে। থাই জাতির নেতা হিসাবে আপনার সাফল্য কামনা করছি এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছি।

—সুভাষ চন্দ্র বসু, রাষ্ট্রাধিনায়ক,
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট।

মাননীয় মেজর অভাইওঙ্গসির উত্তর: আপনার অভিনন্দনের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। থাইল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ স্বাধীনতা প্রিয় ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্তরিক সহযোগিতা করতে থাকবে। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে চাই

যে, থাইল্যাণ্ড এবং স্বাধীন ভারতের মধ্যে সংস্কৃতিগত এবং রাজনৈতিক বন্ধন রক্ষার জন্য অবিরত চেষ্টা করবো। আমি থাই-জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এবং আপনার মহান্ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি। ভারতের স্বাধীনতা তরান্বিত হোক। এই সুযোগে আমি আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

রেঙ্গুন রেডিও, ১৫ই জুলাই, ১৯৪৪।

*　　　*　　　*

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রাধিনায়ক এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধ্যক্ষ মাননীয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীন বর্মার রাষ্ট্রাধিনায়ক মাননীয় ডাঃ বা ম-এর কাছে বর্মার স্বাধীনতা দিবসে এক বাণী প্রেরণ করেন:—স্বাধীনতাকামী ভারতীয়, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে, বর্মা গভর্ণমেণ্ট এবং বর্মার জনসাধারণকে স্বাধীনতা দিবসে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি এই সুযোগে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে অমূল্য সাহায্য দানের জন্য বর্মার গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আমরা ভারতীয়েরা আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য বর্মা এবং নিপ্পনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবো।

রেঙ্গুন রেডিও, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৪।

পরিশিষ্ট (৫)

পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

যে সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধী ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটীশ পুলিশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েছে, জাপান এবং সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ তাদের আশ্রয় দান করেছে। এই সমস্ত বিখ্যাত প্রবাসীদের মধ্যে ছিলেন মিঃ রাসবিহারী বোস। ১৯১২ সালে দিল্লী দরবারে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করে তিনি পালিয়ে আসেন। আর একজন হচ্ছেন মহেন্দ্র প্রতাপ। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটীশ বিরোধী প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন। তবে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর ব্রিটেন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণার পর সেই বারুদে আগুন লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাঁটী হয়ে উঠলো এবং এক সময় এগুলি অভূতপূর্ব্ব-ভাবে ব্রিটীশ আধিপত্যকে নাড়া দিল।

যুদ্ধ-পূর্ব্বের পরিস্থিতি

১৯৩৬ সালে ব্যাংককে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি গঠিত হলো এবং পরে মালয়ে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য সেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হলো। ১৯৩৭ সালে টোকিওতে যে সম্মেলন হয় তাতে মিঃ রাসবিহারী বোস, হরি সিং গিয়ানী, প্রীতম সিং এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী প্রমুখ সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে শ্যাম, মালয়, বর্মা এবং ভারতে ব্রিটীশ বিরোধী প্রচারের

পরিকল্পনা করা হয় এবং বিশেষভাবে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটীশ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচারের সিদ্ধান্ত করা হয়। যুদ্ধের সময় জাপানের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতে পারে এমন ভাবে বাহিনী গঠনেরও একটী সাধারণ পরিকল্পনা করা হয়। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক আগে গিয়ানী, প্রীতম সিং শ্যামে (মালয় সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল দূরে) একটী অফিস খোলেন এবং এখান থেকে তাঁর দল অগ্রসরমান জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে।

যে সমস্ত জায়গায় পূর্ব্বেই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলি গ্রহণ করা হয়, কর্ম্মচারীদের পরিবর্ত্তন করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী নূতন শাখা খোলা হয়। এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সেবাকার্য্য এবং ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের যোগাযোগ রক্ষা করতো। প্রথম দিকের বিবরণীগুলিতে বিশেষভাবে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নাম পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় বাহিনীর আর একজন অফিসার, ক্যাপ্টেন মোহম্মদ আক্রামকে (ইনি টোকিও যাবার পথে দুর্ঘটনায় নিহত হন) সঙ্গে নিয়ে এই সমস্ত কাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে থাকেন। ১৯৪২ সালের ২৪শে জুন বার্লিন রেডিওতে ঘোষণা করা হয়—"পূর্ব্ব-এশিয়ার বিখ্যাত ক্যাপ্টেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ জাতীয় বাহিনীর কর্ম্ম পরিষদের একজন সদস্য হবেন।"

টোকিও এবং ব্যাংকক সম্মেলন

যুদ্ধ যত বিস্তার লাভ করছে এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করে একটী ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এই জন্যেই ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে টোকিওতে এশিয়ার ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কারণ আর একটী সম্মেলন হবে ব'লে স্থির হয়েছে। এর পরের সম্মেলন হয় ১৯৪২ সালের

১৫ই থেকে ২৫শে জুন ব্যাংককে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী মিঃ রাসবিহারী বোস এবং এই সম্মেলনে জাপানী প্রধান মন্ত্রী তোজো এবং পররাষ্ট্র সচিব তোগোর বাণী পঠিত হয়। মিঃ রাসবিহারী বোস এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল ব্রিটীশের কবল থেকে মুক্তির জন্য সুদূর প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় সাধন, যুদ্ধের এই সুযোগ গ্রহণ এবং জাপানের আন্তরিকতা। জাপানের এবং জার্মাণীর রাষ্ট্রদূত সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, মিঃ ডি. এম. দাস, মিঃ এ. এম. সহায়, মিঃ এন্. রাঘবন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ. কঃ. এন. জি. গিল এবং লেঃ. কঃ. জি. কিউ. গিলানী। শেষোক্ত দুইজন সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সম্মেলনে স্থির হয় যে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের মারফৎ ভারতের পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলন করা হবে। এই সম্মেলনে ইহাও স্থির হয় যে এখনই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠনের জন্য ভারতীয় সৈন্য এবং বেসামরিক অধিবাসীর মধ্য থেকে সংগ্রামশীল এবং অসংগ্রামশীল সকল রকমের লোক সংগ্রহ করা হবে। আর একটী প্রস্তাবে কর্ম্ম-পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করেন যে এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। কারণ ভারত আক্রমণের গোড়াপত্তনের জন্য এই আবহাওয়ার প্রয়োজন আছে। আর একটী প্রস্তাবে স্থির হয় যে ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাইরে রেডিও, প্রচার-পত্র-বক্তৃতা এবং অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা হবে। এই সম্মেলনে কতকগুলি সাধারণ নীতি স্থির হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এইগুলি :—

(ক) ভারতবর্ষকে এক এবং অবিভাজ্য বলে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সমস্ত কার্য্যক্রম জাতীয়তামূলক

হবে, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক, গোষ্ঠীমূলক বা ধর্ম্মমূলক কিছু থাকবে না।

(গ) ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কার্য্যক্রম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করে স্থির করা হবে।

(ঘ) ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ভারতীয় জনসাধারণই গঠন করবে।

(ঙ) ভারতবর্ষের পক্ষে সম্মিলিত অক্ষ-নীতিই সুবিধাজনক এবং জাপানের সমর্থন এদিক থেকে অমূল্য।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ স্থির হয়:—

(ক) কর্ম্ম-পরিষদ।

(খ) প্রতিনিধি পরিষদ।

(গ) রাষ্ট্রীয় পরিষদ।

(ঘ) স্থানীয় শাখা সমূহ।

কর্ম্ম-পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ: মিঃ রাসবিহারী বোস—সভাপতি মিঃ এইচ. রাঘবন এবং মিঃ কে. পি. কে. মেনন—আসামরিক বিভাগ; লেঃ. কঃ. জি. কিউ. গিলানী এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং সামরিক বিভাগ। সম্মেলনে কর্ম্ম পরিষদের যে কর্ম্ম-সূচী স্থির হয় তা হচ্ছে এই যে, লীগের নীতি কার্য্যকরী করা, যে সমস্ত নূতন সমস্যা উঠবে তা বিবেচনা করা এবং সমগ্র জাতীয় বাহিনীর পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। এই কর্ম্ম-পরিষদকে দরকার হলে নূতন বিভাগ সৃষ্টি এবং অফিসারদের নিয়োগ বা বরখাস্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রতিনিধি পরিষদের নির্ব্বাচন করবে। এই পরিষদে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাও থাকবেন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন এই সমস্ত জায়গা থেকে—জাপান, মাঞ্চুরিয়া ফিলিপাইন, শ্যাম, মালয়, বর্মা, বোর্ণিও, সেলিবিস, হংকং, ক্যাণ্টন,

ম্যাকাও, সাংহাই, ইন্দো-চীন, জাভা, সুমাত্রা, আন্দামান এবং চীনের অন্যান্য অঞ্চল।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কতটা শক্তি ছিল তা জানা যায় না। কোন কোন মহলের অনুমান যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে ৬০,০০০ থেকে ৯০,০০০ জন সৈন্য ছিল, কিন্তু এই রকম কোন হিসাব ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ সম্বন্ধে কখনও করা হয় নি। এইরূপ হিসাব করা হয়েছিল যে ১৯৪৩ সালের শেষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করবার জন্য ২০০,০০০ জন সশস্ত্র ও শিক্ষিত সৈন্য ছিল। যাই হোক, একথা ঠিক যে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠান সুদূর প্রাচ্যের অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয়ের সমর্থন লাভ করেছিল। এ কথাও সত্যি যে ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর বহু লোককে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে পাওয়া গিয়েছিল; অবশ্য একথাও ঠিক যে অনেককে বন্দী অবস্থায় এই বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আগমন

১৯৪২ সালের ২রা জুলাই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বার্লিন থেকে সুদূর প্রাচ্যে পদার্পণ করে সিঙ্গাপুর এলেন। এর দুইদিন পরে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সভায় মিঃ রাসবিহারী বসুর স্থলে নেতাজী বসুকে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি করা হয়। ঐ দিনই সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। নেতাজী বসু ঘোষণা করেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা এবং এর রণধ্বনি হবে—"দিল্লী চলো।"

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন

নেতাজী বসু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি পদে বৃত হবার

সঙ্গে সঙ্গেই এই ইচ্ছা কার্য্যকরী করেন। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর ঘোষণা করা হয় যে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে এবং সিঙ্গাপুর-এর প্রধান ঘাঁটি। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলী :—

নেতাজী বসু—রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ মন্ত্রী।

মিঃ এস. এ. আয়েঙ্গার (ব্যাংককের একজন সাংবাদিক)—প্রচার।

লেঃ. কঃ. এ. সি. চ্যাটার্জ্জি (ভূতপূর্ব্ব আই. এম. এস.)—অর্থ।

ডাঃ এস. লক্ষ্মী—নারী সংগঠন।

মিঃ এ. এম. সহায় (জাপানের কোবে সহরের প্রবাসী)—সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা সম্পন্ন)।

মিঃ রাসবিহারী বোস—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা।

মিঃ এ এন্. সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

মন্ত্রীগণ ছাড়া আরও কয়েকজন বে-সামরিক পরামর্শদাতা, আট জন সামরিক অফিসার (প্রত্যেকেই লেঃ. কঃ.-এর পদমর্য্যাদা সম্পন্ন) সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে আর একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে এই যে ১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এই ঘোষণা সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয় প্রবাসীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব ব্যাঙ্ক ছিল এর নাম আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব ক্যারেন্সী ছিল। প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসারেই এটা ছিল গভর্ণমেণ্ট। কারণ জার্মাণী, জাপান, ইতালী, মাঞ্চুকো, ইন্দো-চীন, শ্যাম, ফিলিপাইন, বর্ম্মা, ক্রোশিয়া প্রভৃতি গভর্ণমেণ্ট এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে নেয়।

১৯৪৩ সালের ৮ই নভেম্বর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই অস্থায়ী

গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ করার মধ্য দিয়ে এই গভর্ণমেণ্টকে আইন সঙ্গত মর্য্যাদা দান করা হয়।

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রধান ঘাঁটী রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককে স্থানান্তরিত করা হয় এবং জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট (৬)

ঘটনাপঞ্জী

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১—জাপান কর্ত্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২—জাপানের কাছে সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ।

২৪শে জুন, ১৯৪২—ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের উদ্বোধন।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৩—ভারতীয় স্বাধীনতা লীগকে যুদ্ধের প্রস্তুতি দান।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩—মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা ঘোষণা।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৩—মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩—স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩—স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৮ই নভেম্বর ১৯৪৩—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩—পোর্ট ব্লেয়ারের ওপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন।

৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৪—আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী ঘাঁটী রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত।

কর্ণেল লোকনাথনের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের (নূতন নামকরণ শহীদ দ্বীপপুঞ্জ) চীফ কমিশনারের পদ গ্রহণ।

১৮ই মার্চ, ১৯৪৪—আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতে প্রবেশ।

২২শে মার্চ, ১৯৪৪—জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জির ভারতের মুক্ত অঞ্চলের গভর্ণরের পদ গ্রহণ।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪—নেতাজী সপ্তাহ আরম্ভ।

২১শে আগষ্ট, ১৯৪৪—দুর্য্যোগের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান স্থগিত।

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর থেকে

১৯৪৫-এর জানুয়ারী—আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় অভিযান সুরু।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫—আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের রেঙ্গুন ত্যাগ এবং ব্যাংককে গমন।

২রা মে, ১৯৪৫—আজাদ হিন্দ ফৌজের রেঙ্গুনে আত্মসমর্পণ।

১শে আগষ্ট, ১৯৪৫—জাপানের পটস্‌ডাম ঘোষণা মানিতে স্বীকৃতি।